প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৭৬

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
মুক্ত করো হে বন্ধ

সূ চি প ত্র

গ ল্প

বি চি ত্র

ভূমিকার পরিবর্তে

এক বিপরীত প্রক্ষেপণে রবীন্দ্রনাথের করুণাঘন সম্ভাষণ 'হায়, ছায়াবৃতা' কিংবা বুদ্ধদেব বসুর ক্ষুব্ধ এই 'ছায়াছন্ন হে আফ্রিকা' বরং বাকি বিশ্ব, বিশেষত ভারত উপমহাদেশের এতদঞ্চলের জন্যেই অধিক সত্য। সৃষ্টি এবং সভ্যতায় প্রকৃত অর্চিষ্মান আফ্রিকাকে জানা-বোঝার প্রশ্নে বাকি বিশ্বের নিদেন যে অর্ধেক দায়, তা পালনের ব্যর্থতায় বাকি বিশ্বই বরং ছায়াবৃত-ছায়াছন্ন। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির পরিচিত সামগ্রিকতায় তার দ্যোতক শব্দস্পন্দের এ-অর্থ বিস্তারণ আজ বুঝি অতি-বাঞ্ছিতও। আফ্রিকা এখনও যদি ছায়াছন্ন, তার দায় অধিকাংশত অ-আফ্রিকীদের।

আফ্রিকার দেশসমূহের মুক্তি-আন্দোলনেগুলোর প্রতি সংহতির রাজনীতি কম হয়েছে— একথা বলা যাবে না। সে সবের কার্যকারিতাও কমবেশি ছিলো। কিন্তু আমাদের আপন কল্যাণের প্রশ্নে সে রাজনীতিরও ছিলো এক অগভীরতা, এক ভঙ্গীপ্রধানতা। পৃথিবীতে মানুষের যেটুকু সভ্যতা, তন্মধ্যে আফ্রিকার সৃষ্টি এবং অবদানের প্রকৃত পরিচয়কে জানা এবং জানানোব ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা, তৎপরতা প্রসারিত হয়নিই বলা চলে। আফ্রিকা তাই ব্যাপক জনচিত্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের বাঁধাছক (sterotype) এখনও বহন করছে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আফ্রিকানিজম, দ' আফ্রিকান পার্সোনালিটি' (১৯৬৩) এবং 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইথিওপিয়া-ফ্রম দ' সেভেন্‌থ সেঞ্চুরী বি সি' (১৯৬৮)-র মতন আফ্রিকা-বিষয়ে গভীরতা-সঞ্চারী গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা Africanist and Genocide-এর মতো প্রবন্ধ এযাবৎ ব্যতিক্রমই রয়ে গেছে। এই উদারনৈতিক, মানবতাবাদী পণ্ডিত তাঁর বিস্তারিত ও শ্রমসাধ্য বিবরণ ও আলোচনায়, মেটাফিজিক্যাল দিকটিতে অধিক ঝোঁক রেখেও, সামগ্রিক আফ্রিকী সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন ও সভ্যতাকে অসঙ্কোচ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, বহুলদৃষ্ট ভারতীয়-শ্রেষ্ঠত্বমনস্কতাকেও পরিহার করেছিলেন। 'আফ্রিকানিস্ট এ্যাণ্ড জেনোসাইড' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার আফ্রিকার সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের দ্বারা সংঘটিত বিনাশের (আত্মিক 'গণহত্যা'র) তীব্র নিন্দা এবং তার যে প্রতিষেধক নির্দেশ করেছিলেন—বিকশিতভাবে তা-ই পরবর্তীকালে Decolonisation of Mind হিসেবে জোর তাগিদ পেয়েছে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের দীর্ঘ প্রবন্ধ, যেখানে শুধু বর্ণবৈষম্যবাদ-বিরোধিতা নয়, ছিলো মাউমাউ-বিদ্রোহের প্রতিও আবাহনী মনোভাব, কিংবা সম্প্রতি প্রকাশিত শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশু সাহিত্য'-বইয়ের আফ্রিকার প্রতি অমর্যাদা-অপনোদনের তীব্র প্রয়াস সম্পর্কেও একই

কথা সত্য। বিজয়রত্ন মজুমদার (মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ, ১৩২৯, পৃ: ৫০২), নরেন্দ্র দেব (ভারতবর্ষ, ১৩ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ: ৩৪৮), উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ভারতদর্শনসার, ১৯৪৯, পৃ: ১৫)—প্রমুখের বিভ্রম ও অমর্যাদার পাশাপাশি, এবং লিভিংস্টোনের ভ্রমণবৃত্তান্ত, রাইডার হ্যাগার্ডের উপন্যাস এবং টারজান-চলচ্চিত্রের কল্যাণ-চাপে, আফ্রিকা-অনুকূল মনোভাবেব গুটিকয় নিদর্শন এক অকার্যকর ক্ষীণস্রোত হয়েই রয়েছে।

অনুবাদ-যোগে আফ্রিকার সাহিত্যের স্বাদ আমাদের পাঠক সাধারণেব কাছে উপস্থিত করাব বিচ্ছিন্ন যে প্রচেষ্টা হয়েছে—তারা নিশ্চয় ধন্যবাদার্হ, কিন্তু আফ্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিকোণসঞ্জাত-আলোতে উদ্ভাসিত হতে, পটভূমিক তথ্য ও বিশ্লেষণে পুষ্ট হতে তারা কমই পেরেছে। পটভূমিক বাস্তবতার জ্ঞানবর্জিতভাবে এক্সোটিকা-সন্ধানের অনেকটা পশ্চিমসুলভ লক্ষণ ও মনোভাবই বরং অনেক সময় প্রমাণিত। আফ্রিকার নিজের তরফ থেকে প্রচার-প্রকাশনার দুর্বলতার কারণে, এবং আমাদের নিজস্ব অচেতনতায় প'ড়ে, অনেক সময় ইউরোপের কৃষ্ণ চশমার আলোতেই আমরা আফ্রিকাকে দেখতে গিয়েছি। নিদেন যোগাযোগ ঘটেছে কখনো সরকারি তথা কূটনৈতিক পর্যায়ে, জনসমাজের স্তরে পারস্পরিক-ধারাবাহিক সংযোগ না হওয়াতে আফ্রিকার সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে প্রকৃত-ব্যাপক জানা হয় নি।

অবশ্য আমাদের এই ভিন্ন এক 'অনগ্রসরতা' এবং কতোক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরও, বর্তমান সংকলনে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রবণতাকে আমরাই অতিক্রম করতে পেরেছি-এ দাবি করবো না। এ-বইয়ে আফ্রিকী সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উপস্থিত করেছি—কতোক ভ্রান্তি এবং অজ্ঞানের প্রতি তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আফ্রিকার সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্য এক অনবদ্য নিদর্শন, তার মৌখিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে কতিপয় নিদর্শন বেছে নিয়ে পুনর্নুবাদযোগে উপস্থিত করা হয়েছে। আফ্রিকা সম্পর্কে অরণ্য এবং অন্ধকারেব ধারণার বিপরীতে, আদিম সরলতার ধারণার বিপরীতে, পাঠক সেখানে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার প্রমাণদায়ক অনেক দুরূহ, জটিল এবং প্রতীকী প্রকাশকে লক্ষ্য করে হয়তো বিস্মিত হবেন, হোঁচট খাবেন। আফ্রিকার মৌখিক সাহিত্যের কাব্য, দার্শনিকতা, রূপকল্প এবং বৈদগ্ধ মুগ্ধও করবে।

আফ্রিকার বৈচিত্র্যের সত্যটিও অধিকাংশ বেলায় অলক্ষিত। অথচ, এই নিজস্ব বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য এবং শ্রদ্ধা করার পরই কাম্য কোনো সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস, তারপর পৃথিবী কিংবা তৃতীয় পৃথিবীর অঙ্গ হিসেবে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে চিহ্ন-অঙ্কন। এ সঙ্কলনে আমাদের লক্ষ্য সাহিত্যযোগে আফ্রিকার এই বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধিকে আভাসিত করাও। পাঠক এও বুঝবেন যে, আফ্রিকার প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যের সবটা ঝাড়ফুক, মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার তো নয়ই, মূল্যবান যাদুবাস্তবতাও তা নয়, নৃতাত্ত্বিকদের নেশা মেটানোর জন্যেও তৈরি হয় নি তারা। বিরূপ বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ এবং অনেক ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী ও কাব্য রয়েছে, যার বৈদগ্ধ বিস্ময়কর, রসবোধ অতি-পরিণত। ঈশ্বর-সম্পর্কিত কবিতা উচ্চ দার্শনিকতাবোধ এবং অপূর্ব রূপকল্পে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকার খইশান্ গোষ্ঠীর ঈশ্বরের ছায়াপথ ধরে হেঁটে-হেঁটে অন্ধকার রাতে ভক্তদের আলো দেখানোর বক্তব্যের

কবিতা, কিংবা ঘানার আশান্টে উপজাতির ব্যঙ্গরসাশ্রিত গল্প 'সবাই কথা কয়' এই জাতীয় সৃষ্টির নিদর্শন। মৌখিক লোকসাহিত্যের ধারাটি আফ্রিকার অনেক দেশে এখনও সজীব এবং সেখানে যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করার মতো। উত্তর নাইজেরিয়ার হাউসা ভাষাতে এ্যাটম বোমার ওপর কাব্য রচনাতে তার প্রমাণ আছে।

আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় আবার লৌকিক সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রয়োগ, পুনর্নির্মাণ ইত্যাদি লক্ষ্য করবার মতো; মালাগাসির রানাইভোর 'নাগর তোর পিরীতি' জাতীয় কবিতায়, সাঁগর-এর কাব্যের রূপকল্পে, কিংবা নৃগুগি বা থিয়োঙ্গোর সাম্প্রতিক উপন্যাসের বর্ণনারীতিতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক সাহিত্যের একাংশে-যা বিশেষভাবে পশ্চিমা সংযোগের অভিঘাতজাত, রয়েছে এ ঐতিহ্যকে প্রায়-অগ্রাহ্য করার প্রবণতা। মালাগাসির কবি রাবিয়েরিভেলোর রচনা কিংবা গিনির কামারা লাইয়ের 'আগাছা'-ছোটগল্পকে আফ্রিকান হিসেবে চিনে নেয়া যায় না।

কলম ধরার পর এবং বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসন অতিক্রম করার কালে আফ্রিকার মানুষ তাঁদের মানসকে ধরেছেন কবিতায়, গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং নানা বিষয়ে রচিত প্রবন্ধে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভাষা যেমন ফরাসি, ইংরেজি কিংবা পর্তুগিজ, রচনা-প্রকরণ এবং আঙ্গিকও এক বহুমুখী সংযোগ এবং তজ্জনিত মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তিত, বিবর্তিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন পশ্চিম আফ্রিকার হাউসা ও ইয়োরুবা, ইথিওপিয়ার আমহারা, দক্ষিণ আফ্রিকার মোযো, জুলু ও খখ্সা ভাষাতে লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। আর, বর্তমানে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর নানা পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি, 'বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশার'র মনোভাব নিয়ে মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনাও শুরু হয়েছে। অবশ্য আফ্রিকার ক্ষেত্রে ভাষা-প্রশ্নটি বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই জটিল এবং স্পর্শকাতর হয়েছে, অনেক আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে, এখনও হচ্ছে; তবে প্রাক্-উপনিবেশবাদের বাস্তবতাকে যেমন পুনরুদ্ধার করার প্রশ্ন ওঠে না, সম্ভব নয় মাতৃভাষামুখীনতার সাধারণ-স্বাভাবিক ধারাটিকেও অগ্রাহ্য করা। সেমবেন ঔসমানের চলচ্চিত্র এবং নৃগুগি বা থিয়োঙ্গোর সাহিত্যের মাতৃভাষা অনিবার্য এক ভবিষ্যতের পদধ্বনি।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার দাবিতে আফ্রিকী সাহিত্যের একটি মূল সুর জোর প্রতিবাদী। সাম্প্রতিক প্রতিবাদ অধিকাংশত ইউরোপীয় দমনের সর্বপ্রকার রূপের বিরুদ্ধে। সর্বশেষ এ লক্ষ্যবস্তুরও প্রতিস্থাপন ঘটছে—উপনিবেশবাদ একরূপ গত হলেও। তাদেরই সদৃশ এবং কখনো সঙ্গী এক স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী দেশকে, ব্যাপক মানুষকে পূর্বের মতোই পীড়িত করছে। প্রাক-উপনিবেশ অতীতেও ধরা পড়ছে তাদের এবং অবিরাম উপস্থিতি। বা থিয়োঙ্গো, ওলে শোয়িঙ্কার মতো লেখকদের রচনার অনেক লক্ষ্যবস্তু এই স্থানীয় নিপীড়ক শ্রেণী। বৃহত্তর ইতিহাস এবং বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মানুষ-আফ্রিকাবাসীকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস দেখি সেমবেন ঔসমান, আই কুই আরমা, ইয়াম্বো ঔলৌগুয়েম এবং ওলে শোয়িঙ্কার মতো সাহিত্যিকের এক সামগ্রিক ভূমিকায়। নেগ্রিচুড আন্দোলনের আত্ম-অবগাহনকে পেরিয়ে, সাদা-কালোর একরৈখিক দ্বন্দ্বের উন্মোচনকে পেরিয়ে, আফ্রিকার বিখ্যাত মুখোশে উৎকীর্ণ জটিল, আধুনিক এক সমৃদ্ধির অনুসরণে, কিংবা আফ্রিকী

ছড়াসাহিত্যের নিজস্ব প্রাচীন দুরূহতার অনুসরণে আফ্রিকার সাম্প্রতিক সাহিত্য এখন এক বহুমুখী ও জটিল দ্বন্দ্বেরই অভিযাত্রী, বিশ্বযাত্রাকেও সে মনে করছে আত্মোদ্ধার-সংগ্রামের পরিপূরক। বর্তমান সঙ্কলনের আধুনিক সাহিত্য অংশে পাঠক এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ তথা বিবরণের যথার্থতাকে খুঁজে পাবেন, আশা করি।

এ সঙ্কলনে আমরা সাহারা-নিম্ন আফ্রিকার বিশাল-বিচিত্র সাহিত্যকৃতির কিছু নমুনা-মাত্র পরিবেশন করছি। আধুনিক লিখিত সাহিত্যের উদাহরণগুলো মোটের ওপর ১৯৪০ থেকে ১৯৯০ সময়কালে রচিত। আলাদা সময়চিহ্ন দেয়া হলো না। মৌখিক সাহিত্যের বেলায় তো তার সুযোগ এবং প্রশ্নও নেই। বলাবাহুল্য, সঙ্কলনটির 'প্রতিনিধিস্থানীয়' কিংবা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কোনো দাবি নেই। নির্বাচনের সময় আমরা দেশভিত্তিকতার মাপকাঠি নিই নি। মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আফ্রিকার পুরনো এলাকা কিংবা জনগোষ্ঠির নাম উল্লেখ করেছি। কিছু বিশিষ্ট রচনার সমাবেশ এখানে ঘটেছে, এরা শ্রেষ্ঠ কিনা, সে বিচার তো অনেকখানি অবান্তর, অসাধ্য।

আফ্রিকী সাহিত্যের এই ক্ষুদ্র পরিবেশনে, অনুবাদ-কর্মটির পর্যায়ে, আমরা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ সংখ্যক প্রকৃত কৃতী মানুষের কলমকে যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। নানা কারণে সবটা সফল হই নি। গুণীজন যারা সোৎসাহে অকৃপণ সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। বিশিষ্ট কবি-লেখকদের সহযোগী উপস্থিতি আফ্রিকা-প্রশ্নে বাঙালির প্রবল সহমর্মিতার পরিচয় হয়েও রইলো।

শ্রদ্ধেয় মফিদুল হকের বেলায় একথা আরও বেশি সত্য। শুধু প্রকাশক কিংবা অন্যতম অনুবাদক হিসেবে নয়, প্রবল আগ্রহে-আবেগে তিনি যে বৃহৎ সংগঠনের ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে কখনো কখনো সম্পাদনা-কর্মেও খুব বড় আনুকূল্য হয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কিংবা অন্য কারও সহযোগিতাকেই ক্ষুণ্ন করতে চাই নে। সকল সম্ভাব্য পাঠকের প্রতিও এ মনোভাবই।

ধ্রুব গুপ্ত

সভ্যতার আফ্রিকী উন্মেষ □ ধ্রুব গুপ্ত

আমাদের বাঙালি চেতনায় আফ্রিকা মহাদেশ খুব একটা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত নয়, যতোই আমরা নেলসন মাণ্ডেলা নিয়ে উত্তেজনায় মাতি, বা 'তৃতীয় দুনিয়ার' দেশদের ভাই বলে বুকে টেনে নেবার ভান করি। আফ্রিকা বিষয়ে আমাদের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অজ্ঞতা সবই অনেকটা কলোনিয়াল আমল থেকে চলে আসা শিক্ষাব্যবস্থার দান হতে পারে ; কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। 'কালো', 'কাফ্রি', 'হাবশী', 'সিদি' কথাগুলো (বাংলাতে শেষটার চল তেমন নেই অবশ্য) বহুকাল ধরে যে আমরা অবজ্ঞাসূচকভাবে প্রয়োগ করে এসেছি, তার পেছনে আমাদের একটা আর্য্যামি-প্রসূত বর্ণচেতনা গোচরে বা অগোচরে কাজ করেছে। কালোর সঙ্গে মন্দ, ও ফর্সার সঙ্গে ভালোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে একটা ধারণা আমাদের মনে বেশ ভালোভাবেই কায়েম হয়ে গেছে। আমরা এখনও কথায় কথায় বলি 'কালোর মধ্যে সুন্দর'; অথবা মেয়েটির রং 'ময়লা', তবু দেখতে মন্দ না। তারাশংকরের কবি গাইছে : কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দো কেনে/কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছো কি নয়নে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কালো ? তা সে যতই কালো হোক,/দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' অর্থাৎ, কালো কেশ এবং কালো চোখ বেচারা কালো মেয়েকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ! ঠাট্টা নয়, এখনও কালো মেয়ের জন্য বর পাওয়া মুশকিল। সাহেব জামাই হলে অত অখুশি হন না শ্বশুর—বরং মনে মনে গর্ব করেন, কিন্তু যদি নিগ্রো জামাই হয় তবে তুমুল কাণ্ড বেঁধে যাবে। সংস্কৃত সাহিত্যে, এমনকি বৌদ্ধ সাহিত্যেও নিদর্শন আছে কালোর প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের। কৃষ্ণ বা কালী বা দ্রৌপদী যে গৌরাঙ্গ নন, সেটা প্রধানত আধ্যাত্মিক কারণে—তার সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতির সাক্ষাৎ সম্পর্ক বোধহয় নেই। একারণেই মনে হয় আমাদের মনে বর্ণচেতনার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো; কলোনিয়াল আমলে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকা বিষয়ে যেসব স্টিরিওটাইপ আমাদের কাছে এসেছে তা তাই সহজে আমাদের মানসে গ্রাহ্য হয়ে গেছে, এবং আমরাও তাই আফ্রিকা মহাদেশকে কালো অসভ্য মানুষদের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' বলে ভাবতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আফ্রো-এশীয় ভ্রাতৃত্বের জিগির তুলেও সে সাধারণ কুসংস্কার দূর করা যাচ্ছে না।

এধরনের মনোভঙ্গি পরিবর্তনের কাজে আফ্রিকার কেবল আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রের মহারথী, যথা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ওলে সোইংকা বা ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবের রচনার সঙ্গে পরিচয়ই যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে হয় না। প্রাক্-ইয়োরোপীয় আমলের আফ্রিকী সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা সাধারণ পরিচয় এ জন্যে বিশেষ প্রয়োজন বলে আমার ধারণা। সে-উদ্দেশ্যেই এ নিবন্ধ রচিত।

মর্টিমার হুইলার মন্তব্য করেছেন, 'এশিয়া সভ্যতার জন্মভূমি হতে পারে, কিন্তু মানুষের জন্ম হয়েছিলো আফ্রিকাতে।' এ মন্তব্যের দু'টি ভিত্তি রয়েছে। এক হলো, আদিমতম 'মানব' বলে চিহ্নিত 'জিনজানথ্রপাস'-এর করোটি ১৯৫৯ সালে পাওয়া গিয়েছিলো বর্তমান টানজানিয়ার ওলডুভাই নদীর শুষ্ক গিরিখাতে। দ্বিতীয় হলো 'সভ্যতা'র আরম্ভচিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট যেহেতু কৃষিকার্য, এবং সেই সঙ্গে লিখিত ভাষায় উদ্ভব ও নগর-পত্তন, তাই পশ্চিম এশিয়ার জেরিকো অঞ্চলকে এক্ষেত্রে হুইলার 'সভ্যতা'র জন্মভূমি বলে নির্দিষ্ট করেছেন। আফ্রিকার কর্ষণ-পূর্ব যুগের মানুষ, অর্থাৎ যাদের 'পিগ্‌মী', 'বুশমেন', 'হটেন্‌টট্‌' বলা হতো, এবং এখনও হয় (যদিও 'বুশমেন'দের প্রকৃত নাম 'সান' এবং 'হটেনটট'দের প্রকৃত নাম 'খোই-খোই' এখন পণ্ডিত সমাজে কিছুটা চালু), তাদের কোনো সভ্যতা ছিলো না, তারা 'অসভ্য', 'জংলী' বা তাদের ভাষা শুনতে 'বানরের কচকচির' মতো ('ভারত বর্ষ' পত্রিকার ১৩৩২ সালের ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত নরেন দেবের লেখা 'বৃটিশ আফ্রিকা' দ্রষ্টব্য)—এই সব কথা আমরাও বলেছি। কিন্তু তাদের রচিত কবিতা (লিখিত না হলেও), তাদের হাতের শিল্পকর্ম এখনও তাদের 'সভ্যতা'র চিহ্ন হিসেবে বিদ্যমান। সুতরাং 'সভ্যতা'র এবংবিধ 'আধুনিক' নির্নয়কে এখন আর স্বীকার করা সম্ভব নয়।

কৃষিভিত্তিক সভ্যতাও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো বহুকাল আগে। সেই সব 'উপজাতি' এক একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করে গড়ে তোলে গ্রাম, নগর, দূরপাল্লার বাণিজ্য, সমৃদ্ধ ধর্মচেতনা ও দর্শন এবং সাহিত্য—এসবকেই তো আমরা 'সভ্যতা'র চিহ্নস্বরূপ ধরে রাখি। এক্ষেত্রেও আমাদের মনে একটা কুসংস্কার বজায় থাকে। যা কিছু গর্ব করার মতো জিনিস আফ্রিকাতে আছে, তা সবই বাইরের লোকেরা তাদেরকে দয়া করে শিখিয়েছেন—এরকম একটা ধারণা বিশেষ করে কলোনিয়াল আওতায় এতোকাল প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। সেই কারণেই এ পর্যন্ত মনে করে আসা হয়েছে যে লৌহকর্ম, কৃষিকাজ ও রাজতন্ত্র সবই মিশর (এ-প্রবন্ধে ভৌগোলিক অর্থের উত্তর আফ্রিকাকে আলোচনাক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে) থেকে কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকাতে প্রচলিত হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে এখন বিভিন্ন গবেষণাতে দেখা যাচ্ছে, নাইজের নদীর অববাহিকাতে 'বহিঃপ্রভাব' ছাড়াই এসব জিনিস গড়ে উঠেছিলো। তা বহিঃপ্রভাব থাকুক বা না থাকুক, কৃষিভিত্তিক সভ্যতা প্রাক্‌শিল্প (pre-industrial) পর্বে যে গড়ে উঠেছিলো আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—সেটাই আমাদের কাছে বড় কথা। মহাদেশের পূর্বভাগে যেসব অঞ্চলে তা সম্ভব হয়েছিলো তার মধ্যে বর্তমান সুদানস্থিত নুবিয়া বা কুশ অন্যতম। এ রাজ্যের রাজধানী ছিলো মেরোয়ে (Meroe) নগরে, যেখানে খর্বাকৃতি পিরামিড এখনও সে-সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। এ অঞ্চল আফ্রিকাতে লৌহকর্মের একটি আদিতম কেন্দ্র হবার দরুণ কলোনিয়াল আমলে মেরোয়ে শহরকে 'বার্মিংহাম অফ আফ্রিকা' বলা হতো। মিশর থেকে ফারাওনিক সভ্যতার প্রভাব পড়লেও, এ অঞ্চলে নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো। এ রাজ্য ধ্বংস হয়েছিলো আক্‌সুম নগর থেকে আগত ইথিওপিয়ানদের আক্রমণে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, এবং সেই আক্‌সুমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো

ইথিওপিয়ার সমৃদ্ধ সভ্যতা। প্রাক–খ্রীস্টীয় যুগেই সে সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়ে গিয়েছিলো, ইয়েমেন অঞ্চল থেকে সেমেটিক গোষ্ঠীর জনসঞ্চরণ ঘটেছিলো এখানে, স্থানীয় নিগ্রয়েড, হামিটিক ও আগত সেমেটিক জাতির মিশ্রণে গড়ে ওঠে ইথিওপিয়ান জাতি ও তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি।

অক্‌সুম (Axum) নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ইথিওপিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতি। সমগ্র আফ্রিকাতে যে দু'টি অঞ্চলে লিখিত ভাষার উদ্ভব হয়েছিলো তার একটি হলো ইথিওপিয়া; অন্যটি পশ্চিম আফ্রিকার বর্তমান লাইবেরিয়া। লাইবেরিয়ার সে ভাষাটির নাম 'ভায়ি', ব্যবহারের অভাবে আজ তা মৃতপ্রায়, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চর্চার সুযোগ আছে। ইথিওপিয়ার আদি ভাষাটির নাম ছিলো 'গী'জ', যার লিপি ছিলো হিব্রু–ভাঙ্গা। বর্তমানে তা থেকে জাত তিনটি ভাষা 'আমহারিক', 'গাল্লা' ও 'টিগ্রিয়ানা'র মধ্যে 'আমহারিক'ই প্রধান, সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এবং সে দেশের সাহিত্য ও সরকারি কর্মের বাহন। এই রাজ্যের রাজা এজানা (Ezana) ৩৪২ খৃস্টাব্দে সিরিয়ান সাধু (তিনি ভারতের দিকেই আসছিলেন) ফ্রুমেনটিয়ামের দীক্ষায় খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইথিওপিয়াতে কপ্টিক খ্রীস্টীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি রচনা করেন। প্রাক্–খ্রীস্টীয় সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে ঐ আক্‌সুম শহরেই আছে একাধিক একপাথরি স্তম্ভ (ওবেলিস্ক), যাদের নির্মাণের উদ্দেশ্য আজও অজানা। সর্বোচ্চটি ভেঙে পড়ে আছে এখনও, দশম শতাব্দীতে স্থানীয় ইহুদি রানী জুডিথ যখন খ্রীস্টধর্মকে ইথিওপিয়া থেকে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করেন, তখনকার যুদ্ধে। দ্বিতীয়টি দাঁড়িয়ে আছে, তৃতীয়টি ফ্যাসিস্ট–পর্বে মুসোলিনি বয়ে নিয়ে যান এবং আজও তা রোম শহরের একটি ট্রাফিক–দ্বীপে শোভা পাচ্ছে। গ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত লোহিত সাগর–তীরবর্তী আকুলিস বন্দরের (এখন মাসাওয়া) মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে এবং গ্রীসের সঙ্গে আকুসুম যোগাযোগ রাখে, তাদের কপ্টিক খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্র হিসেবে থেকে যায় আলেকজান্দ্রিয়া। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে নির্মিত একপাথরি গির্জাগুলো এখনও বিদ্যমান, এমনকি কালের হস্তাবলেপ সত্ত্বেও তাদের প্রাচীরগাত্রের চিত্রণের অবলেশও রয়ে গেছে আজকের দর্শকের জন্য। সপ্তম শতকের ইসলামী আক্রমণ এই পার্বত্য রাজ্যকে স্পর্শ করে নি, যেমন করে নি সুদানের ডোনগোলা প্রমুখ খ্রীস্টীয় রাজ্যকে। তাই প্রায় চতুষ্পার্শের ইসলামী সংস্কৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে এই খ্রীস্টীয় সভ্যতা অভ্যন্তরে বজায় থাকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত। লেখা শুরু হয়ে গেছে রাজদরবারের নিযুক্ত লেখক (দেফ্‌তারা,–দপ্তরী কথাটার সঙ্গে সাধর্ম্য লক্ষ্য করবার মতো; ইথিওপিয়ার ভাষাও, নরগোষ্ঠীর মতোই, মিশ্রিত) দ্বারা রাজকাহিনী 'কেরবা–নাগাস্ত'। দ্বাদশ–ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, তার আগেই আকসুমের পতন হয়েছে, ঐ বিশেষ সময়ে সলোমন রাজবংশের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে একটা ছেদ পড়েছিলো। জাগোয়ে রাজবংশ ক্ষমতা অধিকার করেছিলো, নতুন রাজধানী স্থাপন করছিলো মধ্য–ইথিওপিয়াতে, সে বংশের বিখ্যাত রাজার নামেই সে পত্তনেরও নামকরণ হয়েছিলো লালিবেলা। সেখানে নির্মিত হয়েছিলো একাধিক একপাথরি (অর্থাৎ, পাথরের পর পাথর বসিয়ে 'নির্মিত' নয়, পাহাড়ের গা কেটে তৈরি সৌধ, ভারতের ইলোরার মতো) গির্জা। ঐতিহাসিক টয়েনবি যার প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। যথারীতি ভারতীয় স্বাজাত্যবোধের

এবং কিছু ভারতপ্রেমিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের কথামতো মনে করা হয়েছিলো যে আক্‌সুমের স্তম্ভগুলোতে বৌদ্ধপ্রভাব এবং লালিবেলার গির্জায় আছে ইলোরার প্রভাব। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যদিও লালিবেলার তারিখ অনেক পিছিয়ে নেবার পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি ঐ অনর্থক প্রভাব-অনুমানকে নাকচ করেছেন তাঁর India and Ethiopia পুস্তকে।

ষোড়শ শতকের গোড়াতে তুর্কি আহমেদ গ্রানের ইসলামী অভিযান ইথিওপিয়াতে খ্রীস্টধর্মকে বিপন্ন করেছিলো, রাজা আশ্রয় নিয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিমে, মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল ছিলো দক্ষিণ-পূর্বে হারার নামক প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে, আজও যা তার রাস্তাঘাট, পাথরের বাড়ি নিয়ে বিদ্যমান, আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে বাইরে। ভাস্কো দা গামার পুত্র ক্রিস্তফ্ দা গামার সাহায্যে খ্রীস্টধর্ম পুনরুজ্জীবিত হলো, এবং আহমদ গ্রান এবং ক্রিস্তফ দু'জনেই নিহত হলেন বটে, কিন্তু হারারকে ঘিরে প্রধানত গাল্লা উপজাতির মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি বজায় রইলো, রাজনৈতিক কর্তৃত্বও। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে হারার সম্রাট মেনেলিক আক্রমণ করে এমিরেটের অবসান ঘটান, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এখনও সজীব। 'হারারী' নামে একটি উপভাষাও গড়ে উঠেছে অঞ্চলে, সাজপোশাকে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। এদের নানা বর্ণে রঞ্জিত বেতের ঝুড়ি, দেয়ালশোভনচক্র এদের শিল্পবোধের পরিচায়ক। এই হারার, যার সঙ্গে বর্তমান জিম্বাবুয়ের হারারে (Harare, প্রাক্তন Salisbury) শহরকে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে, ছিলো কিছুকালের জন্য ফরাসী কবি র‍্যাঁবো'র বাসস্থান, তার বাড়িটি আজও রয়েছে, এবং এখানকার হায়েনার হাসিই শোনা যায় কবিদের রচনাতে।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, যখন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হারার এমিরেট হিসেবে অটুট ছিলো, বাকি ইথিওপিয়াতে লেক টানার (ব্লু নীল নদীর উৎস) তীর- সন্নিকট গোণ্ডার শহরকে ভিত্তি করে পুনরায় গড়ে উঠলো খ্রীস্টীয় রাজ্যটি। পর্তুগীজ অস্তিত্ব ইতোমধ্যে ইথিওপিয়াতে অর্থপূর্ণ হয়েছে, তারা এসেছিলো উপকথার রাজা প্রেস্টার জনের রাজ্য খুঁজতে। গোণ্ডার শহরে যে রাজপ্রাসাদগুলো এখনও বর্তমান, এবং পর্যটক-আকর্ষক, তাদের স্থাপত্যে পর্তুগীজ প্রভাব স্পষ্ট। তাদের তৈরি গির্জাগুলোর ফ্রেস্কো মনোরম, এবং ইতোমধ্যে চার্চকেন্দ্রিক যে ধর্মীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিলো, সেসব পুঁথির রঙিন চিত্রণ অসামান্য শৈল্পিকগুণমণ্ডিত। গোণ্ডার-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইথিওপিয়াতে কিছুটা রাজনৈতিক অরাজকতার অন্তে রাজা থিওডোরাস অভ্যন্তরের এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত শীর্ষে মাগডালাতে তার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন— ততোদিনে আফ্রিকা ইয়োরোপীয় দেশগুলোর স্বার্থ-বিবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠছে ; ইংরেজদের দু'জন প্রতিনিধিকে hostage রেখেছিলেন বলে চার্লস নেপিয়ার ভারত থেকেই অভিযান করে এঁকে পরাজিত করেন এবং আত্মসমর্পণের বদলে আত্মহত্যার মাধ্যমে এই শাসকের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছিলো ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য এ ঘটনা ইথিওপিয়াতে ইংরেজ উপনিবেশ-অধিকার স্থাপন করে নি। এর প্রায় ত্রিশ বছর পরে ইথিওপিয়ার আধুনিকীকরণের প্রথম স্থপতি সম্রাট মেনেলিকের সৈন্যরা আডোয়ার যুদ্ধে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত ক'রে, ইথিওপিয়াকে আফ্রিকা বিভাজনের

কালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অটুট রেখেছিলো। পশ্চিমে লাইবেরিয়াকে (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দেশ ছিলো আমেরিকা–নিয়ন্ত্রিত) বাদ দিলে ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়াই ছিলো আফ্রিকাতে একমাত্র স্বাধীন দেশ।

সাহারা মরুভূমি হাজার ছয়েক বছর আগে মরুভূমি ছিলো না। সেখানে মনুষ্যবসতির প্রমাণস্বরূপ রয়ে গেছে পর্বত গাত্রের চিত্রাবলি। প্রাকৃতিক এবং সম্ভবত মানবিক কারণেও (অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষনাশ) এ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হলে, একাধিক কৃষিজীবী উপজাতি দক্ষিণমুখী হয়ে পশ্চিম আফ্রিকাতে বসতি স্থাপন করেছিলো। কালক্রমে আফ্রিকার সে অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো সাহারানিম্ন সাহেল অঞ্চলে ঘানা, টেকরুর, মালি, সোংঘে, কানেম–বর্ণু প্রভৃতি সুগঠিত রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজ্য বা সাম্রাজ্য, বা কানো, কাটসিনা, জারিয়া প্রমুখ হাউসা নগররাষ্ট্র। এদের মধ্যে ঘানা ছিলো সুপ্রাচীন, সম্ভবত খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তার গোড়াপত্তন হয়েছিলো। ঘানার ইতিহাস জানবার জন্য রয়েছে এর পতনের ঠিক আগে লেখা এলো বক্‌রির বৃত্তান্ত এবং বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত রাজধানী কুমলি আলে'র ধ্বংসাবশেষ। ১০৬৭ খ্রীস্টাব্দে এলো–বকরি লিখছেন, সে রাজ্যের রাজা ও রাজবংশ পেগান, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌঁছেছে। তারা শহরের অন্য অংশে বসবাস করে, রাজার উপাধি 'কায়ামাখান', দূরপাল্লার বাণিজ্যে (লবণ–কেনা ও সোনা–বেচা) রাজ্য সমৃদ্ধ, ইত্যাদি।

ইসলাম এ অঞ্চলে আসে শান্তিপূর্ণভাবে, উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত বণিকদের মারফত। মালি, সোংঘে ও হাউসা রাজ্যে এবং কানেম–বর্ণুতেও ইসলামী সংস্কৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এখানকার তিমবুকতু শহরের ইসলামীয় বিদ্যাচর্চা, কায়রো থেকে আগত স্থপতি আল–সহেলি দ্বারা প্রবর্তিত স্থাপত্য (আজও তার নিদর্শন বর্তমান, মসজিদে ও কিছু পুরোনো বাড়িতে), ইত্যাদির বর্ণনা পাবো আমরা ইব্‌নে বতুতা প্রমুখ পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের কানো, গাও, জেনে কাট্‌সিনা ইত্যাদি শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রিক প্রাণচঞ্চল নাগরিক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা রেনে কাইয়ে, হাইনরীখ বার্থ, নাখটিপাল প্রমুখ ইয়োরোপীয় পর্যটকদের রচনাতে পেয়েছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এ অঞ্চলে ইসলাম 'বিকৃত' হচ্ছিলো—এই অভিযোগে কিছু ফুলানি পণ্ডিত কয়েকটি জিহাদ অনুষ্ঠান করেন, তার ফলে বর্তমান উত্তর নাইজেরিয়াতে হাউসা অঞ্চলে গঠিত হয় একটি বিশাল ফুলানি সাম্রাজ্য (রাজধানী সোকোটো) আবদুর রহমান ইবনে ফুদির নেতৃত্বে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে)। বিভিন্ন এমিরেটে বিভক্ত এই ফুলানি সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এতো সুগঠিত ছিলো যে লর্ড লুগার্ড বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইনডাইরেক্ট রুল–এর নাম করে কলোনিয়াল আমলেও তাকে অটুট রাখেন প্রাদেশিক শাসনকার্য চালাবার জন্য।

অরণ্য অঞ্চল অতিক্রম করে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলাম তেমন পৌঁছুতে পারে নি। সেখানে সনাতন ধর্মভিত্তিক কতিপয় আফ্রিকান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো, যার মধ্যে আশান্টে, ফান্টে, দাহোমে, ইয়োরুবাদের ওইয়ো (oyo), বেনিন অন্যতম। এদের বস্ত্রশিল্প, ভাস্কর্য (বিশেষ করে ইফে ও বেনিন), লোকগাথা, দর্শন অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে

ওঠে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় আকান অর্থাৎ আশান্টে রাজ্যের এবং ইয়োরুবাদেব দর্শন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন "Africanism, the African Personatily" বইয়ে। বিশেষ করে ওইয়োর শাসনব্যবস্থা ছিলো জটিল, সেখানে 'আলাফিন' উপাধিধারী রাজা, 'কাকান ফো' উপাধিধারী সেনাপতি ও 'বাসোরান' উপাধিধারী ওয়োমেসি নামক, সংসদের নেতা—এই ত্রয়ীর মধ্যে শক্তিব ভারসাম্য বজায় থাকত। উনবিংশ শতাব্দীতে ফুলানি জিহাদের ফলে উত্তর থেকে ফুলানিবা ইলোরিন নামক ইয়োরুবা রাজ্যটি অধিকাব করেছিলো। এ ঘটনার প্রবল ধাক্কায় বহু ইয়োরুবা শরণার্থী দক্ষিণে নেমে আসে—ইয়োরুবাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইয়োরুবা অঞ্চলে নতুন নতুন নগব রাষ্ট্র গড়ে ওঠে প্রধানত সামরিক কারণে, যার মধ্যে বর্তমান ইবাদান ও আবেওকুতা অন্যতম। কিন্তু ততোদিনে দাসব্যবসায় আইনত রদ হয়ে এ অঞ্চলে ইয়োরোপীয় কলোনিয়াল শাসনের গোড়াপত্তন হতে চলেছে।

ইয়োবোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরা যখন পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে প্রথম কঙ্গো নদীর মোহনার কাছে পৌছুয তার কিছু পবেই, কাছাকাছি বাকোঙ্গো ও ইম্বাদালা নামে দু'টি সংগঠিত রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ পায়। পবে বর্তমান অ্যাঙ্গোলা ও জাইরে দেশের ব্যাপক আফ্রিকান সংস্কৃতিব সঙ্গে তাদেব পবিচয় ঘটেছিলো। একাধিক রাষ্ট্রেব ইতিহাসে পর্তুগীজ প্রতিরোধের গৌরবময নজির বয়ে গেছে সেখানে। অভ্যন্তরে ছিলো 'সোয়াতা-ইয়াম্‌ভা' নামক এক বিশাল সাম্রাজ্য। তাকে লুবা-লুণ্ডা সাম্রাজ্যও বলা হয় দুই প্রধান জাতিব নামেব ভিত্তিতে। ষোড়শ শতাব্দীতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও নানা কারণ হেতু এ সাম্রাজ্য ভেঙে বহু মানুষ দক্ষিণে নেমে গিয়ে বর্তমান জ্যাম্বিযা, মালাউই এবং জিম্বাবুয়েতে রাষ্ট্রগঠন করে। তাদের মধ্যে লুযাপুলা নদী-তীরবর্তী লুণ্ডাদের কাজেম্বে (Kazembe) রাষ্ট্র, উত্তব জ্যাম্বিয়ার বেম্বা রাষ্ট্র, পশ্চিম জ্যাম্বিয়ার লুয়ি বা লোজি (Lozi) রাষ্ট্র, মারাভি এবং লোনাভাষী কাবোঙ্গা উপজাতিব জিম্বাবুয়ে বাষ্ট্র সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত গৌরবময় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো। বেম্বা রাজার উপাধি ছিলো চিঠিমুকুলু লোজিদের লিউয়ানিকা, এবং জিম্বাবুয়েব মুযেনি মুটাপা (Mweni Mutapa), যা পর্তুগীজ বিকৃতির ফলে দাঁড়িয়েছিলো 'মোনো পাটাপা'তে। 'জিম্বাবোয়ে' শব্দের অর্থ পাথরের তৈবি দুর্গ। আজও সেই দুর্গ বা বাজপ্রাসাদেব ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে গৌরবময় ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হিসেবে। এদের অর্থনৈতিক শক্তিব ভিত্তি ছিল ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও দূবপাল্লার বাণিজ্য। ধ্বংসাবশেষে ভারতীয় ও চৈনিক মুদ্রা, বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এদের মতো কাজেম্বেরও সমৃদ্ধির উৎসে ছিল দূরপাল্লার বাণিজ্য, এবং কাটাঙ্গা অঞ্চলের তাম্রখনির ওপর কাজেম্বে রাজাদেব ছিলো একচেটিয়া অধিকার। এরাও পর্তুগীজদের ঠেকিয়ে রেখেছিলো, রাজ্যের ওপর প্রভাব বা আধিপত্য বিস্তাব করতে দেয় নি। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা যায এরা লিভিংস্টোনকে পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখছে রাজদর্শন দেবার আগে। ১৯০২ সালে সামরিক শক্তি প্রয়োগে এ অঞ্চলকে ইংবেজ-অধিকৃত বর্তমান জ্যাম্বিয়ার অন্তর্গত করা হয়েছিলো। পুরোনো শহর-পরিকল্পনার নজির হিসেবে বিশাল গ্রাম কাজেম্বে এখনও জ্যাম্বিয়াতে বিদ্যমান। নগর-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে

যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ওলন্দাজ পর্যটক ওলফের্ট ডাপের পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন শহর দেখে বলেছিলেন, এর নগর-পরিকল্পনা তৎকালীন আমস্টারডাম অপেক্ষা উন্নত।

আফ্রিকা-দক্ষিণেও অনুরূপ রাষ্ট্র গঠন হয়েছিলো কিছু পরে। সামরিক সংঘর্ষের অন্তে সেখানে শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থায়ী হয়েছিলো জুলু, ত্সোয়ানা, সোয়াজি, সোথো, গাজা, ইত্যাদি রাষ্ট্র। জুলু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শাকা ছিলেন একজন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। তার নামে প্রচলিত আছে অনেক কাহিনী, তাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস ও নাটক। তেমনি সোথো রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোশোয়ে শোয়েকে নিয়েও। এই সব রাজ্যের মধ্যে গাজা নিশ্চিহ্ন হয়েছে মোজাম্বিকের মধ্যে এবং জুলু এখন দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের অন্তর্গত। বাকি তিনটি বৎসোয়ানা, সোয়াজিল্যাণ্ড ও লেসোথো নামে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বিদ্যমান। এছাড়া তৈরি হয়েছিলো খ্‌খসা (Xhosa) দের ছোট ছোট রাজ্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে। রোমান হরফে হলেও জুলু, সোথো ও খ্‌খসা ভাষাতে লিখিত সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই।

পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে আরব ও আফ্রিকান সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে মধ্য যুগে গড়ে ওঠে মোগাদিসু মোম্বাসা, মালিন্দি, কিলোয়া, জাঞ্জিবার ইত্যাদি সোয়াহিলি নগররাষ্ট্র, যাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিলো বাণিজ্য। সোয়াহিলি সাহিত্য (আগে রচিত হতো আরবী হরফে, এখন হয় রোমানে) অতি সমৃদ্ধ। অভ্যন্তরে যেসব রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিলো তাদের মধ্যে আচোলি, বুগাণ্ডা, বুনিয়োরো, বুরুণ্ডি ইত্যাদি প্রধান। এদের সঙ্গে সোয়াহিলি উপকূলের বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। এছাড়া ছিলো কৃষিজীবী গিকুউ বা পশুপালনজীবী মাসাই প্রমুখ ছোট বড় উপজাতি। তাদের সুগঠিত রাষ্ট্রযন্ত্র না থাকলেও প্রশাসনিক সংস্থা ছিলো। কেনিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক ন্গুগি বা থিওঙ্গো এখন সাহিত্য রচনা করেন তাঁর মাতৃভাষা গিকুইউতে।

এই রকম একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ওপর হামলা দিয়েছিলো ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্য, যার অভিঘাতে আধুনিক আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর সৃষ্টি এবং আধুনিক সাহিত্যেরও সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে ইয়োরোপীয়রা আসার আগে আফ্রিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো বলার তো কোনো মানে হয় না।

মৌখিক সাহিত্য

আমার অসুখী মুখের সঙ্গে তোমার সুখোজ্জ্বল মুখ
বদল করো, হে চন্দ্রমা। যে মুখ নিয়ে তুমি মৃত্যুর পরেও ফেরো;

ঘুমপাড়ানি গান

পীরিত কবিস না আমাবে ?
ব্যাঙ ব'নে যাবে
থপ্‌থপিযে লাফাবে —
এক—পেযে হনু হবে —
থপ্‌থপিযে লাফাবে —

দুই দাঁতেব মাঝে ফাঁক ? —
মাগো! ঈগল তাদেব দেশে
পরে পুঁতির মালা কেশে।
মাগো! মাছি তাদেব দেশে —
মাথায় টুপি ঠাসে।
মাগো! আরশোলা সেই দেশে
জুতো পরে ক্লেশে —
মাগো! বুড়ো বাজ সেই দেশে
আকাশে, পাখনা মেলে শেষে।

—বোংগা উপজাতি (মোজাম্বিক)

কন্যাবন্দনা

ওগো সুকন্যা, আরশিগো তুমি —
বোদে বেবোবাব নও,
তুমি শিশু এক যাকে যেন শিশিরেও না ছোঁয।
সুকেশীগো,
তুমি যেন পথভোলা পথিকের দীপ।
উজলা শশীরে তুই,
নাগরের কেশদামে ঈগল-পালক,
দেবতার হাতে আঁকা ঋজু এক রেখা।

—ইগ্‌বো (নাইজেরিয়া)

তরুণ-যুবকবন্দনা

তরুণ যুবা কে তুই
পাহাড়ের গায়ে ধাবমান শশক,
হাতিটানা কাছি,
বাঘ মারা সিংহ,
মাটিতে নোয়ায় না যে মাথা
যেন ইন্দ্ গাছের গুঁড়ি।

—ইগ্‌বো।

শাসকবন্দনা

প্রকান্ড পুরুষ, উদরে পোরা উইঢিবি,
যুদ্ধক্ষেত্রে সন্তানসম্ভবা তুমি, দাঁত ভাঙ্গে মর্যাদা কালো।

গাছের ডালে বসে বাঁদরকে ঠেকায কে —?
সিংহাসনে তোমার অধিকার কাড়ে কে বলো ?
কার আছে হিম্মৎ তোমার সঙ্গে লড়ার ?
গাছের গুঁড়ি ধরে যতই নাড়া দাও, নড়বে শুধু তুমি
তোমাকে ঠেকায় কে ?

তুমি মৃত্যু–মতো, যে হঠাৎ মানুষের অক্ষিগোলক খুবলে নেয়।
তুমি একটি বড় পাকা ফল, যা শিশুর মাথায় পড়ে মাঝরাতে।

এক যুদ্ধ করতে করতে পরের যুদ্ধের কথা ভাবো —
প্রভু, দুনিয়াটাকে একটু জিবিয়ে নিতে দাও।
তোমাকে কুর্নিশ করলেও বিপদ, না করলেও তাই।
যেখানে যাও, ঝুলি ভরে নিয়ে যাও সর্বনাশের আগুন।
ধীরে মারো শত্রুকে, শান্তভাবে লাউ কেটে দুভাগ করার মত।
চিতাবাঘ যখন হত্যা করে, লেজটা তার শান্তভাবে মাটিতে বুলায়।
মুখ ব্যাদন করো যখন তুমি, তখন নীরবে গ্রাস করো।

—ইযোরুবা (নাইজেরিয়া)

রাজবন্দনা

ওবাকে: চেনো না তুমি, ঐ দেখো তিনি।
ঐ যে আরুঢ় সিংহাসনে, সারি সারি রাজাসন।
পদতলে বালুকণা, পিছনেও রাজে।
দু'হাজার হাত চামর দোলায়।

প্রভু তোমার, তোমারই সমুখে আসীন
ছোট রাজা রাজাসন পরে। রাজাসন দখলে তাঁর,
তার পরে তাঁর সিংহাসন
এ বছর তোমার বাঁচার পথ।
তুমি হবে দীর্ঘজীবী।

—বেনিন (নাইজেরিয়া)

(১. 'ওবা' ছিল প্রাচীন বেনিনের মহারাজার উপাধি।)

শকুন ডোংগো

ওহে যোদ্ধারা, মনে ডর নাই তোমাদের
কান পেতে শোনো এই শকুনেব গান, —
অমর যে সঙ্গীত।
আমি গান গাই, শকুন-গৌরবগাথা —
মান্‌সু যাহার নাম।
মান্‌সু যদি বলেন 'হ্যাঁ',
কার বুকের পাটা আছে, জবাবে বলবে 'না' ?
কার হিম্মত হবে মান্‌সুর দিকে
মাথা তুলে দাঁড়াবার?

অভিশাপ দিই তাকে!
দিনের আলো দেখবে না কভু সে।

আমি গান গাই মান্‌সু-গৌরবগাথা।
তিনি হলে অবতীর্ণ, ধবাতে ফাটল ধরে।
চার পাখা ভর ক'রে, উড্ডীন আকাশে ঐ।
ধরা পায় প্রাণ, যবে তিনি উড্ডীন।
কাপুরুষে তাব ঘৃণা।
"যুদ্ধে-হত বীরের হৃদয় নাহি ভক্ষণ করে।"

—বাম্‌বারা যুদ্ধের গান (মালি)

প্রেমের পাখি

ওগো লম্বাঘাগরা-পরা দিয়াম্বেরে!
আমাকে পাখির গান গাইতে দাও!
সে পাখিরা পথ-চলা রাজনন্দিনীব
গান শুনেছিল। পেয়েছিল তার শেষ সমর্থন।

তোমরা যুবতী গান গাও মিঠা স্বরে
ইয়া . . . ! ইয়া . . . ! . . . . সুন্দর পাখি —
ওগো তুমি ভয়াল–বন্দুকধারী,
প্রাণের পাখিব ধ্যানে দিও না বাধা,
যে পাখি ভালবাসাব ধন
আমার ও বন্ধুদেবও।
ওগো বুবু–পবিহিত প্রভু
উজ্জ্বল–পোশাক, ম্লান কবো দিবালোক,
ভালবাসাব পাখিকে আমাকে ভালবাসতে দাও।

—বাম্‌বারা (মালি)

চশমা

বহুকাল আগে মবেছে তাহাব আঁখি,
তার মাঝে আজ মেঘ দেখা যায় দেখি।
ওগো মাস্টার, মবেছে তাহাব চোখ
আজ তার মাঝে শুধু হায় মেঘ দেখি।
মৃত তাব চোখ, আহা কতোকাল আগে ;
কখনও ভোলে না চশমা আঁটতে চোখে,
মবেছে যে চোখ বহুকাল আগে
তাব মাঝে শুধু ঘোলাটে মেঘেবে দ্যাখো।

— আচোলি (উগান্ডা)

[চশমা নেওয়া নিয়ে বাঁধা কবিতা]

শোক

ওবা ও কী গান গায়—
শোকেব কান্না যেন ?
ফাটকেব পথে আমার ভাইটি একা—
ও কী গান শুনি,
শোকের কান্না যেন ?
আমিও মেলাই গলা,
বুকটা হাল্‌কা হবে।

—বেম্বা (জ্যাম্বিয়া)

[ভাইকে ইংবেজের জেলে ধবে নিযে যাওযা উপলক্ষে বোনেব আর্তি]

বুলেট বানাই ?

আবো সংসদে বার্তা পাঠাও—
বন্দুক দিয়ে চালাবে শাসন ?
কোদালের কোপে মানুষ দাবাও ?
হন্যেরে ভাই লাইসেন্স্ চেয়ে,
সাইকেল ঘবে বাঁধা !
এদিকে সেপাই ঘোবে-ফেরে দেখো
দিব্যি মোটরভ্যানে !
বেচারা বালক হাটে যাবে শুধু,
তাকে ধরে ভ্যানে তোলে !
চাস কী বে তুই সংসদ-প্রভু !
চাষবাস ছেড়ে, দোকানের ঝাঁপ ফেলে,
শুধুই বুলেট বানাই ?

—ইবো (নাইজেবিয়া)

[সেনাশাসনের প্রতিবাদ]

নারীর রূপ

তোব গলে শোভে হবেক পেতল-বালা।
এত বালা আর কাবো গলে দেখি নাই।
ছুটে যাস যবে, ওড়ে যত মিহি ধুলো—
যেন ডানা ঝাঁকে হাজারেক প্রজাপতি।
ওরে তোব রূপ কারিগর খুদে' কাঠে
শতেক মূবতি গড়ে।
শান্ত আঁখিব তুলনা ঘুঘুব চোখে।
ঋজু গ্রীবা তোব, শিকাবীর দিঠি হানে

—ইয়োরুবা (নাইজেরিয়া)

প্রিয়া

হালকা রং, লম্বা মসৃণ চুল ;
মধুগন্ধে ভরা দেহ, মেছো গন্ধ ছাড়ে না নিঃশ্বাসে।
কাঠকুড়ুনিব গাযেব ঘামেব গন্ধ ঐ দেহে নেই।
মোটবাহীদেব মত মাথাজোড়া টাক নেই।
শুভ্রদন্তী নারী, নবজাত হবিণীব চোখ তাব।
হরিণমাতার কোমল বাঁট থেকে
প্রথম-ঝরা দুধেব মত কোমল তার দুই আঁখি।
পায়ের পাতা, হাতের তালু খড়খড়ে নয় মোটে,
মেটের মত মসৃণ তারা।

—ফুলানি (পশ্চিম আফ্রিকা)

চাঁদ

চাঁদ দেয় আলো রাতে
দুনিয়াকে দেয় আলো।
তবু রাত রাতই থাকে, দিন তো হয় না কভু!
জোছ্না যতই ভাসুক
কাপড় শুকোবে তাতে?
নাবী নারে নর হতে
যতই কোশিশ্ করো
কালো তো হবে না ধলা!

—সুসু (ঘানা)

মৃত্যু

আমার অসুখী মুখের সঙ্গে তোমাব সুখোজ্জ্বল মুখ
বদল করো, হে চন্দ্রমা। যে মুখ নিয়ে তুমি মৃত্যুর পবেও ফেরো;
তুমি ঘুমাও, তবু ফিরে আসো। প্রতিবারে ফেরো জীবন্ত হযে।
একদিন কথা দাও নি তুমি ? আমরাও ফিরবো মরণের পর?
আবার হব সুখী ?—

*—শান্ (আফ্রিকা-দক্ষিণ), অর্থাৎ
যাদের 'বুশম্যান' বলা হত।*

ঈশ্বরের কাজ

আগুন আঁধাবে বিলীন হল। শিখা নিবে যায়। কপালে দুঃখ আছে।
ঈশ্বর যান সূর্যেব খোঁজে। হাতে তার ঝিলিক্ দেওয়া রামধনু।
দ্রুতহাতে ভরে নেন ঝুড়ি। মেযেদের ক্ষিপ্র হাতে গিরগিটি–কুড়োনোর মত।
যতক্ষণ না উপচে পড়বে আলো।

*—খোই-খোই (আফ্রিকা-দক্ষিণ), অর্থাৎ যাদের
হটেন্‌টট্ বলে অবজ্ঞা করা হত।*

স্পর্শকাতর

শিশু এক ইয়োরোপিয়ান
একটি ইয়োরোপিয়ান শিশু।
আমাদের খাবার মুখেও নেয় না সে।
জল খায় নিজের জলের কলসি থেকে।
শিশু এক ইয়োরোপিয়ান।
আমাদের ভাষা সে বলে না।

ওর কথা বোঝে না আমার মা
তাইতো যায় ক্ষেপে।

শিশু এক ইয়োরোপিয়ান।
পরের জন্য নেই কোনো মাথাব্যথা;
জুলুম করে নিজের মা–বাবার 'পব।

শিশু এক ইযোরোপিয়ান,
আহা, বড় স্পর্শকাতব।
চামড়া একটু ছড়ে গেলেই
গা ভবে ঘায়ে।

—এবে (ঘানা)

শোক

তোর মরণ মোবে তাজ্জব করে
কোথা তোর বাসন–কোসন ?
এত তড়িঘড়ি বিক্রি হল ?
বাপের সঙ্গে হলে দেখা—
সহজে চিনবে কি মোকে ?

দেখবে বয়ে চলেছি যা কিছু সম্বল;
ছেঁড়াখোঁড়া মাদুর আর মাছিব ঝাঁক।
রাত নামে দ্রুত।
অনাথ মায়ের দেখা চেয়ে ফেরে।

—আকান (ঘানা)

নিদ্রা

এ দুনিয়ায় আছে এমন জিনিস
যা অনেক–অনেক মিঠা।
চিনি, মধু—তাবৎ মিষ্টি জিনিস ছাপিয়ে— ,
তার নাম ঘুম।।
যদি ঘুম পায়, ঠেকাতে পারবে কেউ ?
আটকাবে কিসে তোর ঘুম ?
লাখ–লাখ মানুষেরও সাধ্যি নয় রোধ করে তাকে।

—সুসু (ঘানা)

এই মৌখিক সাহিত্যাংশের অনুবাদক : ধ্রুব গুপ্ত

সৃষ্টিতত্ত্ব

ঈশ্বব সৃজিলেন এক মানব, তাব নাম দিলেন চন্দ্র। আদিতে চন্দ্রেব বাস ছিল সমুদ্রগর্ভে। তাহাব সাধ গেল সে পৃথিবীতে বসবাস কবে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে সতর্ক করিলেন : পৃথিবীতে জীবন দুর্বিষহ, পবে তুমি পরিতাপ করিবে।

তবু চন্দ্র পৃথিবীতে গমন করিল। তৎকালে পৃথিবী ছিল শূন্য, জনমানববিহীন। সেথায় না ছিল বৃক্ষ, না ছিল তরুলতা, না কোনো প্রাণী। চন্দ্রেব তাহাতে বিষম দুঃখ উপস্থিত হইল এবং সে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ঈশ্বব কহিলেন : আমি তো আগেই বলিযাছিলাম, কিন্তু তুমি শুনিলে না। যাহাই হউক, আমি তোমার সহায হইব। তোমার একটি স্ত্রী জুটিবে, সে তোমাব সহিত দুই বৎসব কাল বসবাস কবিবে।

ঈশ্বর শুকতারাকে প্রেরণ করিলেন চন্দ্রের সহিত সহবাসেব নিমিত্ত। শুকতারা স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনিল আগুন। রাত্রে চন্দ্রেব কুটিবে শয়নকালে সে আগুন জ্বালাইয়া একপাশে শযন কবিত, চন্দ্র শযন করিত অপব পার্শ্বে। কিন্তু গভীব নিশাকালে চন্দ্র অগ্নিকে অতিক্রম করিয়া শুকতাবার সহিত সঙ্গমে রত হইল।

পবদিন প্রভাতে চন্দ্র দেখিল শুকতারা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। তাহার গর্ভ হইতে জন্ম নিল বৃক্ষলতা, তৃণাদি এবং সমগ্র পৃথিবী হইল হবিৎবর্ণ। বৃক্ষেরা বাড়িতে লাগিল, বাড়িয়া তাহারা হইল গগনস্পর্শী। তাহাবা গগনচুম্বন কবাতে উদ্ভব হইল বৃষ্টিব। চন্দ্র ও শুকতারার জীবন প্রাচুর্যে ধন্য হইল। তাহাবা ফলমূলবীজ ভক্ষণ করিল।

দুই বৎসব গত হইলে ঈশ্বর শুকতারাকে ডাকিযা পুনরায় আকাশে প্রেরণ কবিলেন।

আটদিন ধরিয়া চন্দ্র খুব কাঁদিল। তখন ভগবান তাহাকে দ্বিতীয় একটি পত্নী প্রদান কবিয়া বলিলেন : এও তোমাব সহিত দুই বৎসর কালযাপন করিবে। কিন্তু তৎপর তোমার মৃত্যু ঘটিবে।

সন্ধ্যাতারা আসিয়া চন্দ্রেব সঙ্গে থাকিতে লাগিল। সেও অন্তঃসত্ত্বা হইল। জন্ম নিল ছাগল, মেষ, বৃষ ও গাভী। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যাতারা জন্ম দিল হরিণ ও পক্ষীর। তৃতীয় দিনে প্রসব করিল বালক-বালিকা। চতুর্থ দিন চন্দ্র সন্ধ্যাতারাব সহিত সঙ্গমে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বর কহিলেন : আর নহে। তোমার মৃত্যুর সময় আসন্ন। কিন্তু ঈশ্বরের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যাতাবার সহিত সে আবার সঙ্গমে রত হইল। এবারে সন্ধ্যাতারা জন্ম দিল সিংহের, চিতা বাঘের, বিষধব সর্পেব। এবং ঈশ্বর কহিলেন : সাবধান করিলাম, তুমি কথায় কর্ণপাতও করিলে না!

চন্দ্র দেখিল, তাহার কন্যারা সুন্দরী। সে এমনকি তাহাদের সঙ্গেও সঙ্গমে রত হইল।

ফলে জন্ম নিল অগণিত নরনারী। সে হইল এক বিশাল জনবহুল রাজ্যের রাজা।

কিন্তু সন্ধ্যাতারা কন্যাদেব প্রতি ঈর্ষায় চন্দ্রকে দংশন কবিবার নিমিত্ত পাঠাইল এক বিষধর সর্পকে। সর্পের দংশনের ফলে চন্দ্র পীড়াগ্রস্ত হইল। ঠিক সেই সময় বৃষ্টিপাত বন্ধ হইল। নদীনালা–সরোবর বিশুষ্ক হইতে আরম্ভ করিল। গাছগাছড়ার মৃত্যু ঘটিল, দারুণ এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। মানবেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল, কেমন কবিয়া বৃষ্টিকে ফিরাইযা আনা যায়। তাহারা সাব্যস্ত করিল, সমস্তই চন্দ্রের দোষ। চন্দ্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিযা তাহার মৃতদেহ নিক্ষেপ করিল সমুদ্রে, ভিন্ন এক ব্যক্তিকে বাজপদে অধিষ্ঠিত করিল তাহারা।

কিন্তু চন্দ্র সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে শুকতারাব পিছনে ধাওয়া করিল, তার সহবাসেই ছিল তাব সকল সুখ। আজও সে শুকতারাব প্রতি ধাবমান।

—কারাঙ্গা উপকথা (জিম্বাবোয়ে)

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

স্রষ্টা ওবাতালা

ওবাতালা মানুষেব স্রষ্টা। ওবাতালা কাদাব তাল থেকে সৃষ্টি করেন নবনাবী। সেই কাজে মাটি মাখাব জন্য তাব নিত্য দবকার হত জলের। তাই বোজ সকালে, কেউ ওঠাব আগেই, তিনি নদীতে যেতেন জল আনতে।

কিন্তু সেবাব প্রবল খবায় ছোটবড় সব নদী গেল শুকিয়ে। চাবদিকে 'জল' 'জল' বলে খোঁজ পড়ে গেল, লাভ হলো না কিছু। শেষে বনেব ভেতবে ডাকিনীরা তাদেব নিজেদের কুযো খুঁড়ে নিল। সেখান থেকে জল নেবাব ব্যাপাবে সব ডাকিনীব ছিল অবাধ অধিকাব।

ওবাতালা ডাকিনীদের কুযো আবিষ্কাব কবে ফেললেন। সেখান থেকে প্রাণভবে জল তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে বযস্যদেব পবামর্শ অনুযাযী তাব যে 'ক্ষুদ্র সলিল' ও 'প্রাচীন বাবি'ব পূজো কবে নেযা উচিত ছিল, তা তিনি নিলেন না। পরদিন থেকেই ডাকিনীবা লক্ষ্য কবল যে, কেউ গোপনে তাদেব জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পণ করল তারা, চোর ধববেই। ঘাপ্‌টি মেবে বসে থেকে পঞ্চম দিনে তাবা চোব ধরে ফেলল। ওবাতালার শত কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও তাবা তাকে ছাড়তে চাইল না কিছুতেই।

শেষ পর্যন্ত ওবাতালা দৌড়ে পালিযে এসে এগুন্‌গুনের আশ্রয নিলেন। এগুন্‌গুন্ তাকে কথা দিলেন, তিনি ডাকিনীদেব বুঝিযে-সুঝিয়ে ওবাতালাকে মুক্ত কববেন।

ইতোমধ্যে ডাকিনীবা এগুন্‌গুনেব বাড়িব বেড়াব ধাবে পৌছে গেছে। এগুন্‌গুন্ তাদের কত বোঝালেন, কিন্তু তাবা নাছোড়বান্দা। এমনকি তারা এগুন্‌গুনেব সব শক্তি কেড়ে নেবে বলে শাসালো। শেষ পর্যন্ত এগুন্‌গুন্ ওবাতালাকে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু আবাব পালিযে ওবাতালা আশ্রয় নিলেন শাঙ্গো দেবতার। এগুন্‌গুনের মত শাঙ্গো কথা দিলেন তাকে বক্ষা কবাব।

ডাকিনীবা শাঙ্গোকে ভয দেখালো, ওবাতালাকে ছেড়ে না দিলে তাদেব দণ্ড (ওসে) তার বজ্রদণ্ড (এডুন আবা) কে দেবে ভেঙে। ভয় পেয়ে শাঙ্গো ওবাতালাকে দিলেন ছেড়ে, তিনি এবাব পালিয়ে দ্বাবস্থ হলেন অরুনমিলা দেবতাব।

অরুনমিলার পুবোহিত আওইযোবোইযে দৈববাণীর ঘোষক ছিলেন। তিনি আগেই জানতেন যে, এক আগন্তুকের স্বার্থে অরুনমিলাকে পূজার অর্ঘ্য সাজাতে হবে। তাকে উৎসর্গ করতে হবে একুরু ববরটিব মণ্ড আব চাবশ' কড়ি। পুজোর পর সেসব বাড়ির চারধারে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এই অনুষ্ঠান সারা হতে-না-হতেই ওবাতালা ছুটে অরুনমিলার বাড়িতে প্রবেশ কবলেন। আশ্রয়প্রার্থীকে বসতে বললেন অরুনমিলা।

যথারীতি ডাকিনীরা এসে দাবি করলো, ওবাতালাকে চাই। অরুনমিলা বললেন 'আগে তো বসে খাওয়া-দাওয়া করো।' তারা বললে, খাদ্য চাই না, আগন্তুককে চাই। ইতোমধ্যে অরুনমিলা পুরোহিতের শেখানো ওডুমন্ত্র আওড়াতে শুরু করেছেন। ডাকিনীরা শেষ পর্যন্ত খেতে রাজি হল। খেতে বসে তারা যে ছড়িয়ে রাখা একুরুর মণ্ডর আঠাতে আট্‌কে গেছে— ডাকিনীরা তা লক্ষ্য করে নি। হাজার চেষ্টাতেও তারা নিজেদের মুক্ত করতে না পেরে শেষে অরুনমিলাকে বললো, 'ছেড়ে দাও আমাদের।' অরুনমিলা বললেন, 'আগে বলো, ওবাতালাকে মাফ করবে কি না।' তারা কথা দিল, তাদের মুক্ত করলে তারা ওবাতালা বা তার সন্তানদের কোনো ক্ষতি করবে না।

ওবাতালা অরুনমিলাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পেলেন না। অরুনমিলাকে তার লোহার ঘন্টা (আজিলা) টা দিয়ে বললেন, রাতে বাইরে বেরোলেই যেন তিনি ঘন্টাটা বাজান। সেজন্যেই আজও সব ইফা-পুরোহিত রাতে বেরোলেই আজিলা বাজায়। আজিলা বাজালে পথের সব বাধাবিপদ কেটে যায়। সঙ্গে অরুনমিলার গান :

এ ঘন্টা ওরিশার
এ ঘন্টা ওরিশার
হাতে যে দেখো লোহার ঘন্টা,
এ ঘন্টা ওরিশার !

—ইয়োরুবা সৃষ্টিতত্ত্বের পুরাকাহিনী থেকে

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

ওবাতালা-সৃষ্টিকর্তা। এগুনগুন—যুদ্ধের দেবতা। শাঙ্গো—বজ্রদেবতা। অরুনমিলা—বকার দেবতা। ওরিশা—পরমদেবতা ওলুডুমারের দূতবিশেষ।

অনুগত পুত্রের সুলতান হওয়ার কাহিনী

এক ধনিকের ছিল এক পুত্র। মৃত্যুশয্যায় তিনি পুত্রকে বলেছিলেন : 'কখনো কসম করবে না, অকাট্য সত্য বিষয়ে হলেও নয়।' এবপর তিনি শান্তিতে চোখ বুজলেন। ছেলেও যথারীতি ভালোভাবেই জীবন নির্বাহ করে চলছিল ; কিন্তু হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, "আপনাব বাবার কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল।" এখন এটা মিথ্যা প্রমাণের জন্য যদি আদালতে যেতে হয়, তবে তাকে শপথ কবে বলতে হবে—তার পিতাব কারো কাছে কোনো ধার ছিল না, অথচ পিতার নিষেধবাক্য তাকে তো মান্য করতেই হয়। তাই লোকটির দাবি সে মিটিয়ে দিল। অন্যেরা যখন দেখতে পেল এই ধনবান নবীন যুবার কাছ থেকে অর্থলাভ এতোই সহজ, তাবা একে একে এসে ভীড় জমাতে লাগলো দরজায়, 'আপনার বাবার কাছে আমাব কিছু পাওনা ছিল।" সে সবার পাওনাই মিটিযে দিল, যার যেমন দাবি ছিল। এই করে করে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লো সে। তার স্ত্রী বললো: 'চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই, এই জায়গাটা অপয়া।" দুই ছেলেকে নিযে জাহাজে কবে তারা পাড়ি জমালো নতুন স্থানেব উদ্দেশে। মাঝপথে ঝড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহাজডুবি ঘটলো। স্বামী, স্ত্রী, দুই ছেলে একেকজন একেকদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ভাসতে ভাসতে এক জনমানুষহীন দ্বীপে এসে উপনীত হলো যুবা। জীবনরক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিযে ক্লান্তিতে অবসাদে সে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লো। ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলো জলদগম্ভীব স্বরে কে যেন বলছে, "দ্বীপের মধ্যিখানে মাটি খুড়লে পিতৃ-আজ্ঞা পালনের পুরস্কাব তুমি পাবে।" পবদিন সকালে দ্বীপের মাঝখানে গিযে সে বড় বড় পাথরের চাই দিয়ে আটকানো একটি গুহামুখ দেখতে পেল। অনেক কষ্টে চাইগুলো ঠেলে গড়িযে গুহামুখ উন্মুক্ত করতেই দেখতে পেল অশেষ ধনদৌলত; ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শতাধিক হৃষ্টপুষ্ট গরু ও ভেড়া, আরো ছিল সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ও শস্যের স্তূপ।

নিজের জন্য সে ঘর তৈরী করলো, পশুদের জন্য খামার এবং সুখে দিনযাপন করতে লাগলো। অনেকদিন পর একটি জাহাজ এসে ভিড়লো দ্বীপে, দুই বণিক তাদের পণ্যের বিনিময়ে শস্তায় কিনে নিল ভেড়া ও গোমাংস এবং ফিরে গেল নিজ দেশে। সে তার গোপন গুহার কথা কাউকে বলেনি, যখনই যা কিছু প্রয়োজন গুহার ভেতরে ঢুকে সংগ্রহ করে নিত।

গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে দূর সমুদ্রে আছে ঈশ্বরের আশিসধন্য দ্বীপ, যেখানে বাস করেন এক মহান অধিপতি। দলে দলে লোক এলো দূর-দূরান্তর থেকে, প্রাচুর্যের দ্বীপে বসবাসের অনুমতির জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলো এবং অধিপতিকে তাদের সুলতান হিসেবে মান্য করে নিল। তার জমি চাষের ভার তারা নিল। দেখাশোনা করতে লাগলো গো'শালার। বিদেশ থেকে বণিকেবা এসে হাজিব, সমুদ্র তীরে গড়ে উঠলো তাদের বসতি, এবং বাণিজ্য চললো জমজমাট। শান্তিতে কাটতে লাগলো দ্বীপের জীবন।

রাজা হয়ে ওঠা এই মানুষটির সন্তানদ্বয়ও একদিন দ্বীপে এসে হাজির, কিন্তু দুই সন্তান এসেছিল দুই দিক থেকে দুই ভিন্ন সময়ে এবং ইতোমধ্যে দ্বীপেব লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ, তাই তাদের পবস্পরেব কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। পরে তারা কাজ নিল সুলতানের দববারে—তাদেরই বাবার কাছে, কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারেনি ; কেননা ইতিমধ্যে বহু বছর পার হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকে ভেবেছিল, অন্যদের বুঝি সলিলসমাধি ঘটেছে।

একদিন সুলতানেব দববাবে এক লোক এসে হাজির। তাকে বাত্রিযাপনেব আমন্ত্রণ জানানো হলে সে বললো, তার স্ত্রী এখনো জাহাজে রয়েছে, তাই তাকে সেখানে ফিবে যেতে হবে। তা সত্ত্বেও সুলতান তাকে থেকে যেতে অনুরোধ কবলেন এবং বললেন, তাব দুই বিশ্বস্ত অনুচরকে তিনি পাঠাবেন মহিযসী নারীকে সসম্মানে জাহাজ থেকে নিযে আসতে। দুই অনুচর, আসলে তারই দুই পুত্র, যাদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, যদিও এখনও জানেন না তাদেব পরিচয, নৌকো বেয়ে নোঙব-করা জাহাজেব কাছে পৌছুলো। মহিয়সী নারী তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন পুত্রদ্বয়কে। একসঙ্গে তারা যখন পৌছুলেন রাজদরবাবে তাদের আনন্দেব আর সীমা-পরিসীমা রইলো না। নতুন স্বামীও তাব স্ত্রীকে পরিত্যাগে সম্মত হলেন এবং এজন্য লাভ করলেন প্রভূত ইনাম। তিনি একাকী ফিরে গেলেন তাঁব দেশে এবং এভাবেই বাজপ্রাসাদে সপবিবারে পুনর্মিলনের মাধ্যমে পুরস্কৃত হলেন পিতৃ-আজ্ঞাপালক।

—সোয়াহিলি মিথ

অনুবাদ : মফিদুল হক

কীভাবে

ঈশ্বব এক মানব তৈবী কবলেন যাব নাম চন্দ্র। আদিতে চন্দ্রের বাস ছিল সাগবেব গভীবে। চন্দ্র উঠে আসতে চায় ওপরে, বাস কবতে চায পৃথিবীব বুকে। কিন্তু ঈশ্বব সাবধান কবে দিলেন। পৃথিবীতে জীবন বড়ই দুঃখেব এবং এটা পবে মর্মপীড়াব কাবণ ঘটাবে।

কিন্তু সব বাবণ উপেক্ষা কবে চন্দ্র এলো পৃথিবীব বুকে। সেই সময পৃথিবী ছিল ফাঁকা, জনমানবহীন। ছিল না কোনো বৃক্ষ, কোনো তৃণলতা, কোনো প্রাণী। তাই সুখী হতে না পেবে চোখের জল ফেলছিল চন্দ্র। ঈশ্বব বললেন, আমি আগেই সতর্ক কবে দিযেছিলাম; কিন্তু তুমি তা শোনোনি। সে যাই হোক, আমি তোমাকে সাহায্য কববো। তোমাব একজন স্ত্রীলাভ ঘটবে, যাব পবমাযু হবে আব দুই বৎসব।

ঈশ্বব শুকতাবাকে পাঠালেন চন্দ্রেব সঙ্গে বসবাসেব জন্য। শুকতারা স্বর্গ থেকে বযে এনেছিল আগুন। বাত্রে চন্দ্রেব কুটিবে আগুন জ্বেলে তাব পাশে শয্যা পেতেছিল শুকতাবা। আবেক পাশে ছিল চন্দ্র। বজনীব মধ্যযামে আগুনেব ভেতব দিযে এগিযে এসে চন্দ্রেব সহবাস ঘটে শুকতাবাব সঙ্গে।

পবদিবস প্রভাতে সে দেখে শুকতাবা অন্তঃসত্ত্বা হযেছে। তাব গর্ভ থেকে জন্ম নিল বৃক্ষরাজি, তৃণলতা ও নানা প্রকাব গাছগাছালি, যতক্ষণ না সবুজেব আচ্ছাদনে ছেযে গেল পৃথিবী। বেড়ে উঠতে লাগলো বৃক্ষসকল, যতক্ষণ না হয়ে ওঠে আকাশ-ছোঁযা। যখন আকাশ স্পর্শ কবলো বৃক্ষেব শীর্ষদেশ, শুরু হলো অঝোর ধারায বর্ষণ। চন্দ্র ও শুকতাবাব জীবন ভবে উঠলো ফুলে-ফলে। গাছেব শেকড় ও ফুলেব বীজ হলো তাদেব আহার্য।

কিন্তু অচিবেই শেষ হয়ে এলো দুই বৎসরেব মেযাদ, ঈশ্বর শুকতাবাকে দূবে সবিয়ে নিলেন, পাঠিয়ে দিলেন আকাশের ঠিকানায়।

অবিরাম আটদিবস ধবে চললো চাঁদের ক্রন্দন। এই দেখে ঈশ্বব তাব জন্য মঞ্জুর করলেন দ্বিতীয় এক স্ত্রী, বললেন : সে তোমার সঙ্গে বাস করবে দুই বৎসর এবং মেয়াদ শেষে তোমাকে বরণ করতে হবে মৃত্যু।

সন্ধ্যাতারা এসে চন্দ্রেব সঙ্গে শুরু করে দুই বৎসরেব বসবাস। চাঁদ শয্যা পাতে সন্ধ্যাতাবার সঙ্গে এবং পরদিবস সন্ধ্যাতাবা অন্তসত্ত্বা হলো। সন্ধ্যাতারার গর্ভে জন্ম নেয় গরু, ভেড়া ও ছাগল। দ্বিতীয় দিবসে সে জন্ম দেয় পাখি ও কৃষ্ণমৃগ, তৃতীয় দিবসে আবারো

সে গর্ভবতী হয এবং জন্ম দেয় বালক–বালিকার।

চতুর্থ দিবসে চন্দ্র আবারও সন্ধ্যাতারাব সঙ্গে সহবাসে প্রবৃত্ত হলে ঈশ্বব বললেন : তিষ্ঠ, তোমার মৃত্যুর সময নিকটবর্তী হযেছে। কিন্তু চাঁদ সে বারণে কর্ণপাত না করে আবাবো সন্ধ্যাতাবাব শয্যাসঙ্গী হলো। পরদিবস সকালে তার শরীব ফুলে উঠলো এবং জন্ম নিলো সিংহ, নেকড়ে, সাপ ও গিরগিটি।

এবং ঈশ্বব বললেন : আমি তোমাকে সতর্ক কবেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাব নিষেধ শোনো নি।

চাঁদ তাব অমিতসুন্দরী কন্যাদেব রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদেব সঙ্গে সহবাসে প্রবৃত্ত হলো। তাদেব গর্ভে জন্ম নিলো অনেক সন্তান–সন্ততি এবং সে হযে উঠলো বিশাল সাম্রাজ্যেব অধিপতি।

কিন্তু সন্ধ্যাতাবা কন্যাদের বিষযে ছিল ঈর্ষাপবাযণ এবং চাঁদকে দংশন কবতে পাঠালো নাগিনী। সর্পদংশনে গুরুতরভাবে পীড়িত হযে পড়ে চন্দ্র। একইসঙ্গে থেমে যায বৃষ্টির ধাবা। নদী ও হ্রদেব জল শুকিযে যেতে থাকে। গাছ–গাছালি মবে যায এবং দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। সন্তানেবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে, কীভাবে তাবা আবাব বৃষ্টি ডেকে আনতে পাববে। এবং তারা বললো : এসবই হচ্ছে চন্দ্রের কাজের ফল।

এরপব তাবা চন্দ্রেব গলা টিপে ধবে তাকে নিক্ষেপ করে সাগরে এবং বেছে নেয় অন্য এক বাজা।

কিন্তু সমুদ্রের গভীব থেকে আবাব উত্থি ত হয চাঁদ এবং আকাশেব পথ বেযে পিছু নেয শুকতাবার, আদিতে যে নাবীব মধ্যে সে খুঁজে পেযেছিল তাঁব সুখ।

— ওয়াকাবাঙ্কা লোককাহিনী (জিম্বাবোয়ে)

অনুবাদ : মফিদুল হক

সবাই কথা কয় !

এক জেলে জাল ফেলেছে নদীতে। ধবা পড়েছে অগুন্‌তি মাছ। জেলে তো মহাখুশি! আজ হাটে সওদা ভালোই হবে। এবার কষে দিই টান !

হঠাৎ শোনে, মাছেরা বলাবলি কবছে, 'ভাইবে, চিবটাকাল এভাবে মানুষের হাতে মাবা পড়ব ? দেখ না ভাই চেষ্টা কবে, কার দাঁত ধারালো বেশি, জাল কেটে বেরোতে পারি কি না!'

জেলে তো ভিরমি খায় আব কি ! মাছ কথা কয় ! জীবনে শোনে নি সে এমন কাণ্ড কারখানার কথা। ভয়ে জালটাল ফেলে সে লাগালো দৌড়।

ছুটতে ছুটতে সে এসে হাজির এক তেমাথায়। দেখে কুমোর চলেছে হাটের দিকে, মাথায় ঝাঁকার ওপর বসানো হাঁড়িপাতিল। সে জেলেকে দেখে বলে, 'বলি, অমন হনহন করে পাগলের মতো ছুটছ কোথা ? হলটা কী ?'

'আর হতে বাকি রইলো কী ?' জাল ধরে যেই দিছি টান, অমনি শুনি মাছেরা কয়— 'দাঁত দিয়ে জাল কেটে চল দিকি সব পালাই।'

'অ। কাল বাতে পেটে তাড়ি একটু বেশি পড়েছে বুঝি? চালাকি পেয়েছ। মাছ কথা কয়?'

একথা বলতে কুমোব শোনে, মাথার ওপরে কলসিবা ঠোকাঠুকি করে বলছে, 'কেন বাপু, সব কথা শুধু তোমারা মানুষরাই কইবে ? মাছের মুখ ফুটতে দোষ কী শুনি ?'

মাথার মোট পথে নামিয়ে, কুমোরও জেলের সঙ্গে দিল ছুট্ !

এইভাবে জেলে-কুমোব-তাঁতি-নাপিত-চাষা দল বেঁধে হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হল রাজার দরবারে। কারো মাকু, কারো নরুণ, কারো কাস্তে একইভাবে তাদেরকে মানুষের ভাষায় ধমকেছে ! রাজা তখন তার স্বর্ণসিংহাসনে বসে বিশ্রাম করছেন। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললো—রক্ষে করুন রাজা ! দেশে কিযে কাণ্ড হচ্ছে ! আমরা ভয়ে মরি।

সকলের সব বৃত্তান্ত শুনে রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুঁ ! রাজ্যে তালের রসের দাম খুব বাড়িয়ে দিতে হবে দেখছি ! ইয়ার্কি পেয়েছ ? যত সব নেশাখোরের দল ! প্রহরী, যাও—এদের সব আজকের মতো গারদে পোরো !' সবাইকে ধরে নিয়ে যাবার পর রাজা আবার সিংহাসনে বসে পড়ে বললেন, সত্যিই, কী দিনকাল পড়লো, অ্যাঁ ? ইয়ার্কি করার জায়গা পায় না ? বলে কি না পশুপাখি হাঁড়িপাতিল সবাই কথা কয় ?'

হঠাৎ শুনে আঁতকে লাফিয়ে ওঠেন, সিংহাসন বলছে : 'যথার্থ বলেছেন মহারাজ, কী দিনকালই পড়লো !'

—আশান্টে কাহিনী (ঘানা)

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

জনগণনা

বহুকাল আগে এক বনে পশুপাখিদেব গভর্নর তাব অধীনস্থ কর্মচাবীকে ডেকে বললেন, 'ঠিক কবেছি—সব পশুপাখিদের গুনতি কবতে হবে, তাবপব প্রত্যেককে বলতে হবে ট্যাক্সেব বসিদ দেখাতে, যাতে কোনো ব্যাটা ফাঁকি না দিতে পাবে।'

প্রথমে পাঠানো হলো গবিলা পুলিশকে একাজে। সে সবাইকে ধরে ধবে বসিদ দেখাতে বললো। শেষে এলো বাদুড়ের কাছে।

বাদুড় বলে—'আমাব কাছে কেন ভাই ? আমি তো পাখি। দেখছ না বযেছে দুটো ডানা, আকাশে উড়ি, উড়ে এসে গাছে বসি ? তোমার খাতায় আমাব নাম তুলবে কেন ?

গবিলা ফিরে এসে গভর্নবকে (চিতা বাঘ) বলতেই তিনি বলেন, 'চালাকি ? কুছ পবোযা নেই, যাও তো বাজপাখি-পুলিশ॥দেখি বাছাধন কী বলে !'

বাজপাখিকেও বাদুব বলে—'আমাকে কেন ভাই ? আমি তো পাখি নই। দেখো আমাব সর্বাঙ্গে লোম, এমনকি বুকে-পেটেও। দেখো আমার কান জোড়া গরুর মতো, যৌনাঙ্গ বাঁদবেব মতো !'

'থাক হযেছে !' বলে বাজ পাখি উড়ে ফিবে গেলো। নিচেব দিকে মাথা ঝুলিয়ে বাদুড় খ্যাঁকখ্যাঁক কবে হাসতে লাগলো খুব।

—ইযোলা উপকথাব আধুনিকীকবণ (ক্যামেরুন)

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

মৃত্যুর উদ্ভব

চাঁদ একবাব মানুষেব কাছে একটি পোকাকে পাঠালো, বললো, 'মানুষের কাছে গিয়ে বলো, আমি যেমন মরি, এবং মবে বেঁচে থাকি, তেমনি তোমবাও মববে এবং মবেও বাঁচবে।'

খবরটি নিয়ে পোকাটি বওনা হলো। কিন্তু মাঝপথে এক খবগোস তাকে অতিক্রম কবে যায এবং জিজ্ঞাসা কবে, 'কোন্ কার্যে যাচ্ছো?'

পোকা উত্তব দেয, 'চাঁদ আমাকে মানুষেব কাছে পাঠিযেছে, তাদেবকে একথা বলতে যে, সে যেমন মবে এবং মবে বেঁচে থাকে, তেমনি তাবাও মববে এবং মবেও বেঁচে থাকবে।'

খরগোস বললো, 'তুমি তো দৌড়ে আনাড়ি, তাব চেয়ে আমিই ববং যাই।' এই না বলে সে ছুট্ লাগালো এবং যখন মানুষের কাছে পৌছুলো, বললো, 'চাঁদ আমাকে তোমাদেবকে বলতে পাঠিযেছে যে, 'আমি যেমন মবি এবং মবে ধ্বংস হয়ে যাই, একইভাবে তোমরাও মববে এবং একেবাবে শেষ হযে যাবে।'

খবগোস তাবপব চাঁদেব কাছে ফিবে গেল এবং তাকে বললো, মানুষকে সে কি বলেছে। চাঁদ তখন ক্রুদ্ধ হযে তাকে ধমক লাগালো, 'তোব কি সাহস যে আমি যা বলি নি, মানুষকে তুই তা বলেছিস?'

এই না বলে একটি কাঠেব টুকবো তুলে চাঁদ খবগোসেব নাকেব ওপব আঘাত কবলো। সেদিন থেকে খরগোসেব নাক দু'ভাগ, কিন্তু মানুষ খবগোস তাদেবকে যা বলেছে, তা-ই বিশ্বাস করে।

—অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায

কসাইয়ের ভাগ

সাতটা ব্যাঙেব একবাব খুব ক্ষিধে পেল। খাবাব খুঁজতে তারা বনে গেল। অবশেষে তারা একটা কৃষ্ণসাব হবিণেব মৃতদেহ দেখতে পেল এবং খুবই খুশি হলো।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, তাদের সাথে এমন কিছু ছিলো না, যা দিযে তাদের সেই চমৎকাব আবিষ্কাবটাকে তাবা কেটে-ছাড়িযে টুকবো কবতে পাবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতেই একটা চিতাবাঘ এসে হাজিব এবং সে ব্যাঙগুলোকে আশ্বস্ত কবলো যে, তাব ধাবালো নখ দিযেই তাদের মাংস কাটার সমস্যাব সমাধান হয়ে যাবে।

বন্য চিতা তাবপব মাংসেব সব ভালো টুকবোগুলোকে নিজেব জন্য কাটলো এবং জমা কবলো, আব বললো যে, এগুলো হচ্ছে 'কসাইযেব ভাগ', সাতটা ব্যাঙেব মধ্যে ভাগ হওযাব জন্যে বেখে দিল শুধু হাড়গুলোকে।

ভুখা ব্যাঙগুলো আব কি কবে? তারা তো তখন ঐ হিংস্র আর ভয়ঙ্কব প্রাণীটাব থাবাব মধ্যে।

সাতটা ব্যাঙ কেবল একে অন্যেব মুখেব দিকে তাকালো, কিছু বললো না, কিছু কবলোও না।

কাজ সেবে চিতাবাঘ গেল কিছু পাতা খুঁজতে, যা দিযে মুড়ে সে তাব মাংসগুলো বাড়ি নিযে যাবে।

চিতা চলে গেলে, সাতটাব মধ্যে ছ'টা ব্যাঙ জোড়ায জোড়ায মবে যাওযাব ভান কবলো। সাত নম্বব ব্যাঙটি বইলো, সে অপেক্ষা কববে, চিতাবাঘকে তাব সঙ্গে জোড়া বেঁধে মবে যাওযাব মন্ত্রণা দিতে।

চিতাবাঘ ফিবলে এবাবে জ্যান্ত ব্যাঙ তাকে বললো, 'এসো এসো, আমি তোমাব জন্যেই অপেক্ষা কবছি।' চিতা বেগেমেগে প্রশ্ন কবলো, 'কি জন্যে?'

ব্যাঙও তেড়ে উত্তর দিল, 'আব সবাই তো জোড়া বেঁধে মবেছে, আব তাই আমাকেও প্রথামতো জোড়া বেঁধেই মবতে হবে।'

এই শুনে, আব মুখে ফেনা তুলে মরা তিনজোড়া ব্যাঙেব ভয়াবহ দৃশ্যে বেদিশা হয়ে, চিতাবাঘ তখন পাতা-টাতা ফেলে আজও দৌড়, কালও দৌড়।

জ্যান্ত ব্যাঙ তখন অন্য ছ'টি ব্যাঙকে জেগে উঠতে বললো, এবং সবাই মিলে তারা "কসাইযেব ভাগ" সাবাড় করলো।

আজও পর্যন্ত ব্যাঙগুলো চিতাব উদ্দেশে হাসছে।

যে শেষে হাসে, সে-ই সর্বোত্তম হাসে।

একটি এফিক লোককাহিনী
অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্দাকারে

'গতবাতে দারুণ আঁধাব ছিল। তোমাব বাড়িতেও কি অন্ধকাব হযেছিল ?' লামিদো (মোড়ল) জিজ্ঞেস কবলেন। সামান্দাকাবকে ডেকে নিযে আসা হযেছে তাব কাছে। সে বলল, 'আল্লা আপনাব ভাল করুন, লামিদো। আমাব দাদুব সাদা দাড়িব মধ্যেও অন্ধকাব ঢুকে পড়েছিল। আব তাইতো দাদুর গোঁফজোড়া হাঁটতে-হাঁটতে দাদুব জুল্‌পিব জাযগায গিযে বসলো!'

'তোমাব মা কোথায ?' এই ছিল লামিদোব পবেব প্রশ্ন।

'মা'ব হঠাৎ চুল বাঁধতে সাধ গেল। বাঁধতে দিযে দেখেন কি, ওমা, মাথাটাই ফেলে এসেছেন, তাই সেটা ফিবে আনতে গেছেন।' সামান্দাকাবে জানালো। কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে লামিদো আবাব জিজ্ঞাসা কবলেন : 'আব তোমার বাবা কোথায ?'

'মঙ্গল হোক আপনাব লামিদো। বাস্তা গেছে ছিঁড়ে, বাবা গেছেন তাতে গিঁঠ বাঁধতে।

আর প্রশ্ন কবাব চেষ্টা কবলেন না লামিদো, সামান্দাকাবে বাড়ি ফিবে গেল।

পবে লামিদোব হুকুমে দু'টি দাসপুত্রকে মাথা-নেড়া কবা হল। তাদেব তিনি বললেন, 'যা, সামান্দাকাবেব বাড়ি গিযে বল— 'আমাদেব চুল বেঁধে দাও।''

ছেলে দু'টি গিয়ে দেখে বাড়িতে শুধু তার মা-বাবা বয়েছে, সামান্দাকাবে একটু বেবিয়েছে।

'লামিদো আমাদেব পাঠিযেছে, সামান্দাকাবে যেন আমাদের চুল বেঁধে দেয়— এই আদেশ।' বাবা-মা তো শুনে কান্না জুড়ে দিলেন, 'হায় হায়! নেড়া মাথায চুল বাঁধবে কি গো?'

ফিবে এসে ছেলে জিজ্ঞাসা কবলো, 'একি। কাঁদছ কেন ?'

'লামিদো ঐ দু'টি নেড়া ছেলেকে পাঠিযে তোকে বলেছে চুল বেঁধে দিতে। মাথায একগাছি চুল নেই, তো বাঁধবি কী? তাই মোরা কাঁদ্‌ছি।' তাবা কঁকিযে উঠলেন। 'কান্না থামাও!' সামান্দাকাবে বলল। দুটো লাউখোলের তৈবি বোতল নিযে জল ভবে ছেলে দুটোর হাতে দিযে বললো, 'নে' ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিযে এব থেকে মাখন তোল আগে; তাবপর তোদেব চুল বেঁধে দেবো।'

ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে হাত ব্যথা হয়ে গেল। সন্ধ্যা হতেই তাবা ক্ষান্ত দিযে লামিদোর বাড়ি ফিবে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কী, সামান্দাকারে চুল বেঁধে দিল না যে?'

তাবা বললো, 'আমাদেব হাতে জলেব বোতল ধবিয়ে দিযে বললো, 'আগে ঝাঁকিয়ে মাখন তোল, তারপর চুল বেঁধে দেবো!'

পবেব দিন সকালে লামিদো সামান্দাকারেকে ডেকে পাঠালেন। 'জল ঝাঁকিযে মাখন তোলা সম্ভব ?" তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন। জবাবে সামান্দাকাবে বললো, 'চাঁছাছোলা নেড়ার চুল বাঁধা সম্ভব ?'

তখন লামিদো বললেন, 'এই নিয়ে যাও আমাব ষাঁড়। এটাকে অন্তঃসত্ত্বা বানাও, আজই যেন বাছুর বিযোয। তাবপর দুধ দুইয়ে তা থেকে মাখন তুলে নিয়ে এসো, আজই, যাতে তা থেকে আমি দাওয়াই বানাতে পারি।'

সামান্দাকাবে বাইবে গিযে কয়েকটা কুমড়ো বিচি নিয়ে এলো। সেগুলো লামিদোকে দিয়ে বললো: 'এই নিন, আজই এগুলো থেকে গাছ গজিযে, তার কুমড়ো নিয়ে তাকে দু'ভাগ করুন। তাবপর ভাল কবে পবিষ্কার করে খোলা দুটো দিন, সেগুলোকে ভান্ড কবে আমি তাতে দুধ দুইবো।'

'একদিনে সেটা কি কবে সম্ভব?' লামিদো শুধালেন। 'ইহি ! ইহি !' সামাকান্দাবে বললো, 'বলদই বা বাছুর দেবে কী করে ? দিলে পরে নিশ্চয় আমি তার দুধ দুইযে এনে দেবো একদণ্ডে।'

'তবে এই নাও তুলোর বীজ। আজই পুঁতে, গাছ গজিয়ে, পাতা, ফুল, ফল ফলিয়ে, ফল ফাটিযে, তুলো বেব করে— সুতো কেটে তা দিযে কাপড় বুনে আমার জন্য একটা সুন্দর পোশাক বানিযে নিযে এসো, আজই।' হুকুম দিলেন লামিদো।

'আপনি ঠিক একইভাবে ঐ কুমড়োব ফালি শুকিযে এনে দিন, তাতে ভরে আমি আপনার পোশাক ভেট দেবো।' সামাকান্দাবের জবাব এলো।

এঁটে উঠতে না পেবে লামিদো ঠিক করলেন সামান্দাকাবেকে খুন করবেন। একটা শক্তপোক্ত দবজাওয়ালা মজবুত কুঁড়েঘব বানাবার আদেশ দিলেন তিনি। সামান্দাকারেকে পাকড়াও করে তাব মধ্যে পুবে দিলেন। কিন্তু সামান্দাকাবের পকেটেব মধ্যে ছিল কিছু পুবোনো হাড়। কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চারা বেরিয়ে সামান্দাকাবের কুড়েব চারধাবে ঘুরতে লাগলো। ভেতব থেকে কড়মড় আওয়াজ পেয়ে তারা বললো, 'সামান্দাকাবে, কি কামড়ে খাচ্ছ গো?'

'আমি একটা দারুণ মিষ্টি জিনিস খাচ্ছিলাম বলে তোমাদের বাপ আমাকে বন্দী করে রেখেছে'—সে বললো। একটু থেমে আবার বললো, 'চেখে দেখতে চাও তোমবা? একটুখানি ভেঙে দিতে পাবি, যদি আমায় বাব করে দাও, এই একটুখানি কিন্তু!'

বাচ্চারা দরজা খুলে দিল। সামান্দাকারে বেবিয়ে সবক'টাকে ধ'বে ঘরে পুরে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে পড়লো।

সূর্যাস্তের পর, নামাজের সময়, যখন চারদিকে কেউ নেই, লামিদো হুকুম দিলেন ঘরটাতে আগুন লাগাতে। লক্‌লকে শিখা জ্বলে উঠলে ভেতর থেকে শিশুরা চেঁচিযে উঠলো, 'বাপজান, ভেতরে আমরা, তোমারই বাচ্চাবা!'

কিন্তু লামিদোর একমাত্র জবাব, 'না, আমি তোকে জন্ম দিই নি।'

ঘরটা জ্বলে ছাই হয়ে গেল, বাচ্চাগুলো পুড়ে মরলো, লামিদো বুঝতে পারলো না যে সে নিজের সন্তানদের খুন করেছে। একটু পরেই দেখেন, একী, কে আসে? এ যে

সামান্দাকারে! সামান্দাকাবে কাছে এসে সেলাম কবে বসলো। লামিদো কাঠ হয়ে রইলেন।

খোঁচা দিয়ে সামান্দাকাবে বলল, 'কী দারুণ বুদ্ধি! নিজেব সন্তানদেব পরপারে পাঠানো!'

মোড়ল হুকুম দিলেন সামান্দাকাবেকে শেকলে বেঁধে বাখতে। কিন্তু তাকে শেকল পবাবার ঠিক আগে সামান্দাকাবে লামিদোব বিবির ছোট রুপোর টুলটা চুরি কবে তাব পোশাকেব তলায় লুকিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পবে লামিদো তার বিবি ও পারিষদদেব নিযে বাইবে গেল মজলিস কবতে। বসতে গিযে টুলটা না পেযে বিবি বললো, 'যাই, গিযে নিযে আসি।' সঙ্গে দু'জন রক্ষী এলো তাব। ঘবটাব কাছে এসে বক্ষী দু'জন বাইবে দাঁড়িয়ে বইলো, বিবি ভেতবে গেলেন তাব আসন খুঁজতে। কোথাও না পেযে শেষ পর্যন্ত অন্ধকাবে এক কোণায শৃঙ্খলাবদ্ধ সামান্দাকাবেব কাছে এসে উপস্থিত হলেন। 'আমাব ছোট টুলটা দেখেছ?' শুধালেন তিনি।

'যদি সেটা চান ত, আমাকে মুক্ত করুন আগে'— উত্তব এলো।

বিবি এসে তাব শেকল খুলতেই সামান্দাকাবে তাকে জাপটে ধরে তাব পোশাক-আশাক-গযনাগাটি খুলে, তাই দিযে নিজে বিবি সেজে মাথায টুলটা নিযে বেবিযে এল। তারপর দুই বক্ষীব মাঝখানে বিবি সেজে সভায এসে গেল।

বড় নামাজের সময নকল বিবি ও আব সবাইকে নিযে লামিদো বাড়ি ফিবে এলেন। এক ক্রীতদাসী সামান্দাকাবেব স্নানেব জন্য গবম জল তৈবি কবলো, সকলেব তখনও ধাবণা, সে-ই হ'লো বিবি। সামান্দাকাবে স্নান সেবে লামিদোব শোযার ঘবে ঢুকে বিছানাতে শুযে বইলো। চুপ কবে গভীব বাত পর্যন্ত ঘাপ্‌টি মেবে পড়ে বইলো সে, শেষে লামিদো এল ঘবে। দু'জনে কানে কানে ফিসফিস কবে কিছুক্ষণ কথা বলাব পব লামিদো ঘুমিযে পড়লেন।

বিছানাব পাশে একটা পুবোনো আমলেব তলোযাব ঝুলছিল। সেটা নিযে লামিদোব মাথাটা কেটে ফেলে, তাব দেহটা টানতে টানতে বাইবে নিযে গিযে সে ফেলে দিল। তাবপব দিল বড় ঘন্টাটা বাজিযে।

লোকেবা এসে সামান্দাকাবেকেই লামিদোরূপে ঘোষণা কবলো।

—ফুলানি কাহিনী (পশ্চিম আফ্রিকা)

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

আধুনিক কবিতা

যার যার ঢাক নিয়ে ঢাকী মশায়ের
হাত তুলে বাজাতে এল।
বাতাসে উচ্ছল কোমল ঝনৎকার
তারে তারে ঝংকৃত
মাবিশ্বাস।

আমি তোমার নাম উচ্চারণ করবো ☐ লেওপোল্‌দ্‌ সাঁগর

আমি তোমার নাম উচ্চারণ রবো, নায়েৎ, আবৃত্তি ববো তোমাব শব্দরূপ!
মৃদু দাবচিনির মতন তোমার নাম, দয়িতা, সেই সুগন্ধ যাব মধ্যে লেবুনিকুঞ্জ ঘুমোয়,

নায়েৎ, তোমার নাম মঞ্জরিত কফিগাছের মধুর স্বচ্ছতা
আর মনে করিয়ে দেয় সেই সাভানা, মধ্যদিনের সূর্যের পুরুষালি সুবাসের মধ্যে যার
উন্মোচন।
ঐ নাম শিশিবের, তেঁতুলগাছের ছায়ার চেয়েও তরতাজা,
সতেজ এমন কি সংক্ষিপ্ত গোধূলিব চেয়েও, দিনের উত্তাপ যখন স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

নাযেৎ, সেই তো অনার্দ্র প্রভঞ্জন, বজ্র আর বিদ্যুতের দৃপ্ত করতালি,
সোনার মোহর, জ্বলন্ত অঙ্গার, তুমি আমার রাত্রি, সূর্য আমার!
আমি তোমার পুরুষ, এই মুহূর্তে হয়ে উঠেছি তোমার জাদুকর, যেন তোমার নাম উচ্চারণ
করতে পারি,
ফিউটা রাজ্য থেকে দুর্দিনে নির্বাসিতা এলিসার রাজদুহিতা।

অনুবাদ : অলোকবঞ্জন দাশগুপ্ত

নিউইয়র্কের প্রতি □ লেওপোল্‌দ্‌ সাঁগর
(জ্যাজ-অর্কেস্ট্রার জন্যে : ট্রাম্পেট সোলো)

নিউইয়র্ক ! প্রথমে তোমার সৌন্দর্য আমাকে বিহ্বল
কবেছিল, ওই সব দীঘল পায়ের সোনালি সোমত্ত মেয়েরা।
আমার এমন সঙ্কোচ হত তোমার ধাতব নীল চোখের
সামনে, তোমার তুহিন–হাসির সামনে
এখন সঙ্কোচ। আকাশ ছোঁয়া বাড়ি দিয়ে ঘেরা রাস্তার
শেষ সীমায় যন্ত্রণা
সূর্যগ্রহণের মধ্যে পেঁচার মতো চোখ তুলে।
তীব্র তোমার আলো এবং স্তম্ভগুলো সীসের মতো
বর্ণহীন, যাদের শিরোদেশ আকাশে বজ্র হানে
আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো তাদের ইস্পাতের পেশীর ওপর
এবং চকচকে পাথুরে ত্বকের ওপব ঝঞ্ঝাব ঝাপট অগ্রাহ্য করে।
কিন্তু ম্যানহ্যাট্যানের খোলা ফুটপাথের ওপর
পনেরো দিন
—তৃতীয় সপ্তাহের শেষেই জ্বরটা জাগুয়ারের
মতো এক লাফে আমাদের ধরে ফেলল
একটাও কুয়ো নেই ঘাসজমি নেই এমন অবস্থায়
পনেরোটা দিন, আকাশের সমস্ত পাখিরা হঠাৎ ম'রে ম'রে
পড়তে লাগল চত্বরের ছাইগাদার নিচে
আমার সুশীতল হাতের মধ্যে হাত রাখা কোনো
শিশুর প্রস্ফুটিত হাসি নয়
কোনো মাতৃস্তন নয়, নাইলনের পা। ঘর্মহীন গন্ধহীন
পা এবং স্তন
কোনো দরদী কথা নেই যেহেতু ঠোঁট নেই, আছে শুধু
কৃত্রিম হৃদয় নগদ টাকায় পাওয়া

এবং একটাও বই নেই যার মধ্যে প্রজ্ঞা কথা বলে।
চিত্রকরের রঙের পাত্র শুধু প্রবাল-স্ফটিকে ফুলের শোভা ফোটায়।
অনিদ্রার রাত, ওঃ ম্যানহ্যাট্যানের রাত! আলেয়ার
আলোয় এমন আনচান আর সেই সঙ্গে মোটরের হর্নে
শূন্য সময়ের চিৎকার
আর সেই সঙ্গে অন্ধকাব জল ভাসিযে নিযে
চলে স্বাস্থ্যকর প্রেম, যেমন বান-ডাকা নদী ভাসিযে
নিয়ে চলে শিশুদেব মৃতদেহ।

নিউইয়র্ক! আমি বলছি নিউইয়র্ক, তোমার
রক্তে কৃষ্ণ বক্ত প্রবাহিত হতে দাও
তা তোমার ইস্পাত-গ্রন্থিগুলোর মরচে ছাড়িয়ে
দিক এক জীবন-তৈলের মতো
তা তোমার সেতুগুলোকে দিক নিতম্বের বক্রতা এবং
লতার নমনীয়তা
এই তো আবার এল অতিপ্রাচীনকাল, আবার ঐক্য,
সিংহ বৃষ আব বৃক্ষের পুনর্মিলন
চিন্তা কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, কর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে,
চিহ্ন অর্থের সঙ্গে।
ওই তো তোমার নদীগুলো কস্তুবগন্ধ কুমিরে
আর মরীচিকাচোখ শুশুকে গুঞ্জরিত।
সাগর-কুহকিনীদেব উদ্ভাবন করার কোনো প্রয়োজন নেই আর।
শুধু এপ্রিল মাসের ইন্দ্রধনুর দিকে চোখ মেলাই
যথেষ্ট
আর ঈশ্বরের দিকে কান, বিশেষ কবে কান
পাতাই যথেষ্ট, যে-ঈশ্বর এক স্যাক্সোফোন-হাসি
দিয়ে আকাশ আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন ছয় দিনে
এবং সপ্তম দিনে অগাধ নিগ্রো-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ফরাসী থেকে অনুবাদ : অরুণ মিত্র

সময় □ দাভিদ দিওপ

একটা সময় আছে স্বপ্ন দেখার
রাত্রির স্বস্তির মধ্যে নৈঃশব্দেব গভীরে
একটা সময় আছে সন্দেহ করার
শব্দের ভারী আববণ ছিঁড়ে ফ্যালে কান্নার ফোঁপানি
একটা সময় আছে যন্ত্রণা পাওযাব সারাটা সময
যন্ত্রণা পাওয়ার সারাটা যুদ্ধ–পথ মাযের দৃষ্টিব মধ্যে
একটা সময় আছে ভালোবাসার
আলোর কুটিবে যেখানে গান গায় চাবাগাছের শরীব
এবং সময়ের উন্মাদনাব মধ্যে
সমযেব অধৈর্যের মধ্যে উর্বরতর সময়ের বীজ
যেখান থেকে জন্মাবে ভারসাম্য।

ফরাসী থেকে অনুবাদ : অরুণ মিত্র

নিগ্রো দন্তরাজি যখন ঝল্‌সে ওঠে □ ওয়োলোগুয়েম ইয়াম্বো

সবাই মনে কবে আমি নরমাংসভোজী
শুধু তুমি জানো এ হলো মানুষের কথাবলার একটি ধরন

সবাই দেখে আমাব লাল মাড়ি
দুধসাদা মিলবে কোথায
বেঁচে থাক টমাটোর রক্তিমা

সবাই বলছে ট্যুরিস্টের সংখ্যা যাবে কমে
এখন
তবে তুমি তো জানো
এদেশ নয আমেরিকা এবং
দেশটি তো দেউলিয়া

সবাই ভয়ার্ত এবং বলছে এ আমারই দোষ
কিন্তু তুমি দ্যাখো
আমার দন্তরাজি লাল নয়, দুধসাদা
এবং ভক্ষণ করিনি কোনো নরমাংস

মন্দজনেরা বলে থাকে আমি গিলি গোগ্রাসে
ঝলসানো কিংবা ঝুরিভাজা
ট্যুরিস্টেব মাংস
জানতে চাই আমি ঝলসানো নাকি ঝুরিভাজা
বাকরহিত সকলে ভয়-চোখে দেখে আমার মাড়ি
টমাটোর রসে ভরা মুখ।

সবাই জানে কর্ষণযোগ্য মাঠ হবে কৃষিজমি
ভরে উঠবে শাকসব্জীতে

সবাই জানে যে শাকসব্জী
হলধরের বিকাশ ঘটাতে নয় তত সিদ্ধ
এবং অনুগত মানব হিসেবে গড়ে উঠেছি তো বেশ
ট্যুরিস্টের কৃপায় বেঁচে থাকা কীট
দন্তরাজি নিপাত যাক

অনুবাদ : মফিদুল হক

বাড়ির খবর □ আহমেদ তিজানি-সিসে

‘বাছা আমাব, ঈশ্ববের আশীর্বাদে আমি ভালো আছি
তোর জন্যে দিনরাত ঠাকুরকে ডাকছি।’

‘ভাই বে, আদরিণী জননী আমাদের ছেড়ে গেছেন
হায়, এ খবর কিনা আমাকেই দিতে হচ্ছে
চোখ বুজেছেন গত রবিবার
একটু সেবা করারও সময় দেননি।’

‘নতুনদা, এখন আমি অনেক বড় হয়েছি
আমার জন্যে পারলে ফুলপ্যান্ট আর ফিতেবাঁধা জুতো কিনে পাঠিয়ো।’

‘প্রাণাধিকেষু, আজ দশ বছর ধ’বে তোমার আসা–পথ চেয়ে বসে আছি
কিসের মায়ায় পড়ে আছ তুমি সাদা মানুষের পোড়া দেশে
সেই কবে গিয়েছ, আর ফেরার নাম নেই
আমাদের তুমি কত কষ্ট দাও, ভাবো তো।’

‘খোকনসোনা চাঁদের কণা, আমি তোমার বাবা
ব্যগ্রতা করছি, দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসো
না এলে আমার কবর চিনে
দুঃখ রাখারও আর জায়গা পাবে না।’

‘প্রিয় ভাইপো, তোমার পিতৃবিয়োগের খবর
না দিয়ে পারছি না
সবাই আশা করছে, চল্লিশা’র জাগরণক্রিয়ায
তুমি উপস্থিত থাকতে পারবে।’

‘আমার ভালবাসার ধন . . . ’
কাল ডাকপিওনকে চলে যেতে দেখে

তার ফিরে আসার অপেক্ষায়
আজ কেবলি ঘর–বার ঘর–বার করছি।
যখন বাড়ির কোনো খবর থাকে না
এক অতলান্ত বিষাদ
আমাকে ছেয়ে ফেলে।
যখন হুমড়ি খেয়ে আমাব ঘাড়ে এসে পড়ে বাড়ির খবব
আমাব অন্তবাত্মা কেমন যেন শুকিয়ে যায।
এই তো সেদিন বাড়ির যাবতীয় খবর দিয়ে
আমি একটা ক্ষণজীবী নৌকো বানিয়েছিলাম
সেটা ছেড়েছিলাম দেশান্তরী–কালাপানির তক্তাঘাটের জলে।
তারপর তাকে স্বাগত জানাতে চলে গিয়েছিলাম
আশার–অন্তঃপাতী–নিঃসঙ্গতার নোঙর ফেলার জায়গায়।
আমার নৌকো থেকে নেমে কাছে এসেছিল কিছু গোপন সওয়ারী
তার ঠিক পরের দিনই ডাকপিওন তার দৈবজ্ঞের হাত
আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

'প্রিয়বরেষু, তুমি যে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনীতি করো
সেই আক্রোশে গত হপ্তায়
তোমার ভাইকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।
তোমাদের সংসারে মাথার ওপর কেউ রইল না
আমার জন্যে একটা শার্ট আর একটা নেক্‌টাই পাঠিয়ো।'

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বাতাসে ওড়া পাতা □ বার্নার্ড দাদিয়ে

আমিই সেই মানুষ যার বাতের মতো রং
বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

বসন্তের নবাঙ্কুরে ভরিয়ে-দেওয়া গাছ
বাওবাবের কোটরে আমি শিশির গুনগুন

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

আমিই সেই মানুষ কিছু মানি না রীতিনীতি
সবার তাই নালিশ
বাধাকে শুধু বাধাই দিই, সবারই থেকে তাই
কুড়োই পরিহাস
বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

আমিই সেই মানুষ ওরা যার বিষয়ে বলে
'ওঃ! সে-লোকটা!'
ধরতে তাকে পারো না কোনোমতে
হালকা হাওয়া ছোঁয় তোমায়, ছুঁয়েই যায় সরে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

ছুটতে-থাকা মেঘের দিকে পোতাধ্যক্ষের
লক্ষ্য থাকে যেমন
তীব্র চোখে পৃথিবী চেয়ে থাকে
পালগোটানো জাহাজ যায়
সাগরজলে ভেসে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

আমিই সেই মানুষ যার স্বপ্ন বহুতর
তারার মতো জ্বলে
মৌমাছির ঝাঁকেরও চেয়ে গুঞ্জরণময়
শিশুমুখের হাসিরও চেয়ে হাসিতে আরো ভরা
সঘন আর ঘনবনের প্রতিধ্বনি থেকে

বাতাসে ওড়া পাতা, আমি স্রোতের টানে স্বপ্নে ভেসে যাই।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

আমার মাথা প্রকাণ্ড — চার্লস নোকান

প্রকাণ্ড এক মাথা আমাব,
আমার চোখ দুটো এক প্রকার ব্যাঙের,
একটি শিঙ দাঁড়িয়ে আমার ঘাড়ে;
অথচ আমা হতেই ছড়িযে পড়ছে
যাদুমণ্ডিত এক সঙ্গীত।
প্রশ্বাসে কোন্ বৃক্ষ ঝরায় এখন বিবল
সৌগন্ধ?
কৃষ্ণ সুন্দর, কিভাবে ঝরো তুমি
ব্যাঙের ডোবাখানা থেকে? কিভাবে
বও নিঃসঙ্গ কুদর্শন থেকে?
তোমরা যারা তাকিযে থাকো, ভাবো তোমরা যে,
আমাব যন্ত্রেব কণ্ঠস্বব
কিনে নেয় আমার স্বাধীনতা; যে, আমি তরল,
বিলীয়মান চিন্তা শুধু।
না, আমার ভেতরে কিচ্ছু নেই—
শুধু এক শোকের আশয়।

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাথিড্রাল □ কোফি আউনোর

এই নোংবা জোড়াতালির উপর
একটা গাছ ছিল একদা
ঝরাত শিশুশস্যের উপর চন্দনসুবাস;
তার ডালপালাগুলো স্বর্গে দিত হানা
একটি উপজাতির সর্বশেষ আগ্নেয় সংবাগে।
ওবা পাঠাল জায়গিরদার আর কন্ট্রাক্টর
গাছটাকে যারা উচ্ছেদ ক'রে
তার জায়গায় রোপণ করল
প্রকাণ্ড একটা নির্বোধ নিয়তিবিধুর ক্যাথিড্রাল

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জালবুনুনি □ কোয়েসি ব্রু

আমবা এখন চৌবাস্তায, আমি
তোমাকে ছাড়ব, নতুবা সঙ্গে যাব।
নির্বাচনের এই সন্ধিক্ষণে
আমার দ্বিধার গহন অন্ধকাবে
তুমি জ্বেলে দিলে ভালোবাসবাব আলো

এবং তোমার মুখমণ্ডলে আমি
কোন্ পথে যাব স্পষ্টই দেখলাম।

অনুবাদ : অলোকবঞ্জন দাশগুপ্ত

আমাদের ভিটে সমুদ্র কুরে খায় □ কোয়েসি ব্রু

আমাদেব ভিটে এখানে দাঁড়িযে ছিল:
ভাঙা পাঁচিলটা জানান দিচ্ছে তার।
এইখানে ওরা একটা ভেড়াকে বলি
দিতে গিয়েছিল দেবতার সন্তোষে
আর আমাদের নিয়তিব যতো দোষ
পাপে কুসুমিত তাবই অভিসম্পাতে।

এখানে দাঁড়িয়ে খিন্ন বাবামশাই
চিৎকার করে ডাকতেন যেন তাঁর
তাবৎ ছাওযাল খেলা থেকে ফিবে এসে
রাতের খাবার খেয়েই ঘুমোতে যায়।
মন্দ্রিত মেঘে সেদিন রক্তাকাশে
রাত্রি কেমন অসিত ইন্দ্রজাল
বুনে গিয়েছিল দ্রিমিকি চলোর্মিতে।

এখানেই ছিল ঘানা'র শহরতলি।
আজ এইখানে সোনালি মেয়েরা তাব
অদ্ভুত যতো শহরের আশ্লেষে
ক্ষয়ে হয়ে যায় খোয়াইযেব চোরাগলি।

অনুবাদ : অলোকবঞ্জন দাশগুপ্ত

সন্ধ্যাস্তব ▢ এমিল ওলোগুড়ু

শরতের আকাশ
সূর্য তার লাল তেলেব কৌটো চুরমার ক'বে দিয়েছে —
পৃথিবীর ওপরে সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হবার দিনে,
আমি এখন আকাশের মৃদু স্বরলিপি ছেড়ে
ওঠানামা-করা শিসের-তৈরি মাথার মতো
ভারি এক বার্তা নিয়ে
আমি আমার দেশবাসীকে বলবো, যা আমাকে
বলতে বলা হয়েছে :
এটা অন্য বেলাভূমির নির্দিষ্ট বিদ্বেষ
এবং বাকি জীবনের জন্য
এটাই আমাব কর্মসূচী।
যে-সূর্য কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে যায়, সে সূর্যকে আমি দেখবো না
এবং এই আলো ধীব, অপসৃয়মান ছায়ার নিচে হারিযে যায়
আ!
এইসব জিনিস কি যার নৌকোডুবি ঘটে যায়
সত্তার সমুদ্রে, ঠিক বিদায়ের মুহূর্তে ?
আমার সত্তার চূড়ায় এখন যার বসবাস
প্রায় কোনো সন্ত্রাসের মতো
হাজারো প্রতিশ্রুতির মতো যা আমাদের পালন করতে হবে।

অনুবাদ : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

নাগর ।। ফ্লাভিয়েন রানাইভো

নাগর, মোবে কবিস না তোব ছায়া
ছাযা তো মিলায সাঁঝ না হতেই।
সাধ মোব তোরে রাত ভব ধবে বাখি
কাঁকডাকা ভোবে ছাড়ি;
হোস না লঙ্কাঝাল, পেট জ্বলে যাবে
খিদের মুখেও খেতে নাবি তোকে,
মাথার বালিশ নয়,
রাতে পেতে শুই, দিনে কিবা কাজ বলো ?
হোস না ভাতের মত মুখের গরাস —
পেটে গেলে আব কাব মনে থাকে ?
হোস না মিষ্টি বুলি
ঝটিতে মিলায তারা ;
হোস না মধুব মত,
মুখে মিঠা লাগে, স্বাদ বড় চেনা তবু।
বরঞ্চ দিস ছোযাবের খোযাবের মত প্রেম
রাতের জীবন দিনেব আশার সম ;
দুনিয়ার পথে চির সম্বল ধন
দূর পথে যাব সঙ্গে নিয়ত সাথী
নিটোল একটি লাউ,
জল ভরা যাবে
আর ভাঙ্গে যদি, হবে গীটারের ঘাট

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

সে ☐ জঁ যোসেফ রাবিয়ারিভেলো

সে
চোখ তাব নিদ্রাবিকিকিবণী
স্বপ্নাভাবে আঁখিপাতা নিমীলিত প্রায়
সমুদ্রে ডুবিযে দুই পা
উজ্জ্বল দুই হাতে প্রবাল কুড়ায়
জড়ো করে লবণেব তাল।

কুয়াশায ঢাকা এক খাড়ি
সেইখানে স্তূপীকৃত, বেঁচে দেবে —
কিনে নেবে কাটাজিব উলঙ্গ নাবিকের দল
অতঃপর বৃষ্টিধাবে ঢাকে চারিধার
অতঃপর বৃষ্টিধারে বমণী বিলীন
শুধু তাব কেশরাশি বাতাসের ঘায়ে
দোলা খাবে সামুদ্রিক শ্যাওলার প্রায়
হযত বাতাসে পাব বিস্বাদ
লবণের কণা

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

ক্যাক্টাস □ জঁ যোসেফ রাবিয়ারিভেলো

অজস্র মুষ্টিবদ্ধ হাত
নীল আকাশে সমুদ্ধত পুষ্পাঞ্জলি সম
অজস্র অঙ্গুলিবিহীন হাত বাতাসে অনড়
ওরা বলে উৎসমুখ গুপ্ত রাখে অমলিন তালু
সেই উৎসে প্রাণ পায় অপ্রমেয় গাভী
অগণিত জাতি, দক্ষিণ সীমান্তে ফেরা
অগণিত জাতি।

অঙ্গুলিবিহীন হাত, উৎসমুখ হতে
উর্ধ্বপানে উঠে
বিকলাঙ্গ হাত, আকাশেবে কিরীট পবায়

যখন সবুজ ছিল নগরের ধার
অরণ্য ধন্য ছিল চাঁদের নজরে
ষাঁড়ের পিঠের মত ইয়ারিভ পিরি
ছাগলেরও দ্বিধা বিচবণে,
সেইখানে উৎসমুখে নিরাপদ ছিল
কুষ্ঠরোগীর হাত, সেই উৎসে করেছিল পান

নেমে এসো সেই গুহাপথে
অসুখের উৎসমুখ খুঁজে
সন্ধ্যা বা প্রভাত যার নাগাল না পায়,
তবুও আমার অধিক জানবে না কিছু।
মাটির রক্ত আর পাথরের স্বেদ
বাতাসের বীজ,
সেই সবই প্রবাহিত তালুতে তালুতে
সেই সবই অঙ্গুলিকে বিগলিত করে,
স্বর্ণাভ কুসুম ফোটায়

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

বাড়ি ফেরা □ লেন্‌রি পিটার্স

বহতো সময়েরই এখন রাজ্যপাট
নালা-নর্দমার ওপর দিয়ে যেভাবে বয়ে যায় হালকা জলোচ্ছ্বাস,
বয়ে যায় আমাদের এবড়োখেবড়ো পথের ওপর —
যেখানে গরাদ-ঢাকা বাড়ি।

যে সময়কে আমরা গোর দিয়ে চলে এসেছিলাম
হঠাৎ অচেনা ভাবে পালটে গেছে তার মর্জি,
যে সময়কে আমরা ঠিকঠাক সাজিয়েছিলাম
যে স্মৃতিগুলো আমরা রেখে এসেছিলাম —
পালটে গেছে সব।

আমাদের মরকুটে শেকত-বাকড়
জিইয়ে রেখেছিল গত জমানার বাতাস-তাড়িত বীজগুলি।
যে নদীর ধারে কুমারীদের আমরা নিয়ে গেছি
সেখানে ফন্‌ফন্‌ করে বেড়ে উঠেছে উদ্ভিদেরা।

শহরের প্রান্তে
কবরখানার ঠিক লাগোয়া
দাঁড়িয়ে আছে ছায়াহীন একটা বাড়ি
যেখানকার বাসিন্দা কিছু নতুন কংকাল।

সারা দুনিয়া ঘুরে
ফেরার প্রচণ্ড তাগিদ নিয়ে
আমাদের বাড়ি ফিরে আসার ঘটনাকে
স্বাগত জানাতে
যা কিছু অপেক্ষায়, তা স্রেফ ঐটুকুই।

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

দু'টি চোখ চেয়ে আছে নক্ষত্রের দিকে ☐ ক্রিস্টোফার ওকিগ্‌বো

দু'টি চোখ চেযে আছে
সমুদ্রসৈকত
যে জন উড়নচণ্ডি, অপলক তাব দু'টি চোখ;
ওই চোখ ছুটে যায় দূব উর্দ্ধলোকে
যা থেকে পড়বে ঝবে দূর নক্ষত্ররা।

যে কথা কাউকে আমি কখনো বলিনি
গর্ত খুঁড়ে বেখেছি লুকিযে,
যেন জোযাবে না ডুবে যাই—
প্রোথিত বেখেছি তাবে বালুকাবেলায়।
এখন আছড়ে পড়ে লুকোনো সে কথা
নোনা সাদা ফেনা
পাথরে আছড়ে পড়ে,
আমাব ওপব,
আযোডিন-গন্ধবহ চিংড়ি, শামুক, শঙ্খ ভেসে-ভেসে আসে—
মৃত্তিকাউথিত, ধবল-সফেন-জটিলতাময়
নোনা শূন্যতার বুকে সাগবদুহিতা,
তাব কথা ঢেকে বাখি বালুকাবেলায়।

রোদে পোড়া বালুকাবেলায
বর্ষণেব ছাযা,
পুরুষ ও রমণীর মিথুনমুহূর্তে পড়ে,
বর্ষণেব ছায়া।

অনুবাদ : মাসুদ মাহমুদ

এসো বজ্র, এসো □ ক্রিষ্টোফার ওকিগ্‌বো

অন্তিম সড়ক প্রান্তে বিজয়ী মিছিল যেহেতু পড়েছে ঢুকে
হে নৃত্যশিল্পীবা, মনে বেখো বজ্র মেঘে মেঘে...
দাঁতেব সাবিব ফাঁকে যেহেতু বিদীর্ণ অট্টহাসি কম্পমান ঝুলে থাকে,
হে নৃত্যশিল্পীবা, মনে বেখো দিগন্তেব বিদ্যুল্লতা...
বিকেলেব বেগুনী কুযাশা জুড়ে এবই মধ্যে ভাসে শোনিতের ঘ্রাণ
পবাক্রমী কর্তৃত্বেব অলিন্দে–অলিন্দে দেখো মৃত্যুদণ্ড ওৎ পেতে আছে;
ভযাল কি যেন টান দিচ্ছে বহিবাঙ্গনেব শক্ত তাব,
বিশাল অমেয এক কুহেলিকা, গভীর জলের বাত্রি,
অমুদ্রনযোগ্য ও অনামী এক লৌহস্বপ্ন, পাথবেব পথ

বন্ধ্যা খামাবেব ফসলের নিদ্রালু বীজেরা প্রত্যক্ষ কবছে,
এই শতকেব ব্রাশফাযাবেব ভযে পবিত্যক্ত বসতবাটিবা প্রত্যক্ষ কবছে;
জলন্ত ভাঙাবে ফেলে যাওযা শস্যকনাদেব অযুত চোখেরা প্রত্যক্ষ কবছে;
অলৌকিক বিজ্‌লি আলোয যাদুব পাখিবা ঝলসে ওঠে সর্বাঙ্গ পালকে...

ঈশ্ববেব তীব কাঁপে আলোব তোবণে,
কাবফিউব ডঙ্কা প্রমত্ত বিলোল কবে মৃত্যুব নৃত্যকে;

গোপন বহস্য তার প্রবল নিশ্বাসে
লোহার মুখোশে ভীত কবে
শতাব্দীর জ্বলে ওঠা অন্তিম মশাল...

অনুবাদ : মাসুদ মাহমুদ

শোকগাথা ⬚ মাইকেল একেরুয়ো

দেখলাম পাবাবত।
আকাশটা নীলে নীল।
জেগে ওঠে পত্রালি।

আর   চৈত্রের পারাবত
গায়   নবায়ন পৃথিবীব
মহা   সূর্যের উত্তাপ।

ধরিত্রী ছিল নীল।
গাছগুলি উত্তাল
পায়রাব উল্লাস।

চৈত্রের কন্দরে
পায়রাটা ধরতেই
আকাশ হলো পাঙাশ

আর আমিও গেলাম মরে।

অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বালতি থৈ থৈ চাঁদ □ গ্যাব্রিয়েল ইমোমোতিম ওকারা

দ্যাখ্ চেয়ে দ্যাখ্
ঠিক ঐখানে
মচে–মলিন
ডালে থৈ থৈ
বালতির চাঁদ

তোরা চেয়ে দ্যাখ্
ভাসে উজ্জ্বল একখানা থালা —
চন্দ্র ! নাচছে রাত্রিবেলার শান্ত হাওয়ায়
দ্যাখ্, যারা শুধু অর্বুদ ঘৃণা বিবমিষাময়
হাহাকার তুলে কাঁপাস পাঁচিল! নাচন্ত চাঁদ
ঘোলা কাদাজলে যুযুধান ঐ বালতি ছাপিয়ে
ঝরে অনাবিল প্রশান্তি হয়ে, তোরা চেয়ে দ্যাখ্।

-অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্তার ছবি দেখে □ বেন ওক্‌রি

নিশা–অন্তে ক্রমশ বিকৃত হয
আত্মা আমাদেব
প্রতিহিংসা টেনে চলে দীর্ঘ ক্লিষ্ট ছায়া।

নতুন দিব্য দৃষ্টি
জন্ম নিতে পারে দুঃস্বপ্নেব বুকে,
যন্ত্রণা আর ভালবাসা
আলোময় করে দিতে পাবে ভাবীকাল।

রামধনুর দূরতম ধাবে
মহাতঙ্ক আছে,
আমরা খনন করব
মানবিক দুঃখের হাহাকাবে পূর্ণ পাত্রখানা।

অনুবাদ : ধ্রুবগুপ্ত

তোমার যুক্তি আমাকে ভীত করে, মান্দেলা ▯ ওলে শোয়িঙ্কা

তোমার যুক্তি আমাকে ভীত কবে, মান্দেলা,
তোমার যুক্তি আমাকে ভীত করে। স্বপ্নেব
সেই বছরগুলো, কল্পনাময় আশায়
ত্বরান্বিত সমযেব সেই বছরগুলো, কাজকে নতুন ভাবে
স্বাদু ক'রে তোলার বছবগুলো, সেই আহ্বান,
বেগমাত্রা তুঙ্গে উঠে 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এর
চারধারে এক সুপারনোভায়
ফেটে পড়াব ! তাবপর নিস্তব্ধতা। নীরবতা।
তোমার একক বাস্তবতাকে পৃথিবী
ঘিরে আসে, বাকী সব ... স্বপ্ন ?

তোমার যুক্তি আমাকে ভীত কবে।
কী শীতল ঘৃণা করো তুমি ভোজবাজিকে!
'চিচিং ফাক', আর এক যাদুকরের দণ্ডস্পর্শে
কব্জায় দু'দশকের মরচে খসে যাবে ?
শ্বেত যাদু, গজদন্ত–শীর্ষ কালো যাদুর দণ্ড,
এক মুহূর্তের দণ্ড, এক মুহূর্তেব দাঙ্গা–মুগুর,
বৈদ্যুতিক গরু–খোঁচা এবং চাবুক কিংবা সৃজ্যামবোক
মাংস--খোবলানো আর রক্ত–এবং–মগজ–ছড়ানো ?

কৌশলের থলে, রেশমী উষ্ণীষ–পালক তার
পরিণত গ্রন্থিসঙ্কুল রশিতে, কালো ললাট তা' ভাঙবে ?
একটি শশক–ঘুষি শশককে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ?
দুগ্ধনিভ শ্যেন পাখির নখে পর্যবসিত ঘুঘু পাখীরা ?
বন্দুকের নল ভেদকারী জলপাই শাখা তোমার জন্যে নয়,

কাঁটাতারের মালা, কালো–অনিচ্ছুক খ্রীস্টদের
মস্তক মাল্যশোভিত করতে জট–পাকানো কাঁটা।

ধৈর্য তোমাব অমানুষিক হয়ে উঠছে, মান্দেলা।
তুমি কি খাদ্য ফলাচ্ছো ? ইঁদুর আর সরীসৃপেব
সঙ্গে কবছো বন্ধুতা ? সময়েব শম্বুক গতিব জন্যে
মাপছো মাসেব বাড় ?
তুমি কি এখন ক্রসওয়ার্ড ধাঁধাব বিশেষজ্ঞ ?
দাবা ? ওহ্, না। দাবার ঘুঁটিতে ছড়িয়ে থাকে
অন্তর্ঘাত। সাদা আর কালোর কাঠামোবাঁধা সংঘাত,
সমান সাজানো এবং সমান গতি ? একটি সমান বোর্ড ?
না? রোবেন দ্বীপে নয়। ছক–কাটা ফলক ? খারাপ থেকে আরো খারাপ।
শ্রেণী কিংবা রাজা–প্রজা নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীর জন্যে
ঐ খেলাটির কোনো শ্রদ্ধা নেই। সুতরাং আঁচড় কেটে লেখা ?

একচেটিয়া ? এখন, যখন ... । খেলার রীতি–প্রণালী
তুমি জানো, জানে তাবাও।
সংগ্রহের সময় আসুক, গণসিন্দুকে কার্ডে লেখা ‘শুধু শ্বেতাঙ্গরা’।
জুয়াড়ীর মুদ্রার ন্যায় দু’দিকেই মুণ্ডু কিংবা লেজ,
‘সুযোগ’–কার্ডে লেখা : জেলে যাও। সরাসরি জেলে।
‘যাও’–কে অতিক্রম করো না। শততম ...
সংগ্রহ কবো না। মাছেরা ভোজ খায়, আমার মনে হয়, তাদেরকে,
রোবেন দ্বীপে যারা ‘যাও’-কে এড়িয়ে যেতে চায়।

তোমার যুক্তি আমাকে ভীত করে, মান্দেলা, তোমাব যুক্তি
আমাকে খর্ব করে। তুমি কি এখন পোষো টিকটিকি ?
ঘাসফড়িং তোমার নীরবতা ভঙ্গ করে ?
বাদুড়ের র‍্যাডার–সঙ্কেত তোমার দূরত্ব–জয়ী দৃষ্টির
মূর্তিকে ইচ্ছেমতন ধ্রুবলক্ষ্য করে ?
চোখচেরা আলোর ঝল্‌কানি নেই
এমন একটি বাল্বের কম্পিত আলোর গায়ে
দেয়ালী পোকা তাদের পাখা ভাঙ্গে ?
তোমার দৃষ্টি পোকা থেকে বাল্বে পাক খায়,
আলোর নাড়ীর ওঠানামায় স্থির হয়—
শূন্যে ফাঁদে পড়া টাঙস্টেন তারের

একটি ভগ্ন বৃত্তচাপে উদ্ভিন্ন সদৃশ অনুভূতি তাবা ?

পৃথিবীর শ্লেষ্মাময় ঘূর্ণনের সঙ্গে–সঙ্গে তোমার নাড়ী,
আমি জানি, শ্লথ হযেছে। আমি জানি, মৌসুমের সঙ্গে
তোমার ঋষিব রক্ত তপ্ত হয, শীতল হয়,
মন্দতম হাওযায় সাড়া দেয, কিন্তু
কাছিম পাযেব পবিবর্তনকেও বিপন্ন করে
যে হাওযা কিংবা ঝড়, তার সঙ্গে যোগ দিতে ঘৃণা কবে।

আমাদেব পৃথিবী কি আলোক–বর্ষ দূরে, মান্দেলা ?
এক ভয়াবহ বর্ণ–প্রাধান্যের বিরুদ্ধে
চূড়ান্ত সাহসের কল্পনায় হারিয়ে–যাওযা
তোমাকে কে ফিবিযে আনে পৃথিবীতে ?
নৈশপ্রহবীর অমানুষী পদচারণা ?
জুডাস–গর্ত্তকে লংঘনকারী
কোনো মদবিহ্বল চোখ ? মান্দেলা, আমাকে বলো,
ওই প্রহরী, সে–ই কি তোমাব বন্দী ?

তোমাব প্রাচুর্য আমাকে বিপন্ন কবে, মান্দেলা,
তোমাব হৃদযের ওই আঁটো ঢাকেব চামড়া
যার ওপব আমাদের লক্ষ মানুষ নাচে।
আমার ভয় হয় তোমার ধমনীতে আমরা
হুড়কা লাগাই, জোঁক লাগাই। আমাদের
প্রাত্যহিক আনাড়িপনা তোমার ইচ্ছের
তীক্ষ্ণ ধারকে দেয় ভোঁতা করে।
আপোষেরা তোমার কর্মের পরিপূর্ণতাকে ক্ষুণ্ন কবে
একটি মহাদেশের স্বেচ্ছায় শূন্যকৃত পেটকে ভরিয়ে
তোমার কি অবশিষ্ট থাকবে, মান্দেলা ?

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায

আমাদের জীবন — ম্‌বেলা সোনে ডিপোকো

মরুভূমি জুড়ে তার বেদনা ছড়িয়ে দেয আর্ত এক পাখি
বাতাসের বুকচেবা গান
যখন এ মরূদ্যানে ওরা
জল তুলে নিতে নিতে বলে
দেখো কত নিচে ওই উড়ে যায় কতই–না মর্মছোঁযা গানে

ডানা মেলে দেওয়া আশা যাকে আজ স্বপ্ন মনে হয
(আমাদেব নিযতিকে ঢেকেছিল কালো আবরণে)

যখন শহরে আমবা একই মন্ত্র স্তব কবে গেছি
যখন গ্রামেও আমরা জপে গেছি প্রাচীন পুরাণ
আগামীকালেব কিংবা তারও কোনো উত্তরকালেব এক নবীন দেশের দিকে
আমাদের নিবাশা বা আমাদের জীবন বা আমাদের নশ্ববতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে
রক্তদানে আমাদের ভালোবেসেছিল যাবা তাদেব দানের মোহে খুশি হতে হতে

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

কবচের উদ্দেশে নাচ : থচিকাইয়া উ তাম্‌সি

এখানে চলে এসো
আমাদের ঘাসেরা পুষ্ট
এসো তোমরা হরিণ-শিশুরা

রুগ্‌ন হাতেব ভঙ্গী এবং ছুরিকাঘাত
বঙ্কিম এবং তারপর কল্পনায় বাধাগ্রস্ত
কেউ একজন—কে ? তুমি আমার ভাগ্যনিয়ন্তা
এসো তোমবা হবিণ-শিশুরা

এখানে প্রভাতের নমনীযতা
এবং রক্ত এখানে মুখোশাবৃত
এবং বঙধনু-বঙ স্বপ্ন গলার রশি
চলে এসো এখানে

এখানে আমাদের ঘাসেবা পুষ্ট
আমার প্রথম আগমন ছিল
একটি চক্‌মকি পাথরেব নির্মম বিস্ফোরণ
নির্জনতাকে
আমার মা আমাব কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন
করে দেবেন প্রজ্বলিত।

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘৃণাকারী থচিকাইয়া উ তাম্‌সি

আমাব ঈশ্বর, আপনার গৌববে আমি পান করছি,
আপনি, যার কারণে আমি এ্যাতো বিষণ্ন,
আপনি আমাকে দিয়েছেন সে এক জাতি,
যাবা জিন চোলাই করে না

আপনার আনন্দোৎসবে কোন্ মদ আমি পান করবো
এই দেশে, যাব কোনো দ্রাক্ষালতা নেই,
এই মরুভূমিতে, সকল ঝোপই যেখানে কাঁটা ?
তাদের ফুলেব ফসলকে কি আমি ভাববো
আপনার কামনাব জ্বলন্ত ঝোপেব শিখা ?
আমাকে বলুন, কোন মিসবে আমাব মানুষের
পদযুগল রযেছে শৃংখলিত ?

খ্রীস্ট, আপনাব বিষাদে আমি হাসি,
আহা, আমার প্রিয় খ্রীস্ট,
কাঁটাব বদলে কাঁটা।
কাঁটার একই এই মুকুট আমাদের।
আমি ধর্মান্তবিত হবো, কারণ, আপনি প্রলুব্ধ কবেন আমাকে,
ইউসুফ আমার কাছে আসেন।
আমি ইতোমধ্যেই চুষি আপনার মাতা কুমারীর স্তন।
আমার আঙুলে আমি গণনা করি আপনার একাধিক জুডাস।
আমার চোখ আমার হৃদয়কে মিথ্যে বলে।
পৃথিবী যেখানে এক মেষশাবক,
আপনার পাস্‌কল মেষশাবক,—খ্রীস্ট,
আপনার শ্লথ বিষাদের সুরে আমি নাচবো ভাল্‌জ।

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

আফ্রিকার হৃদয়ে সূর্যোদয় ☐ প্যাট্রিস লুমুম্বা

হাজাব বছব ধবে পশুর মতো লাঞ্ছনা সযেছ তুমি হে নিগ্রো, তোমার
দেহেব ছাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে মরুভূমিচারী হাওয়ায়।
নিপীড়কেরা তোমার আত্মার উপর তোমাব যন্ত্রণাব উপব
গড়েছে ঝলমলে যাদুগরী আরাধনা নিকেতন
গড়েছে হিংস্র থাবার অধিকাব, শ্বেতাঙ্গের অধিকার চাবুক চালাবার।
আব তোমাব অধিকাব ছিল শুধু মরবার, কাঁদবাবও ছিল অধিকার,
তোমার ভাগ্যের স্তম্ভে ওরা খোদাই করেছিল অন্তহীন ক্ষুধাকে
অন্তহীন শৃঙ্খলকে।
অবণ্যের আববণের তলেও এক বীভৎস নির্মম মৃত্যু
সাপের মতো চেয়ে–চেয়ে দেখেছে তোমাকে, অবণ্যের অগণিত কোটর
আর
শীর্ষগুলো থেকে গুড়ি মেরে এসেছে তোমার দিকে জড়িয়ে ধরেছে
তোমার দেহকে, তোমার অসুস্থ আত্মাকে।
এরপরে ওরা তোমার বুকের উপব বসিয়ে দিয়েছে বিশ্বাসহন্তা
প্রকাণ্ড বিষধর সাপকে,
তোমার ঘাড়ে ওরা গলিত আগুনের জোয়াল পরিয়ে দিয়েছে,
তোমার দয়িতাকে ওরা কেড়ে নিয়েছে নকল মুক্তা ছুড়ে দিযে,
কেড়ে নিযেছে ওরা তোমার অবিশ্বাস্য অপরিমেয় ঐশ্বর্যকে।
তোমার কুঁড়েঘর থেকে রাত্রির গহীন অন্ধকারে ভেসে গিয়েছে বিশাল
কালো নদীগুলোর বুক বেয়ে আর্তনাদেব ধ্বনি,
ধর্ষিতা বালিকাদের কান্না, অশ্রু ও রক্তের স্রোতধারা, ভেসে গিয়েছে
কান্না
সেই জাহাজগুলিকে ঘিরে যারা সমুদ্র পেরিয়ে চলে গিয়েছে
আরেক দেশে।
যে দেশে পিঁপড়ের ঘরে·থাকে খুদে মানুষেরা আর রাজত্ব করে ডলার
মুদ্রা

গিয়েছে সেই অভিশপ্ত দেশে, তাকে তারা ডেকেছে মাতৃভূমি বলে।
যেখানে তোমাব সন্তানেরা, তোমাব দযিতা দিবারাত্রি ভয়াবহ নির্মম
পেষণে
দলিত নিষ্পেষিত হযেছে ভীষণ যন্ত্রণায়।
তুমিও তো মানুষ আর সকলেব মতো।
ওরা প্রচারণা চালিযে তোমাকে বিশ্বাস করাতে চায়
সৎ শ্বেত দেব অবশেষে একদিন মেলাবে সমস্ত মানুষকে।
আগুনেব ধাবে বসে কেঁদেছ তুমি, পরেব ঘবের দরজায় পড়ে থাকা
ঘবহাবা ভিখাবীর দুঃখেব গানগুলি গেযেছ তুমি।
তাবপব খ্যাপামি যখন পেয়ে বসেছে তোমাকে, বক্ত টগবগ কবে
ফুটেছে,
বাত্রিতে রাত্রিতে তুমি নেচেছ, ককিযেছ,
পিতৃপুরুষেব আবেশ পেযে বসেছে তোমাকে।
পুরুষালি সুরে বাঁধা গানের তালে–তালে ঝড়ের ক্রোধের মতো
এক শক্তি বিস্ফোরিত হযেছে তোমাব মধ্য থেকে।
হাজাব বছরেব দুঃখ কষ্টেব প্রতিবাদরূপে।
জাজ–বাজনার ধাতব স্ববে অনাবৃত উচ্চ চীৎকারে
সেই বিস্ফোবণ দৈত্যাকৃতি ঢেউ তুলে মহাদেশেব মাঝখান দিযে
চলে যায় বজ্রসম।
সমগ্র পৃথিবী বিস্মিত, আতঙ্কিত, উঠে বসে, বক্তের উত্তাল ছন্দে,
জাজ–বাজনার হিংস্র ছন্দে দোলা খায়।
এই নতুন গান শুনে শ্বেতাঙ্গের মুখ হযে যায় পাণ্ডুর।
এই নতুন গান রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিযে রক্তাভ মশাল
বয়ে নিয়ে যায়।
ভাই আমার, এই তো প্রত্যূষ, এসে দাঁড়িযেছে ভোব।
আমাদের মুখেব দিকে তাকাও। আমাদের পুরানো আফ্রিকাতে
নতুন সকাল এসে পড়েছে।
এখন শুধু আমাদেবই হবে এই ভূমি, জলাশয়, বিশাল নদীনালা—
আমাদেরই হবে এরা যাদের হাজার বছর ধরে বেচারা নিগ্রো তুলে
দিয়েছে অপরের হাতে।
সূর্যের কঠিন মশালগুলি আবার আমাদের জন্য জ্বলবে, তোমাব
চোখের জলকে, মুখেব ওপবকার থুতুকে শুকিয়ে দেবে।
যে মুহূর্তে তুমি শিকল ভাঙবে সেই মুহূর্তেই।
ভাবী বেড়িগুলি–অশুভ নিষ্ঠুর যুগযুগান্তর যাবে আর ফিরে আসবে না।
এক স্বাধীন, নির্ভয় কঙ্গো উঠবে কালো মৃত্তিকা থেকে এক স্বাধীন,
নির্ভয় কঙ্গো ..... কালো ফুল, কালো বীজ।

—অনুবাদ : রণেশ দাশগুপ্ত

এক আঁজলা খবর □ আতোঁয়ান রোজার বোলাম্বো

যে জলা ধুয়ে দেয়
ক্যালাবাশ শাঁকের মহান আত্মা
পাহাড়গুলো কুঁজো হয়ে
লাফ দিয়ে ওঠে সেই জলার ভিতর থেকে

গুজব রটে রাজদ্রোহের
জ্বলন্ত তলোয়ারের মতো
পৃথিবীর ধমনী
ফুলে ওঠে পালিনী রক্তে
ধরণী কোলে তোলে
নগর গ্রাম কুঁড়ে
অরণ্য আর বনভূমি
যা পূর্ণ হয়ে আছে কীটের শুঁড়-শোভিত শৃঙ্গী দানবে
তাদের দীর্ঘ কেশর হল সূর্যের দর্পণ।

এরা তারা–ই যারা রাত্রি নামলে
চালিত করে বাদুড়ের বাহিনী
আর ভয়ের পাথরে
শানিয়ে নেয় তাদের অস্ত্র
ধ্বংসেব পাটাতনের ওপর
বাতাসের গতির সঙ্গে ভাসে
অপরাধীর আত্মা
মর্ত্যবাসীর বিবাদকে পরোয়া না করে
আগুনের ফণায়
ছিঁড়ে আনে বিদ্যুতের হীরক-হৃদয়

নিশ্চয়ই বিদ্রুপ হল ধূমায়িত মাংসের পাত্র
নিশ্চয়ই দুঃসাহস প্রতিহিংসার স্তোত্র পাঠ করে

কালা আদমীর ধূর্ততার মতো
তারা এক বর্ণও বোঝে নি
বৃশ্চিকের দুর্জ্ঞেয় ভাষা :
দৃঢ়তা

বোঝে নি ওঝাদেব ক্রোধ আব
আব ছুঁড়ে-মাবা ছোরার হিংস্রতা
সর্ব-পাবঙ্গম।

অনুবাদ : রাম বসু

লাবিনোর গান (অংশ) □ ওকোট পি'বিটেক

শুনুন, আমার জ্ঞাতিগুষ্ঠি
আমি আমার স্বামীর জন্যেই কাঁদছি
যার মাথাটা একেবারে গেছে!
ওকোল তার মাথাটা খুইয়ে বসেছে
বই–পুথির অরণ্যে।

আমার স্বামী যখন অব্দি
আমার ভালোবাসা পাবার জন্যে কাঙাল ছিলো
তার চোখগুলো তখন ছিলো জ্যান্ত,
তার কান দুটোয় তখন অব্দি তালা আটকায়নি,
তখনও গাড়ল হ'য়ে ওঠেনি ওকোল,
আমার প্রাণসখা তখনও ছিলো পুরুষ !

তখনও সে কোনো মেয়েছেলে হ'য়ে যায়নি
তখনও সে ছিলো স্বাধীন পুরুষ
তার হৃদয়ই তখনও ছিলো তার শাসক।

আমার স্বামী তখনও ছিলো কালোমানুষ
মহিষের ছেলে
আগিক–এর ছেলে
ওকোলের মেয়েছেলে
তখনও ছিলো পুরুষ,
ছিলো আকোলি ...

আমার স্বামীর ডেস্কের ওপর কাগজপত্র
ভয় দেখিয়ে কেমন কুণ্ডলি পাকায়
অতিকায় জংলি লতার মতো

কিংবা গাছের মতো
যা অন্য গাছদের নিংড়ে-শুষে মেরে ফ্যালে;
কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়
অন্যরা প'ড়ে থাকে চিৎপাত,
ওরাক নাচের সময়
যুবকদের পায়ের মতো
তারা পেঁচিয়ে যায় পরস্পবেব সঙ্গে,
গোগো বেড়াব
কাঠের ফালিগুলোর মতো
তাবা পেঁচিয়ে থাকে আঁটো
অতিকায় জংলি লতাব পায়ের মতো
দুর্ভেদ্য অরণ্যে।

পুথিপত্রের এক বিপুল জঙ্গলই
আমার স্বামীর বাড়ি,
অন্ধকার, বেজায় স্যাঁতসেতে,
ভাপ ওঠে মাটি থেকে
তপ্ত, ঘন আব বিষাক্ত
মিশে যায় খইয়ে-ফেলা ক্ষার শিশিবের সঙ্গে
আর বৃষ্টির ফোঁটা
জ'মে আছে পাতায় পাতায়

হায়, আমার জ্ঞাতিগুষ্ঠিব মানুষ,
আসুন, আমরা একসঙ্গে কাঁদি,
আসুন,
আমরা আমার স্বামীর মৃত্যুতে শোক করি,
এক রাজপুত্রের মৃত্যু
বিরাট এক আগুনকুণ্ড থেকে
জন্মেছে যে ছাইভস্ম।
লাকারি কাঁটা দিয়ে
আটকে দিন ফটক,
কারণ আসনে বসবার উত্তরাধিকার যার ছিলো
সেই রাজপুত্র হারিয়ে গেছে !
আর যুবাপুরুষরাও সকলে
জঙ্গলে নষ্ট হয়ে গেছে !

আর এই গেরস্থালির খ্যাতি
একদিন যা দাবানলের মতো দাউ–দাউ ছড়িয়ে পড়তো
চাঁদ–না–ওঠা রাতে
সে এখন যেন কোনো মুমূর্ষু থুবথুবের
খাবি খাওয়া !

সত্যিকাব ছেলে আর একজনও নেই,
সাবা গাঁটাই গিয়ে পড়েছে
যুদ্ধবন্দী আব ক্রীতদাসদের হাতে!
হয়তো আমাদের কোনো ছেলে
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে !
হয়তো সে লুকিয়ে আছে ঝোপের মধ্যে
সূর্য কখন ডোবে তারই জন্যে।
কিন্তু সে কি কখনও আসবে?
পবেব বার শোকবিলাপেব আগে?
সে কি এসে পৌছুবে সময়মতো?

আমার ভেতবটা পুড়িয়ে দিচ্ছে পিত্তি !
বমি বমি করছে আমার!
কাবণ আমাদের সব যুবক
জঙ্গলে খতম হ'য়ে গেছে,
খতম হ'যে গেছে তাদেব পৌরুষ
ক্লাসঘবেব মধ্যে,
তাদের বিচিগুলো
থেৎলে ফেলা হয়েছে
প্রকাণ্ড সব পুথি দিয়ে

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েদির গান (অংশ) ☐ ওকোট পি'বিটেক

আজ কি তবে
আমার বাবার শ্রাদ্ধের দিন নয়?

আমাব জ্ঞাতিগুষ্ঠির সব মেয়ে-পুরুষ
এসে জড়ো হয়েছে আমাদের গাঁয়ে।
তারা ব'সে আছে গোল হ'য়ে
গোলাঘরের ছায়ায।
কিন্তু অভ্যর্থনা জানিয়ে যে
কিছু বলবে, সে কে ?

ছেলেরা পান করে কেরেটে বিয়ার
মেয়েরা রান্না করে পাঁঠার মাংস
আব বানায় জোযারের রুটি,
কিন্তু আমি তো আর সেখানে নেই
গাঁওবুড়োদের কাছে
রেকাবিগুলো সাজিয়ে দেবার জন্যে !
পুরুতরা মুর্গির মাংসের
ছোট-ছোট টুকরো ছোঁড়ে
তারা ফিন্‌কি দিযে ছোটায় পাঁঠার রক্ত
আর ঢেলে দেয় মন্ত্রপড়া জল
জমায়েৎ মৃতদের
আত্মার উদ্দেশে,
কিন্তু আমি কী ক'রে এখান থেকে
কথা বলি
আমার পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে!
কেমন ক'রে তারা পারবেন

আমাব বুকে-পিঠে
একস্থলিব ভুক্তাবশিষ্ট চাপিয়ে দিতে ?
কেমন ক'বে আমার ঠাকুমা আমার ওপর
থুতু ফেলবেন আশীর্বাদের ?

আমাব সমবয়সীরা পবেছে
সাদা উটপাখির পালক,
তারা গাইছে যুদ্ধেব গান,
ওদেব সঙ্গেই আমি যোগ দিতে চাই
বনে-জঙ্গলে
এই মৃত্যুকে তেড়ে গিয়ে ভাগিয়ে দিতে
আমাদেব গাঁ থেকে,
তাড়িয়ে দিতে তাকে হাজার মাইল দূবে
পাহাড় পেবিয়ে ওপারে
পশ্চিমে,
ডুবে যাক সে
অস্ত-সূর্যেব সঙ্গে,
আবাব যেন উঠে না-আসে কখনও।

আমি যোগ দিতে চাই
বান্ধবাসবের নর্তকদের সঙ্গে,
এই মাটিব ওপর পা ফেলতে
দাপটে
আব নড়িয়ে দিতে চাই কববের মধ্যে
আমাব বাবাব হাড়গোড় ।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যদি ⎵ জারেদ আন্‌জিরা

আমার যাত্রাপথে
কাঠবিড়ালি যদি রাস্তা পেরোয়
তবে জানব ভাগ্য সুপ্রসন্ন
কিন্তু যদি চিতা কিংবা বনবেড়াল
রাস্তা পারাপার করে তখন
আমি পেছন ফিরে ঘরমুখো রওনা দিই।

আমার যাত্রাপথে
যদি ডান পা-টা ঠোক্কর খায় পাথরে
আনন্দে আমি হই আটখানা
জানি, পেট পুরে খেতে পাব আমি
কিন্তু যদি ঠোক্কর খায় বাঁ পা
চটপট পেছন ফিরে ঘরমুখো রওনা দিই।

কামিজটা গায়ে চড়াতে গিয়ে
যদি উল্‌টো করে পরে বসি
খুশিতে আমি জুড়ে দিই লম্ফঝম্প
জানি, খেতে পাব পেট ঠেসে।

পাখিডাকা আবছা-আবছা ভোরে
যদি প্রথমেই মুখোমুখি পড়ে যাই
কোনো থুথ্‌ড়ে বুড়ির
হুড়মুড়িয়ে আমি ফের ঢুকে পড়ি কম্বলের নিচে
জানি, এটা ভারি অশুভ লক্ষণ।

নাক-ডাকানো গভীর ঘুমের মধ্যে
যদি স্বপ্ন দেখি আমার আপনজন গেছে মারা
অমনি আমার ঘুম ভাঙে আনন্দে

জানি, আমার সেই পরমাত্মীয়
আগের রাতে নির্ঘাত খেতে পেয়েছে পেট ঠেসে
আর যদি স্বপ্ন দেখি আমি নিজেই অক্কা পেয়েছি
দারুণ খুশি হয়ে যাই
কারণ জানি আমি লম্বায বেড়ে গেছি ইঞ্চিখানেক।
আব যদি আমি স্বপ্নে দেখি
আমাব মনেব মতো এক বিশেষ মেয়েকে
তবে আমি হই আশায নিরাশ
জানি, সেই আশা আমার মিটবে না। না।

ভোববেলা ঘুম ভেঙে উঠে
যদি দেখি একদিন আমাব দাঁতগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে
আর হয়ে এসেছে পড়ো-পড়ো
তাহলে আমি নিশ্চিত জানি
প্রাণটা আমাব পরীর দেশে যতই প্রেম খুঁজে ফিরুক
দাঁতগুলো নির্ঘাত গু-মুতে জুবড়ে থেকেছে।

মুরগির কোঁকর-কোঁ শুনলেই জানি
তাকে এখুনি জবাই করা দরকার
সে-যে ভয়ানক অমঙ্গলের কারক
কুকুর ঘেউ-ঘেউ ডাক ভুলে
হাউ-হাউ কান্না জুড়লে
বুঝি, গাঁয়ের মোড়লের
মরণ ঘনিয়েছে
আর যদি আমি মাথায় ভর হেঁটমুণ্ডে হাঁটি
তো জানি আমি আর নেই, আমি মরে ভূত।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায

অলৌকিক অন্ন □ জারেদ আন্‌জিরা

আর তাই কমলাবঙ-ভোরে
সকলেই প্রতীক্ষায় ছিল অলৌকিক অন্নের
আর তাদের জোড়ায়-জোড়ায় পা
ফেটে চৌচির কন্‌কনে শিশিরে

এই অলৌকিক অন্নের যোগান দিতে
মজুবদের ডাক দেবে যে
এমন কারো মাথাব্যথা ছিল না সেখানে

বরং অনেকে বলল
ঈশ্বব কখনও কায়িক শ্রম তো কবেন নি
তাই শাস্ত্রে অমন অলৌকিক কাণ্ডেব কথা লেখা

অলৌকিক সেই অন্নেব
পয়লা চালানটি
দেখতে-দেখতে এসে নামল একটা ধোয়ামোছা তক্‌তকে জায়গায
তবে গুজব-রটাতে-পোক্ত খাদ্য-পরিবেশকদের অনেকেই
সেই অন্ন কিন্তু চর্মচক্ষে দেখল-ই না

বাচ্চারা খিদের তাড়সে গলা ছেড়ে কান্না জুড়লে
গতরসোহাগী নিষ্কর্মা মায়েরা দৌড় লাগাল
জেনানা-মহলের চিকের আড়ালে
এমনকি যেসব জননী
গতরে খাটেন
দিনরাত প্রাণপাত
ঘোমটায় অসহায় মুখ ঢাকলেন তাঁরাও

দেখতে-দেখতে সেই অন্ন-বওয়া খেয়া
মাটি ছেড়ে উঠে পড়ল উঁচুতে
আর সঙ্গে সঙ্গে হা-অন্ন সেই দিশি মানুষগুলোও
হাঁকুপাঁকু লাফ দিল আকাশে
কিন্তু উঁচুতে উঠে তারা খালি দেখতে পেল
সাতরঙা একটা রামধনু মাত্র
আর তা ভরসা দিল ওদের
সামনের সাতদিন কেবল খিদে কেবল খিদে
সামনের সাতদিন পরে নির্ঘাত মৃত্যু।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৯-এর জন্য একটি কবিতা লেখার অনুরোধে □ জ্যাক মাপান্‌জে

রাজা-রাজড়া আর যোদ্ধারা না থাকলে ফরমায়েসি পদ্য
মুখ থুবড়ে পড়ে।

কাম্পুচিয়ার হাড়সার বাচ্চারা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে
রোখা আইরিশ ছোক্‌রারা ছুঁড়ছে গ্রেনেড —
এসব কিছুই কবিতার পক্ষে বড্ড বেশি জরুরি
থ্যাৎলানো সেয়েটো বাচ্চারা খিম্‌চে ধরছে তাদের নাড়িভুঁড়ি
তারপর কবিতাকে আঁচড়াচ্ছে, দুয়ো দিচ্ছে।

এখন আর কোনো কবি বড় করে প্রশ্ন করে না
কেন মরতে বসা বাচ্চাগুলো
হাট-খোলা চোখে তাকায় বা বোমা ছোঁড়ে।
আর আমরা কেনই বা ঝাড়াই-বাছাই করতে যাবো
ঐ যন্ত্রণানীল সন্দেহগুলোকে
যা চিরকাল ঘিরে রাখবে আমাদের ?
আমাদের আট-সিলিণ্ডারঅলা গাড়িগুলোর
তেলের সংকটের কথা বলাই তো যথেষ্ট আদিখ্যেতা ...

যে-সময় ব্যাঙাচিদের ব্যাঙ-হিসেবে বাড়তে দেওয়াই হয় না
তখন তো বাচ্চাদের বয়স নিয়ে কথাবার্তা বলার
কোনো আলাদা মানেই নেই!

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

আফ্রিকার কবিতা : আগাস্টিনো নেটো

ঐ যে দিগন্তে ঐখানে
জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড আর
তাবই গা ঘেঁষে
আকাশে বাড়ানো হাত
ইমবোন্ডাইরো বৃক্ষবাজির
চিত্রার্পিত ঘনঘোর কালো টানা দাগ
এদিকে বাতাসে গন্ধ কাঁচা সবুজ
পোড়া তালগাছের

ঐ যে সড়ক ঐখানে বাইলুণ্ডোরী
মুটে মজুরেরা
ভুট্টার আটার ভারি ভারি বস্তা পিঠে
চলেছে কাতারে কাতারে সাবি দিযে

এখানে ঘরের মধ্যে মধুরাক্ষি
মোহময়ী নিগ্রো ইউরোপীয়া
ঘরণী রুজ আর চালেব সাদা গুঁড়োয়
ফেরাচ্ছে মুখের চেহারা
নাড়ছে কাঁকাল নারী তার
বহুবিধ পোশাকের সাজের নীচেও
ঘুম নেই বিছানায় শোয়া পুরুষের
ভাবছে এবার কাঁটাচামচ
কিনবে টেবিলে খানা খেতে।

আকাশে পড়েছে প্রতিচ্ছবি
লকলকে আগুনের যেন আয়নাতে
ঠিক তারই তলে চিত্রার্পিত
যার যার ঢাক নিয়ে ঢাকী মরদেরা

হাত তুলে বাদ্যরত আর
বাতাসে উচ্ছল কোমল ঝনৎকার
তাবে তাবে ঝংকৃত
মাবিশ্বাস।
সড়কে ঐখানে মুটে মজুবেরা
ঘবেতে ঘবণী নিগ্রো-ইউবোপীযা
বিনিদ্র পুরুষ শুযে বিছানায

পুড়ে পুড়ে খাক হযে জ্বালিযে রাখছে
কযলাগুলো আগুনেব শিখায় শিখায
দিকদিগন্তে প্রসাবিত
কোমল উত্তাপে ঢাকা দেশটাকে।

অনুবাদ : রণেশ দাশগুপ্ত

ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আগাষ্টিনো নেটো

ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আফ্রিকার
সেকাল ও একালের ক্রীতদাসদের
যন্ত্রণায় চোখ ফেটে উদ্‌গত অশ্রুতে
নানা ভিন্ সাগবেব নোংরা নর্তনের
বেইজ্জতিতে ক্লিন্ন ঘর্মে
ক্লিষ্ট–ক্ষুব্ধ

ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আফ্রিকার
অবণ্যে লোহা আর আগুনের
নিষ্ঠুর অনাচারী পেষণে থেঁতলে যাওয়া
ফুলের অসহ্য সুগন্ধের
সৃষ্টি ছাড়া অনুভবে অনুভবে
ক্লিষ্ট–ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি

ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আফ্রিকার
কারারক্ষীদেব দরজার চাবির ঝনৎকারে
স্বপ্নের শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গে
ফাঁসিতে লটকানো উচ্চহাস্যে সেই সঙ্গেই
ক্রন্দনের জয়ডঙ্কা রবে, এবং এসবের মাঝেই
ক্লিষ্ট–ক্ষুব্ধ আফ্রিকার দেশ দেশভূমিব
গোপনে সঞ্চিত ভাবরাশির
চেতনারহিত প্রদীপ্তিতে
ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আফ্রিকার

জীবন্ত
আপনা আপনি ওরা সেই সঙ্গে
জীবন্ত আমাদের সহযোগে
স্বপ্নে স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ওরা

সেজে ওঠে এই সব স্বপ্ন বাওবাব বৃক্ষরাজির
নাচনে নাচনে আর তারই ছন্দিত আবহে
কৃষ্ণসাব মৃগমৃগীদের চলনের সুমিতিতে
অর্থাৎ আছে যাব প্রাণ তাব সবাকাব
চিবকাল ধরে চলে আসা মৈত্রীতে

উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা ঘোষণায় শোনায়
জীবনেব সমস্ত ধ্বনিকে অর্থাৎ এমনকি
যে আটলান্টিক
ছিন্নভিন্ন কিংবা শবগন্ধী
নির্মাল্য নিক্ষেপ কবে তটে তটে তাতেও
এবং সাথে সাথে অবশ্যই
নির্মল সলিলে নদনদীর।

ওরা জীবন্ত
ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি আফ্রিকার
তাবৎ দায়বদ্ধ বিবেকের সমন্বিত একতানে
তাবৎ মানুষের ন্যায়নিষ্ঠ বক্তে রক্ত সঞ্চালনে
তাবৎ মানুষের সুদৃঢ় সংকল্পে অভিপ্রায়ে
তাবৎ মানুষের আন্তরিকতায়
নক্ষত্রেব অস্তিত্বেব শুদ্ধ ও সহজ সঙ্গতে

ওরা জীবন্ত
আফ্রিকার ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমি
কারণ প্রাণবন্ত জীবন্ত আমবাও
আমরা অবিনাশী কণা ও কণিকারা
আফ্রিকার ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ দেশ দেশভূমির।

অনুবাদ : রণেশ দাশগুপ্ত

বিচ্ছিন্নতার কবিতা □ আন্তোনিও জাসিন্তো

এ আমার কবিতা নয় এখনও
আমার আত্মা এবং আমার রক্তের কবিতা
না
যে মহান কবিতা ইতিমধ্যে হ'য়ে উঠছে আমার মধ্যে
তা এখনও লেখার জ্ঞানগম্যি আর ক্ষমতার খামতি রয়েছে আমার

ঝোপঝাড়ে অথবা শহরে
বাতাসের কণ্ঠস্বরে
সমুদ্রের উদ্বেলতায়
মুখাবয়ব এবং অস্তিত্বে
আমার কবিতা ঘোরে উদ্দেশবিহীন
জমকালো পোশাকে আবৃত
আমার কবিতা বাইরে বেরিয়ে এসে
ফেরি করে নিজেকে
ডেকে বলে
'লেবু কিনুন, আমার লে-এ-এ-বু কিনুন'

আমার কবিতা তার মাথায় জীর্ণ কাপড়ের
ছোট্ট গদি নিয়ে রাস্তায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে
নিজেকে ফেরি করে
ডেকে বলে
'সামুদ্রিক মাছ, সার্ডিন, ছোট মাছ
ভালো মাছ, ভালো মা-আ-আ-ছ ...'

আমার কবিতা কায়ক্লেশে হাঁটে রাস্তায়

হেঁকে বলে 'এই যে পত্রিকা' 'দৈনিক ই-ই-ক'
অথচ কোনো খবরের কাগজে এখনও ছাপা হয় না আমার কবিতা

আমার কবিতা কাফেতে গিয়ে বলে
'লটারি তুলে নাও আগামী লটারি তুলে নাও আগামী'
এবং আমার কবিতার তুলে-নেওয়া
ঘোরে লটারির চাকা যেমন ঘোরে
ঘুরপাক খায়
কখনও বদলায় না তার বলা
'লটারি তুলে নাও আগামী
লটারি তুলে নাও আগামী'

আমার কবিতা আসে শহরতলী থেকে
শনিবার ধোওয়া কাপড়-চোপড় আনে
সোমবার নিয়ে যায় ধোয়ার কাপড়
শনিবার ধোওয়া কাপড়-চোপড় সমর্পণ করে আর
সমর্পণ করে নিজেকে
সোমবার সমর্পণ করে নিজেকে আর নিয়ে যায় ধোওয়ার কাপড়

আমার কবিতা বারবনিতা
এই শহরতলীতে ওর ঝুপড়ির ভাঙা দরজায়
'জলদি করো জলদি
ফেলো কড়ি
এসো শুয়ে পড় আমার সঙ্গে'

আমার কবিতা আছে ধোপানীর মেয়ের দুর্ভোগে
যে বাজে এক মালিকের বন্ধ ঘরে
সংকুচিত অনিচ্ছুক আর লোকটা
আলসেমিতে চাগিয়ে তুলছে বলাৎকারের ক্ষুধাকে

আমার কবিতা হালকা চালে বল খেলে
ভিড়ে যেখানে প্রত্যেকেই চাকর
এবং চেঁচায়

'অফসাইড গোল গোল'

আমার কবিতা এক ঠিকা মজুর
কফির ক্ষেতে কাজ করতে যায়
চুক্তি এক ভারী বোঝা
যা বহন করা কঠিন
'ঠিকা মজু-উ-উ-র'

আমার কবিতা নগ্ন পদে পথে হেঁটে যায়
আমার কবিতা বন্দরে বস্তা ভবে
জাহাজের খোল ভরে তোলে
খোল খালি করে
এবং জোর পায় গানে
'তারে নারে নারে
হারে আমার বোঝারে।'

আমার কবিতা দড়ি-বাঁধা হ'য়ে যায়
মোলাকাত হ'ল তার পুলিশের সঙ্গে
দিলো কিছু জরিমানা, মালিক ভুলে গিয়েছিলেন
পাস-এ সই করতে
ছাঁটা চুল নিয়ে যায় রাস্তার কাজে
'মাথা মুড়ানো
গুমে-গুমে রাঁধা মুর্গিছানা
ওহে'

একটা অঙ্কুশ যা' ওজনদার
একটা চাবুক যা খেলা করে

আমার কবিতা যায় বাজারে কাজ করে রান্নাঘরে
কারিগরের বেঞ্চির দিকে যায়
ভরে তোলে পানশালা আর বন্দীশালা
গরিব ছেঁড়া কাপড়পরা আর নোংরা
আমার কবিতা বাস করে থমথমে নিশুত অজ্ঞানতায়
নিজের বিষয়ে জানে না কিছুই
জানে না কী ভাবে করতে হয় ওকালতি

কোনও কিছু যাচ্ঞা না ক'রে

নিজেকে বিলিয়ে দিতে
নিজেকে সমর্পণ করার জন্যেই তৈরি হয়েছে আমার কবিতা
কিন্তু আমার কবিতা অদৃষ্টবাদী নয়
আমার কবিতা হলো সেই কবিতা যে আগেভাগেই চায়
এবং আগেভাগেই জানে
আমার কবিতা হ'লো কালো–আমিতে
সওযাব–হওয়া সাদা–আমি
যে চলেছে জীবনের মধ্য দিযে।

অনুবাদ : শামসুর রাহমান

ঠিকা মজুরের চিঠি ☐ আন্তোনিও জাসিন্তো

প্রিয়তমা আমার,
তোমাকে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম
যে-চিঠি বলবে তোমাকে দেখার এই কামনা
তোমাকে হারাবার এই ভয়
বদান্যতার চেয়ে বেশি এই অবর্ণনীয় অসুখ বিষয়ে
আমার অনুভূতি যা আমাকে প্ররোচিত করে
এই আকুল আকাঙ্ক্ষা যাতে আমি বাঁচি পূর্ণ সমর্পণে

আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম
প্রিয়তমা আমার,
অন্তরঙ্গ গোপনীয়তার এক চিঠি,
তোমাব স্মৃতিময় এক চিঠি,
তোমার বিষয়ে
মেহেদি রঙের মতো তোমার ঠোঁট
কাদাব মতো কালো তোমার চুল
মধুর মতো মধুর তোমার চোখ
বন্য কমলালেবুর মতো শক্ত তোমার স্তন
বনবেড়ালের ভঙ্গির মতো তোমার চলন
এবং তোমার আদর যেমনটি এখানে পাব না আমি...
তোমাকে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম
প্রিয়তমা আমার,
যে-চিঠি ফিরিয়ে আনবে আমাদের লীলাভূমির দিনগুলি
দীঘল ঘাসে হারিয়ে-যাওয়া আমাদের রাতগুলি
যে-চিঠি ফিরিয়ে আনবে কুল গাছ থেকে
আমাদের ওপর ছড়িয়ে-পড়া ছায়া

যা ডেকে আনবে আমাদের মত্ত কামনা
আর আমাদের বিচ্ছেদের তিক্ততাকে ...

তোমাকে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম
প্রিয়তমা আমার,
যা তুমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়া পড়বে না
যা তুমি লুকিয়ে ফেলবে বাবা বম্বোব কাছ থেকে
যা তুমি আড়াল করে রাখবে মা কিজাব কাছ থেকে
যা তুমি বারবার পড়বে বিস্মৃতির
শীতলতা ছাড়া
একটি চিঠি যার তুলনা মিলবে না সারা কিলোম্বোতে... ...

আমি একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম,
প্রিয়তমা আমার
একটি চিঠি যা তোমার কাছে নিয়ে আসবে বয়ে-যাওয়া হাওয়া
একটি চিঠি যা বাদাম আর কফি গাছ
হায়েনা আর মোষ
ডাকসাইটে কুমির আর রূপলি মাছ বুঝতে পারবে
যদি হাওয়া পথে হারিয়ে ফেলে সেই চিঠি
তা'হলে পশু আর গাছগাছালি
গান থেকে গানে
বিলাপ থেকে বিলাপে
অস্ফুট কথা থেকে আধো-আধো কথা
আমাদের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায়
করুণা করে তোমার কাছে বিশুদ্ধ আর উষ্ণরূপে
নিয়ে আসবে চিঠির জ্বলন্ত শব্দগুলি দুঃখময় শব্দগুলি
যে-চিঠি তোমাকে আমি লিখতে চেয়েছিলাম হে আমার প্রিয়তমা

তোমাকে একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম...

কিন্তু হে আমার প্রিয়তমা, বুঝতে পারি না
কেন এমন হয়, কেন এমন হয়, কেন এমন হয়, আমার প্রিয়তমা
যে তুমি পড়তে পার না
আর আমি—হা নিরাশা!—লিখতে পারি না।।

অনুবাদ : শামসুর রাহমান

আমি একটি সিংহকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ☐ রুই ডে মাটোস

আমি একটি সিংহের সন্ধানে যাচ্ছি
আকারে যার খুব একটা বড় হওয়ার দরকার নেই
যে সংগ্রামে হবে ক্ষিপ্র–ভয়ঙ্কর
যাকে ভয় করা যায়
যায় ভালোবাসাও।

নম্র চাহনিমাখা
উদার হাসিমাখা
এক সিংহের ছবি আমি আঁকতে চাই
এক প্রফুল্লচিত্ত সিংহ
যার মৌনীভাব নেই।

এক সিংহ
যে তার ভালোবাসায় প্রবল
আমি তাকে ডাকবো
হোজি ইয়া হেন্‌ডা

আমি একটি সিংহ খুঁজে বেড়াচ্ছি
হৃদয়বান একটি সিংহ
যে তার রুটি ভাগ করে খায়
এবং জীবন উৎসর্গ করে।

আমি একটি সিংহ খুঁজে বেড়াচ্ছি
শত্রুর সঙ্গে যে দৃঢ় আর অনমনীয়
ভদ্র এবং মানবিক
বন্ধুবৎসল এবং সহজ–সরল।
আমি তাকে ডাকবো :
হোজি ইয়া হেন্‌ডা

আমি এক সিংহের সন্ধানে যাচ্ছি
বিজয়ের আস্থায় যে
পরাজয়ে হাসে।

আমি একটি সিংহ খুঁজে বেড়াচ্ছি
যে হবে দৃঢ়
প্রিযতব
ভয়ঙ্কব একটি সিংহ
আমি তাকে ডাকবো :
হোজি ইয়া হেন্‌ডা

তাকে খুঁজে বেব করতেই হবে আমাকে
ধরাপৃষ্ঠে
সাগরে
নদী থেকে নদীতে
সমতল ভূমিতে
তাকে আমার পেতেই হবে এঙ্গোলায়
আমি তার ছবি আঁকবো
তাকে ডাকবো আমি :
হোজি ইয়া হেন্‌ডা

অনুবাদ : আখতার হুসেন

জঙ্গী দেশপ্রেমিকের জন্য কবিতা ।। জোগে রেবেলো

মা আমাব
চেযে দেখ আমাব লোহাব বাইফেল
তোমাব ছেলেব এই হাতিযাব,
যা তুমি শৃঙ্খলিত দেখেছিলে একদিন
(কেঁদে উঠেছিলে তুমি
শৃঙ্খলগুলি যেন
তোমাবই হাত পা বেঁধে দুমড়ে মুচড়ে দিযেছিল)
মা, তোমাব ছেলে মুক্ত স্বাধীন এখন।
ভুলো না তোমাব ছেলে পেযেছে লোহাব বাইফেল।
এই বাইফেল
ভাঙবে শৃঙ্খল
খুলবে বন্দিশালা
হত্যা কববে স্বৈবাচাবীদেব
জয় কবে আনবে আবার নিজ মাতৃভূমি।
মা আমাব,
স্বাধীনতাব যুদ্ধই হল যথার্থ সৌন্দর্য,
আমার গুলিব শব্দে প্রতিবাব
ন্যায়বিচাবেব ধ্বনি ওঠে
আব পাখি হয়ে জেগে ওঠে প্রাচীন স্বপ্নেবা।
রণাঙ্গনে, যুদ্ধ করতে করতে
তোমার মুখের ছবি নেমে আসে।
লড়ছি তোমাবই জন্য,
মা তোমার
দু'চোখের জল মুছে দিতে।
বৃথাই চিরিকো পাখি গেযে যায় হায়,

কুয়াশা জড়ানো অরণ্যের ভোরের শিকার
নিখোঁজ আমার বোন, তার ছোট ছেলেটির কথা ভেবে ভেবে
বাগানে বেতসঝোপে বসে বৃথাই চিরিকো পাখি গায়।
হায় আমি জানি : অন্তিম মুহূর্তে তার
শান্ত চোখে ছিল শেষ বিদায়ের আভা,
তার কণ্ঠ ভেসে আসছিল আর্ত–গোঙানির ভাঙা স্বরে
করুণ, নৈরাশে ....।

হে আফ্রিকা, হে আমাব প্রিয় মাতৃভূমি,
আমাকে জবাব দাও :
কি হয়েছে আমার বোনেব, বলো, তুমি
অবণ্যদুহিতা বোন
চিরপরিচিত তার কয়লাপসারী ডাক ডেকে ডেকে
চিবচেনা তার ছোট শিশুদেব নিযে
(একটা পিঠে, গর্ভে ছিল অপব সন্তান),
সে কেন আসে না আর শহবের দিকে?
হে আফ্রিকা, হে আমার প্রিয় মাতৃভূমি
অন্তত কখনো তুমি বীবাঙ্গনা বোনকে আমার
ত্যাগ কববে না আমি জানি,
তোমার বাহুর ওই গর্বিত স্মৃতিব স্তম্ভে
জানি সে থাকবে বেঁচে জানি চিবদিন !

অনুবাদ : তপনজ্যোতি বড়ুয়া

আমাকে জানতে যদি চাও □ নোয়েমি ডি সুজা

আমি কে জানতে যদি চাও,
পরখ করতে হবে সতর্ক দৃষ্টিতে
সেই কালো কাঠের টুকরো
যেটা দূর উত্তরাঞ্চলের অচেনা মাকোন্‌ডে ভাই
প্রাণিত উদ্দীপ্ত হাতে
নক্সায় উৎকীর্ণ করেছিল।

আহা সেই নারীঅবয়ব সে আফ্রিকাই তো আমি :
প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসার হতাশায় শূন্য যত চোখের গহ্বর
যন্ত্রণায় ক্ষতদীর্ণ মুখ,
যুগপৎ মিনতি ও ভয়-দেখানোর ধাঁচে উত্তোলিত
থেঁৎলে-যাওয়া সুবিশাল সব হাত,
দাসত্বের শক্ত চাবুকের
দৃশ্য ও অদৃশ্য দাগে উল্কিআঁকা দেহ........
অত্যাচারিত, মহান
গর্বোদ্ধত, অপার্থিব
আপাদমস্তক আফ্রিকার প্রতিমূর্তি,
—আমিই সে, আহ্, সেই আফ্রিকাই আমি।

আমাকে বুঝতে যদি চাও
এসো, আফ্রিকান আমার আত্মার 'পরে নত হও,
নত হও নিগ্রো ডকশ্রমিকগণের আর্তনাদে,
চৌপ-আদিবাসীদের মত্ত নাচে
শানগানাদের বিদ্রোহীস্বভাবে
রাত্রি অভিমুখী কোনো দেশজ গানের মর্ম থেকে

হাওযাব মতন ভাসমান অদ্ভূত বিষণ্নতায.

সত্যি যদি আমাকে জানতে চাও
জিজ্ঞাসা কোবো না কিছু আর......
কেন না ঘাংসময শংখেব খোলস ছাড়া আব কিছু নই
গর্ভে যার আশায় বিপুলাকাব আফ্রিকাব দ্রোহ
সংহত কবেছে আর্তস্বর।

অনুবাদ : তপনজ্যোতি বড়ুযা

আমার মহাগুরুনিপাতের দশা   কেওরাপেৎসে ক্গোসিৎসিলে

চোখের দোবগোড়ায়
স্বদেশের নিথর কণ্ঠস্বর।
আমার বাবারও যিনি পিতৃপুরুষ
আগুন দিয়ে কী কবতে হয় তিনি জানতেন।
আমার বাবার আগের পিতৃপুরুষ
দিনাবসানের পর
একগাদা ঠাকুরদেবতা নিয়ে
গোল টুলের ওপর বসতেন। এমনকি
দুই সূর্যেব রক্তবর্ণেব মধ্যিখানেও কখনও কখনও।
বিলক্ষণ জানতেন সময় মাত্র আগের দিন ভূমিষ্ঠ হয নি।
চক্করের শেষ নেই
মুহূর্তগুলো প্রাণ কী না জানলেও
সময় চিরকাল বেঁচে থাকবে।
জীবনের মধ্যেই কত জীবন বদলে যায়
কখনও কখনও তাতে পচও ধরে
কিংবা পায়ের নিচে থেৎলে যায
ক্রীতদাসের পিঠের মতো।
বৃত্তের মধ্যে অনেক চক্র
এই আঁটকুড়ো মুহূর্তটাতে
আমার মরে–যাওয়া ভাবের জন্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে
কিংবা তোমার মৃত্যুতে খেদ ক'রে
এমনকি জানতেও চাইতে পারি :
বাঁচব ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু কোথায় সেই জীবন ?
সময় বরাবরই থাকবে
অতীত-বর্তমান–ভবিষ্যৎ সব সময়ই হল এখন
তবে কোথায় গেল সেই জীবন যার জন্যে আমরা বাঁচতে এলাম?

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রতিধ্বনি ▢ মাৎসিসি কুনেনে

মিনতি কবব আমি জননী সূর্যকে
তার সুদীর্ঘ তির্যক রশ্মিজালে
বিপুল ঐ গিবিশ্রেণীর উপর দিয়ে খুঁজে আনে তোমাকে এখানে।

উপত্যকার ধীর নিশ্বাসের তালে স্তবমালার সুবে
শূন্য মাঠের ওপর ঝল্‌কে উঠবে তখন
ছায়াপথের দ্যুতি।

আমাকে তুমি দেখতে পাবে তখন
সময়হারা মৃত্তিকার গভীর স্তরের ছায়ায়,
ঋতুচক্রের তাঁত বুনে চলেছি সেখানে আমি।

যোগ দিও তুমি তোমার আত্মজন্মের কোমর দোলানো নাচে
তাল দেবে সেখানে বাঁশির সুরসঙ্গতি,
কুমুদ–কহ্লারেব আপন সত্তাও হবে উল্লসিত।

মুক্ত করে দাও পাহাড়ের তোরণ,
যেন রুয়েনজোরির পেশল সীমারেখা
ছায়া ফেলে তোমার মানসচিত্রে।

মহাদেশগুলির অর্ধোচ্চারিত ভাষায়
জেগে উঠবে বিস্মৃত অতীতের প্রতিচ্ছবি—
সুদূর লিবিয়ার সলজ্জ নারকেলশ্রেণীও বাদ যাবে না তাতে।

জাম্বেসী নদীর ঊর্মিশিহরিত জলধারা
বহন করবে তোমার নামের রুপোলি গাত্রবাস,
নিয়ে যাবে তাতে ধ্বনি–প্রতিধ্বনি সমুদ্রে।

আমি যেন ভালো না বাসি শুধু তোমাকেই,
তুমি তো করতে কতো শহীদের গুনগান,
শুধু তোমার স্মৃতিই যেন আমার জিহ্বাকে
করে না–দেয় মন্থর।

অনুবাদ : মনীন্দ্র রায়

এলিজি : মাথ্‌সিসি কুনেনে

হায জিঙ্গেলি, গর্বিত গোত্রেব সুসন্তান,
তোমাব সৌন্দর্য–কীর্তিত তুকেলা নদী মোহনা জুড়ে
হানা দেয় মনে তোমার স্মৃতি জোড়া–ঈগলের মতো
আমরা এসেছি অতীত বাজের ধ্বংসপুরীতে
আমরা এসেছি রক্তাক্ত সূর্যেব শোকগাথা গাইতে
দুংগুনিয়ার লামিনি গোত্রসভ্য আমরা
ধরিত্রী সন্তপ্ত যাদেব অপার বেদনায
বিকেলের বোদে বয়ে চলেছি আরশিখণ্ড
অন্তহীন রাত্রি পারি দিয়ে বদলে নিচ্ছি সময়ের খেলা।

হে মহান প্রযাত পূর্বসূবীর দল,
তোমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে অনন্ত জীবন অনিঃশেষ আনন্দ
কিন্তু কীভাবে প্রতারিত কবলে আমাদের!

আমরা ডেকে এনেছি কুদর্শন অষ্টনাগ
যেন পাহারা দেয় আমাদের সহস্র বৎসব সহস্র যুগ
বাসুকীর দৃষ্টি ছিল আকাশের প্রান্ত–ছোঁয়া
কখনো বা মৃতজনেব পদপাতে সন্ত্রস্ত
একদিন উন্মত্ত ঝড়ে
একদিন কৃষ্ণ তুফানে
একদিন পড়ন্ত বিকেলে
আমরা দেখছিলাম শূন্য মরুর বিস্তার
শুনেছিলাম দিগন্ত–কাঁপানো মন্দ্র স্বর
এবং আবারো ভালোবেসেছি আমাদের লোককথা
ভালোবেসেছি আমাদের অজাচারী প্রেম!

আমরা গুণেছি এক মিলিয়ন
বিধ্বস্ত নগরীর ধুলোয় ধূসরিত

বৃষের পদপাত যেন–বা পিপঁড়েব ঢিবিতে
আমাদের বিলম্বিত জন্ম
সিংহের মৃত্যু–পূর্ব আর্তনাদ
জমে আছে আমাদেব ক্রুদ্ধ স্ববে
তাবকালোক থেকে নেমে আসা তোমাব ভালোবাসায়
করুণাসিঞ্চিত করো আমাদেব
পবিয়ে দাও বজ্র–খচিত মুকুট
চরাচর ছেয়ে ফেলো আমাদের বেদনাব হাহাকাবে

হায়, অপার জলধারায় আমরা দাঁড়িয়ে উলঙ্গ
পথিকজনেবা জানায় না আর কোনো সম্ভাষণ ....

অনুবাদ : মফিদুল হক

সমাধান : অজানা কবি

জেলে যেতে যেতে আজানিয়া ক্লান্ত,
শত্রুদেব বুলেট বুকে নিতে নিতে আজানিয়া ক্লান্ত,
সভা করতে করতে আজানিয়া ক্লান্ত,
শহুরে শাদা মানুষেরা, তোমাদের জন্য কাজ কবতে কবতে আজানিয়া ক্লান্ত,
খুঁড়ে খুঁড়ে তোমাদের জন্য সোনা তুলতে তুলতে আজানিয়া ক্লান্ত,
আজানিয়া আজ সোনা তুলতে চায় তার নিজেরই শিশুদের জন্য,
আজানিয়া ক্লান্ত, আজানিয়া ক্লান্ত,
কান্নায় কান্নায় আজানিয়া ক্লান্ত।

আফ্রিকার ছেলেরা মেয়েরা, এখানেই আমার কবিতা শেষ, আব আমি তোমাদের সবাসরি বলতে চাই যে বিবাট এই গির্জেয় দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত। এখন থেকে, এর চেয়ে ভালো একটা সমাধানেব কথা আমি ভাবছি : এখানে এসে দাঁড়াবাব চেয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার চেয়ে আজ বরং আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে একটা কিছু করা দরকার আমার।
জনতা : (তুমুল হর্ষধ্বনি)

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

আমার জুলু ঝুপড়ির ভিতরে : অস্‌ওয়াল্ড ম্‌শালি

নিতান্ত মৌচাক
মধুব সোনালি ইঁটে
দেওয়াল গাঁথাব জন্যে
একটাও মৌমাছি নেই
যাঁতাকলেব পাথবে
দমবন্ধ গুহা
তুম্বায়[১] ঘোল
মাটির পাত্রে ওথলানো বীযাব
বিছানো শীতলপাটি
শায়িত কাঠেব মাথা
আড়া বাঁধার জন্যে
ছাগলের বোদে-পোড়া ছাল
খুঁটিতে জড়ানো
আমাব যবেব মণ্ড পাকাতে
মাটির মেঝেব ওপব বাখা
তিন-পায়া পাত্র
জ্বলন্ত
ঘুঁটের ধোঁয়ায় ধোঁযায় ছযলাপ
কালিঝুলি মাখা।

অনুবাদ : রাম বসু

---

১. *লাউয়ের শুক্‌নো খোল। আদিবাসীরা এর মধ্যে পানীয় জল নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়।*

জেলখানা সম্পর্কে কবিতাবলী □ ডেনিস ব্রুটাস

শীত
স্যাঁতসেঁতে সিমেন্ট
শুষে নিচ্ছে আমাদের নগ্ন পাগুলোকে

শ্লেষ্মামাখা হলুদ বাল্ব একটি
আলোকিত করছে ঠাণ্ডা, ধূসর দেয়ালকে

রাত তিনটের শিশিরে ভেজা
খোঁচা-খোঁচা ঘাস
চক্‌চকে কিনারগুলো নিয়ে কালো

কংক্রিটের ওপর বসে আমরা
আঙ্গুলে তুলে-তুলে
চিনিহীন জাউ
পুরছি মুখে

তারপর দাঁড়াচ্ছি খাড়া হয়ে

লাইনে দাঁড়াচ্ছি

নিজেদেরকে ইস্পাত বানাচ্ছি ধৈর্যে,
কিংবা গ্রহণ করছি সমর্পিত স্বীকৃতিতে অসাড়
নিজেদের এক ভাবমূর্তি

বুড়ো–ধূসর কারারক্ষী বললো :
"এসব ব্যাপারের জন্যে
আমার কোনো সময় নেই ;

এরা ইদুঁবের চেয়েও জঘন্য;
এদেরকে শুধু গুলি কবাই চলে।"

মাথার ওপবে
তাবাদের বিশাল তুষারাচ্ছন্ন ঝিকিমিকি,
দক্ষিণী ক্রুশ সামান্য ফুটছে।

গোড়ালি আর
কব্জিতে বাঁধা যে শেকল
আমাদেরকে বাঁধছে জোড়ায়-জোড়ায়,
ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠছে
চক্‌চক্‌

জবুথবু চলতে
শুরু কবি আমরা

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নৈশসঙ্গীত : নগরী ▢ ডেনিস্ ব্রুটাস

গভীর ঘুমোও, আমার প্রেম, গভীর ঘুমোও ;
অশান্ত ডকের ওপর ঝক্‌মক্ করছে বন্দরের আলো,
সুরঙ্গ–সড়ক পথে পুলিশের গাড়ি আবশোলা–এগোচ্ছে।

বস্তিভূমির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দের লোহার পাত থেকে
ছারপোকা–ভর্তি কম্বলের মত সহিংসতা ছিট্‌কে যায়,
আর, বাত্যাতাড়িত ঘন্টার মধ্যে শব্দের মতন ভয় সর্বব্যাপ্ত;

দিনের দীর্ঘ ক্রোধ বালু আর পাথর থেকে হাঁপায়;
তবে অন্তত এই শ্বাসঝরানো রাতটুকুতে
আমার দেশ, আমার প্রেম, গভীর ঘুমোও।

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

যত সব 'শিশু'* □ ইন্‌গ্রিড ডি কক্‌

নিয়ে গেল ছিল যত সব শিশু,
অন্ধকার বন্ধ ঘরে
ছুরিব ডগায় ছিল কাটা কুটিব টুকরোব স্বপ্নাভাস
শিশুব শুকনো জিভে সেটা তুলে ধরে

ছিল যত সব শিশু
শুয়ে আছে রাস্তার পীচেব ওপর;
পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরোয়,
যেন বস্তা ফেটে বরবটি,
শীতের সমুদ্র থেকে উঠে–আসা শ্যাওলা।

বাষ্ট্রপক্ষীব আছে
শিশের মত তার বিষ্ঠা ঝরে।
ওর ধাতব ডানা রাস্তা কুরে খায়
রক্তের গোষ্পদকে তাদের আশ্লেষে।
ট্যাংকের দিকে নিক্ষিপ্ত পাথব তো শুধু পাথর ট্যাংকের দিকে
কিন্তু বুলেট শিশুবুক ভেদ করে সোজা চলে যায়
গেরস্থেব অন্তঃপুরে।

কিন্তু সময় মত যখন খণ্ড–খণ্ড পাথর
ভার আর গতিকে সংহত করে শকুনের বুক লক্ষ্য করবে,
বালি চূর্ণ হয়ে হবে পাথর, পাথর হবে টিলা
টিলা হবে পর্বত, পর্বত হবে আকাশ,
তখন ঐ পক্ষীর দম আটকে যাবে,
ডানাতে ফোসকা পড়ে ফেটে যাবে,

সবশেষে পরাজিত চোখ, জ্বলবে ধিকিধিকি।

আর এই ছেঁড়া আলো
এই দীর্ঘ ছিন্ন রশ্মি
মেবামত হবে নিজের হাতে
ঐসব শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে,
তখন সেই সব শিশু দরজা খুলবে
তখন তাদেব ঘরে ফেরার দিন।

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

*মূল কবিতাটি আফ্রিকাআন্‌স্‌ ভাষায বচিত।
বঙ্গানুবাদ কবা হযেছে ইংবেজি অনুবাদ থেকে।

বেকার আমি □ নিসে মালাংগে

আমি এখানে
একখণ্ড কালো মেঘেব তলায় আমার বাস
এইত, এই ক্ষীযমাণ আলোতে বাঁচি
এইখানে
গাছেব গাযে পেবেকবিদ্ধ স্বাধীনতা
মৃত্যুর অপেক্ষায
এই তো এখানে থাকি, দেশলাই–এব বাক্সের ভেতর।

ক্ষুধার জ্বালায় আমি মরি, দেশও মরে, আমার শিশুরাও
দেখো তাদেব দিকে তাকিয়ে :
কী ঘোলাটে চোখ, কোনো মতে চলে, মাথা নাড়ে
পেটে দানা নেই
শুনতে পাচ্ছ? ওরা কাঁদছে।

তেজী সূর্যের দিকে আমি থুথু ছিটিয়ে দিই,
রোজই তার তেজ বাড়ে
বর্ষাব প্রতীক্ষায় থাকি
এই সুন্দব জমিতে লাঙল দেব কী করে
আমি যে বেকার

বেকার আমি, এখানেই থাকি তবু অদৃশ্য আমি,
ধর্মপ্রচারক হাঁকে 'ওগো জল দাও'

ওহে অফিসবাবুর দল
হলদে–বাদামী আরাম কেদারায় আসীন,

বাতিটাকে দয়া করে উস্‌কে দাও না একটু।
ওহে নিপীড়ক, পায়ে পড়ি
গাছে লট্‌কানো ঐ স্বাধীনতাকে মুক্ত কবো।

বাগে দুঃখে ঢাকা আমাব মুখ
পাকস্থলী ঘৃণা আর যন্ত্রণায ভবা
পাগল হয়ে ঘুবে ফিবি
অপুষ্টিব ব্যামো কোযাশিযোকবে
মবে আমাব বাচ্চাগুলি
এখানেও কিছুই গজায় না
আব পশুপাখী সব গেছে মবে হেজে

কনে শুধু আসে রাতে
বাতাসেব আর্তনাদ
আমাবই মবণযন্ত্রণার ঘোষণা।

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

আধুনিক সাহিত্য

দিন দুঃখী, রাত দুঃখী ; বেড়ালের কান্নায় গায়ে কাঁটা দেয়।
একদিন সকালে একজন নারী উঠে দাঁড়ালো, দৃঢ়ভাবে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বললো,
'আজ আমি তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবো'।
আর পুরুষরা বুঝতে পারলো এই যুগ, যা নতুন পুরুষ তৈরি করছে, নতুন নারীরও জন্ম দিয়েছে।

দিনের পর যেমন রাত □ আবিওসে নিকোল

ঘামে ভেজা হাতে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আঁকড়ে ধবে, তপ্ত সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কোজো ও বাণ্ডেলে। দূব থেকে শুনতে পাচ্ছে, প্রাথমিক বিভাগের বাচ্চারা বড় বাড়িব হলঘবে জড়ো হচ্ছে গান প্রাকটিস করার জন্য। আর একটু কাছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট দূরেই, তাদের সহপাঠীরা বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বিজ্ঞান বিভাগের বাড়িতে পৌছে দু'জনে ঢুকলো। বাড়িটার নিচু ছাত, আফ্রিকার সাভান্নার মাঝে ছোট্ট টিলার গাযে স্কুল বাড়ির অন্য অংশগুলো থেকে আলাদা। ল্যাবরেটরি ঘবটা লম্বাটে; তাব এক কোণে, তারা দেখলো, আর একজন ছাত্র, বাসু, তাদের দিকে পেছন ফিরে জানালার বাইবে তাকিয়ে আছে। বদ্‌রাগী ল্যাব–সহকারী মিঃ আবু ধাবেকাছে নেই। সাবি সারি বঙবেরঙের শিশিগুলোব নীরব আহ্বান। চাপা ক্লান্তিকর গরমে একটা বুনসেন বার্নার কাশলো। যেখানে শিখার হালকা নীল ত্রিকোণ শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখান থেকেই উঠে গেছে শিরশিবে প্লাস্টিক স্বচ্ছতা। একরত্তি এই টরনেডোর ভেতর অশান্ত উষ্ণ বাযুর নিরন্তর গতি স্পষ্টই দেখা যায়। দু'জন আফ্রিকান যুবক হাত ধরাধবি করে একমনে তা দেখছে।

শুনেছি নাকি শিখার ভেতরটা উপরটা থেকে বেশি গবম, কোজোর স্বরে সন্দেহ প্রকাশ পায়। ওরা কি করে এসব জানতে পারে কে জানে।

আমাব তো মনে হচ্ছে— তুই ঠিক উল্টোটাই বলছিস। দেখি না, নিজেবা যাচাই করে, বাণ্ডেলে উত্তর দিল।

কি করে ?

ভেতরেব টেম্পারেচাব নিয়ে।

ঠিক আছে, এই যে থার্মোমিটার, তুই কর।

এখন এটাতে দেখছি ৯০ ডিগ্রি, প্রথমে বাইরের শিখাটার টেম্পারেচার দেখবো, তারপর ভেতরের হলুদ শিখাটার তুই দেখিস।

বাণ্ডেলে আল্‌তো করে থার্মোমিটারটা এগিয়ে ধরল শিখাটাতে; কোজো গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলো, পারার লিকলিকে সুতোটা মারমুখী হযে ছুটে গেল তীরবেগে, যন্ত্রের লম্বা ডাঁটির মধ্যে। তারপর শোনা গেল ছোট একটা কাঁচ ফাটার শব্দ। থার্মোমিটারের ডাঁটি ভেঙে গেছে। বেঞ্চের ওপর পারার গোল–গোল ফোঁটাগুলো যেন খেলাচ্ছলে ঘোর অনিষ্ট

করার ভঙ্গিতে থরথর কাঁপছে। তাবপর সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে শিউরে উঠে হাজারটা জ্বলজ্বলে টুকবোতে ভাগ হয়ে গেল, আবার মিলেমিশে কাঁপতে লাগলো যেন নিঃশব্দ হাসিতে দুলে উঠছে।

হে ভগবান, কোজো ভাঙা গলায় ফিস্ফিস করে বললো।

চুপ কর, বাগুলেব নিচু স্ববের আদেশ যেন সাম্রাজ্য-অধিপতির।

বেঞ্চে পড়ে থাকা দু'চাব ফোঁটা পারা হাতেব মুঠোয় ভরে নিয়ে গোল পিণ্ডটা সিঙ্কে ফেলে দিলো বাগুলে। মাটিতে যে ফোঁটাগুলো পড়ে ছিল, পা দিয়ে সেগুলো একটা কাচের আলমাবির তলায় ঠেলে দিলো, তারপর থার্মোমিটারের ভাঙা দু'খণ্ড তুলে নিঃশব্দে কোজোব পাশে এসে দাঁড়ালো—কোজো ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে পাথরের মতো স্তব্ধ।

বাজে কাজ দেখো না, বাজে কথা শুনো না, বাজে কথা বলো না,—কোজোর কানে-কানে বললো।

ঘটনাটা ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তারপর ক্লাসের অন্য ছাত্রবা প্লাবনের মতো ঢুকলো, কথা বলতে-বলতে, একে অপবকে ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে। বাসু এতোক্ষণ ঘরেব অপর প্রান্তে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার ঘুরে পা টেনে টেনে ক্লাসে যোগ দিলো, চোখ কোঁচকানো, যেমন সর্বদাই থাকে।

ডেমনস্ট্রেশন-প্ল্যাটফর্মের তিন পাশে তারা মোটামুটি গোল হয়ে দাঁড়ালো। পরনে স্কুলের পোশাক, সাদা সার্ট, খাকি প্যান্ট, সরকারি খাতায় বয়স ষোল'ব বেশি নয়, কিন্তু আসলে তা কোজোর পনের আর দু'একজনের একুশের মধ্যেই।

ল্যাব-সহকারী মিস্টার আবু পাশের গুদোমঘর থেকে এসে চট্‌পট্ ব্ল্যাকবোর্ড সাফ কবে দিলেন। তিনি আফ্রিকান মেডিকেল কোরের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট—ছেলেরা তাঁকে ভয় পায়। কোনো ছেলের ছিঁচকে চুরি ধরে ফেললে, তিনি হয় পেছনে কষে এক চড় মারেন, অথবা বিজ্ঞানের মাস্টাবদের কাছে নালিশ করেন। কোন্‌টা করবেন তা দোষীকেই বেছে নিতে হয়। অধিকাংশ ছাত্রই প্রথমটা বাছে, কারণ তারা জানে, ঐ চড়েই ব্যাপারটার ইতি, তারপর আর কোনো তদন্ত, নৈতিক বক্তৃতা বা কণ্ডাক্ট খাতায় নাম ওঠার বালাই থাকে না।

বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই ঢুকে উঁচু প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা, ক্ষীণ, রাশভারী কৃষ্ণাঙ্গ, চুলে পাক ধরেছে, চোখে রূপালী ফ্রেমের চশমা চ্যাপটা নাকে ঠিকমতো বসে না, সবসময়ই পিছলে পড়ে যায়, সহৃদয় জ্যাঠামশাইদের মতো চেহারা। ছাত্রদত্ত নাম তাঁর 'ভেরনিয়াব' কারণ, সবসময তিনি জোর দেন অতি সূক্ষ্ম মাপজোকের ওপর, ভেরনিয়ার স্কেলের মতো সূক্ষ্ম, অর্থাৎ এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগ অবধি একেবারে সঠিক। ভেরনিয়ার সেদিনকার এক্সপেরিমেন্ট ঠিক ভাবে একবার করে দেখিয়ে দিলেন। তারপর চার্চ টাইম্‌সের পেছনে লুকিয়ে পড়লেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে-পড়তে সারিবদ্ধ বেঞ্চগুলোর মাঝে মাঝে পায়চারী কবতে লাগলেন, একে তাকে একটু-আধটু উপদেশ দিতে-দিতে। এক্সপেরিমেন্টটা খুব সহজ—গাঢ় রঙের তল থেকে তাপ বিকিরণের মাত্রা হালকা রঙের তলের বিকিরণ-ক্ষমতা থেকে বেশি, এটা দেখাতে হবে।

ক্লাস চলাকালীন ভেরনিয়ারের টেলিফোনে ডাক পড়লো। আবুও সিগারেট ফুঁকতে

বাথরুমে উধাও। দরজায় খাড়া করা পাহারাদার যেই ইশারায় জানালো যে, আবু ধারেকাছে নেই, অমনি ছোটখাট কুরুক্ষেত্র বেঁধে গেল। কেউ কেউ গুদোমে ঢুকে মাল হাপিশ করতে লাগলো। একটু বিত্তবান যারা, তারা রবারের নল পকেটস্থ কবলো—গুলৃতি বানাবে বা সাইকেলে লাগাবে, হাতিয়ে নিলো ক্যামেরায় তোলা ছবি ডেভেলপ করার জন্য রাসায়নিক তরল। যারা গরীব, তাদের ওসব বিলাসিতা নেই; বাজারে যা বিক্রি কবা যায়, এমন জিনিসই তারা নিল। পকেট থেকে বোতল বের করে, তাতে ঢেলে নিল সাবান তৈরির সোডা, 'খোলার' ওষুধ তৈবির জন্য ম্যাগনেসিয়ম সালফেট, রান্নাব জন্য নুন, মেয়েদের কেশসজ্জাব জন্য তবল প্যারাফিন, মিহি হলুদ আয়ডোফর্ম পাউডাব, ঘায়ে ছড়ানোর জন্য যার চাহিদা প্রচুর। কোজো মৃদু আপত্তি করাতে কেউ-কেউ বললো, চুপ কব তো। সর্বদা ফেজ মাথায় দেয়া সোরী, শোনা যায় তার নাকি একটা সন্তানও আছে, ক্লাসের মধ্যে পাণ্ডাগোছের, সকলে তাকে সমীহ করে। ওব প্রিয় জিন এণ্ড ফিজ,—ঝাঁঝালো বাইকার্বোনেটেব সঙ্গে জল মেলানো এ্যালকোহল—খাচ্ছিলো বিকাবে ঠোঁট লাগিয়ে। 'দ্যাখ কোজো, বেশি বাড়াবাড়ি করিস না। আমাদেব মা-বাবা স্কুলের মাইনে দেয় যাতে আমরা আনন্দ কবতে পারি, না-কি সিম্পসন প্রত্যেক বছর নতুন গাড়ি কিনতে পাববে বলে?' অন্য ছেলেরা হাসলো, সিম্পসন স্কুলের ইউবোপীয় হেডমাস্টার, ছোটদেব কাছে যমের মতো, মাঝবয়সীদের কাছে দেবতুল্য, আর কিছু বড় ছেলে এবং আফ্রিকান শিক্ষকদের সমালোচনামূলক পছন্দের পাত্র। তাব শখ নতুন গাড়ি, প্রত্যেক বছর তিনি একটা করে গাড়ি কেনেন।

হ্যাঁ, ভালো কথা, সোরী বললো কোজোকে— তুইও কিছু একটা নে তো দেখি, তাহলে বুঝবো তুই নালিশ করবি না। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুইও নে।' অন্য ছেলেরা চাপাচাপি কবতে লাগলো। কোজো হার মেনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িতে বারুদ তৈবি করার এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটু নাইট্রেট নিল।

কেউ আসছে! পাহাবাদার ডাক দিল।

মুহূর্তের মধ্যে সবাই ছড়িয়ে গেল। সোরী সিঙ্কে জল দিয়ে কুলকুচো করলো। মিঃ আবু ঢুকে দেখলেন এক ক্লাস ছেলে, কেউ ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে বাতাস শুঁকলেন। এক্সপেবিমেন্ট তো পদার্থবিদ্যাব, অথচ ঘরে কেমন যেন রাসায়নিক গন্ধ? যাহোক, সেই সময় ফিরে এলেন ভেরনিয়ার, কারো কোনো অসুবিধে হয়েছে কি না জিগ্যেস করাতে কেউই তৎক্ষণাৎ কোন অসুবিধের কথা ভেবে বের করতে যখন পারলো না, তখন তিনি খ্রীস্টীয় পুনর্মিলনের ওপর একটা প্রবন্ধ নিয়ে চেয়ারে বসলেন। চশমা ঠিক করতে-করতে ভাঙা দাঁতের গোঁড়া সশব্দে চুষতে লাগলেন।

পিরিয়ডের শেষের দিকে সকলে ভেরনিয়ারের চারপাশে জড়ো হয়ে ফলাফল জমা দিল। তারপর তাই নিয়ে আলোচনা হলো কিছুক্ষণ, রাজনীতি-সচেতন একজন ছাত্র জিগ্যেস করলো, গাঢ় রঙের তল-থেকে তাপ বিকিরণের মাত্রা বেশি বলেই কি পশ্চিম আফ্রিকার সকলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ? একজন মুখ টিপে হাসলো। বাসু তার সহজাত ভঙ্গিতে মেঝের দিকে চেয়ে খোঁড়া পা'টা মাটিতে ঠুকলো। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে এরকম

প্রশ্ন শুনতে ভেরনিয়ার অভ্যস্ত। কখনোই তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দেন না। কারণ, তাঁর অবসর নেয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। পেনশনের কথা ভেবে তিনি বছর-বছর আরো একটু বেশি সতর্ক হচ্ছেন। মাঝে মাঝে ভয়ও হয় যে, সিম্পসন সাহেবের গুপ্তচররা ছাত্রদের মধ্যেই কোথাও বর্তমান।

'তা হতেই পারে, যদিও বিপরীতটা বেশি সুবিধেজনক।'

বিজ্ঞানে সবসময় কোনো-না-কোনো ফাঁক থেকে যায়—ছেলেরা অনেকেই একথা ভাবছিলো এবং ভেবনিয়ারকে তা বললোও।

'আঃ সেটাই তো গবেষণা।' তিনি রহস্যজনক ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন।

সোরী প্রশ্ন করলো, গতবার তাদের দেখানো হয়েছিল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু একত্র করে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ জ্বালালে জল তৈরি হয়। তাহলে চরম গ্রীষ্মের সময় যখন চূড়ান্ত জলের কষ্ট হয় শহরে, তখন এই পদ্ধতিতে জল তৈরি করা হয় না কেন ?

বড্ড খরচসাপেক্ষ— ভেরনিয়ার সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। সোবীকে তাঁর অপছন্দ, তবে তার ভিন্ন ধর্মের জন্য নয়, অন্য ছেলেদের ওপর তার প্রভাবটা খারাপ, আর সে হাস্যকব প্রশ্ন করে, তাই।

সোরী কিন্তু দমলো না। বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে। বিদ্যুৎ দিয়ে যদি তা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভাগ করা হয় অক্টোবর মাসে এবং এই গ্যাসগুলো ঘনীভূত অবস্থায় জমিয়ে রাখা যেতে পারে। তাহলে মার্চ মাসে, জলকষ্টের সময় আবার তা দিয়ে জল তৈরি করা যেতে পাবে, সোরীর ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে মৃদু হাততালি দিল।

এটা অবাস্তবায়নযোগ্য চিন্তা, ভেরনিয়ার বিরক্তভাবে বললেন।

ক্লাস শেষ হয়ে গেল, সকলে তপ্ত ঘাসের ওপর দিয়ে ফিরে যেতে লাগলো। কোজো আর বাণ্ডেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। সোরীর দলবলে যোগ দিল তারা— সোরীর অনুগতদের সংখ্যা সবসময়ই সব থেকে বেশি।

'বিজ্ঞানটা একটা ধাপ্পাই বটে,' সোরী বলছিলো— 'আমার তো মনে হয় না ভেরনিয়ার নিজে এসব বিশ্বাস করে। তা-ই যদি করতো, তাহলে সর্বক্ষণ ধর্মের বই পড়তো না।'

'ফিরে এসো, তোমরা সকলে ফিরে এসো।' মিঃ আবুর চিৎকাব তাদের ধাওয়া করেছে।

ওরা অনিশ্চিতভাবে থমকে দাঁড়ালো। অন্ধ আতঙ্কে কোজো হেঁটেই চলেছে। 'থাম' বাণ্ডেলে হিস্‌হিস্ করে বললো, 'বোকা কোথাকার'। কোজো পেছন ফিরে অন্য ছেলেদের সঙ্গে ফিরতে লাগলো, পেছন পেছন এলো বাণ্ডেলে। আবু ও ভেরনিয়ার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে ছেলেরা।

'মিঃ আবু এক্ষুণি ময়লা ফেলার টিনে এটা খুঁজে পেয়েছেন।' ভেরনিয়ার ঘোষণা করলেন, রাগে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, হাতে থার্মোমিটারের টুকরো দুটো। 'এই ক্লাসেরই কেউ নিশ্চয় ভেঙেছে, কারণ, বের করার আগে এগুলো গোনা হয়েছিল।'

জানালা দিয়ে একটু হাওয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকলে, ভারি স্তব্ধতা উড়িয়ে দিল এদিক-ওদিক।

'কে?'

কোনো উত্তর নেই, ভেরনিয়ার চারপাশ দেখলেন, অপেক্ষা করলেন।

'কেউ যখন স্বীকার করছে না, আমি দুঃখিত। শাস্তি হিসেবে তোমাদের সকলকে আমার স্কুলের পর এক ঘন্টা আটকে রেখে দিতে হবে।'

রাগ ও বিষাদ-মাখা গুঞ্জন। সেদিন বিকেলেই গুরুত্বপূর্ণ ইন্টার-হাউস সকার ম্যাচ আছে। কেউ কেউ হাত তুলে বললো, তারা সকার টিমে খেলছে।

ওসব আমি জানি না, ভেরনিয়ার চেঁচিয়ে বললেন; এমনিতেই তাঁর ধারণা খেলাধুলায় বড্ড সময় দেয়া হয়, পড়াশোনায় ততোটা নয়।

আবুর তত্ত্বাবধানে ছেলেদের রেখে তিনি বড় বাড়ি থেকে নিজেব জিনিসপত্র আনতে গেলেন।

ভেরনিয়াব চলে যেতেই আবু বললেন, 'আমরা বাইবেল ও চাবি খেলবো।' কোজোর এটাই ভয ছিলো, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগলো। ছেলেরা সকলেই এব নিয়ম জানে। গণনা করে দোষীকে খুঁজে বেব কবার পদ্ধতি। একটা বিশাল চাবি বাইবেলের পাতার মাঝে রাখা হয; নিউ টেস্টামেন্টের সেই অংশে, যেখানে আনানিয়াস ও সাফিবা যিশুর তেরোজন ভক্তের সামনে দৈবশক্তি দ্বারা নিহত হয। কারণ, তারা মিথ্যে বলেছিলো। তারপর বাইবেলটা দুটো দড়িতে বেঁধে ঝোলানো হয, দড়িব অন্যদিকে বাঁধা থাকে চাবি। এবার এই যন্ত্রটা কেউ তুলে ধরে, উপস্থিত প্রত্যেকের নাম ডাকা হয় একে একে। যে দোষী, তার নাম ডাকা হলে বাইবেলটার বোঁ-বোঁ ক'বে ঘুরে পড়ে যাওয়ার কথা।

আবু একটা বাইবেল চাইলেন, একজন এক খণ্ড বেব করে দিলো। প্রথম পাতা খুলে মাথা নেড়ে ফেবত দিলেন, 'এটা চলবে না, এটা তো সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, শুধু খাঁটি ঈশ্বরের বাণীতেই কাজ হবে।"

একখণ্ড কিং জেম্‌সের অনুমোদিত সংস্করণ পাওয়া যেতে তিনি তুষ্ট হলেন। যন্ত্রটা তৈরি হযে গেল। তারপর অর্ধচন্দ্রাকাবে দাঁড়ানো ছেলেদেব দিকে তাকালেন, এক প্রান্তে সোরী, বাগুলে, বাসু থেকে অপব প্রান্তে দবজার কাছেব কোজো অবধি।

'তোমায় তো দেখে বেশ সুবোধ বালক মনে হয়।' কোজোকে বললেন, 'এসো, ধরো তো দেখি', ঈষৎ কম্পিত কোজো দু'হাত দিযে দড়িটা আলতো করে ধবলো।

আবু জানলাব কাছে গিয়ে সাবধান ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন, তার ধাবালো মুখাবয়ব বাইরের লাল জবা ফুল, সবুজ গাছ ও গরমে-গলা আকাশেব ওপর যেন বেখাঙ্কিত। ছেলেবা উদ্বিগ্ন হযে চেয়ে থাকলো। কালো শরীরওযালা একটা টিকটিকি দেয়াল বেয়ে উঠে গিযে নিবপেক্ষ ভঙ্গিতে গোলাপী মাথা নাড়তে লাগলো।

আবুব বৃদ্ধ রক্তবর্ণ চোখ ঝুলন্ত বাইবেলে আটকে গেল। ধীরে, খ্যাস্‌খ্যাসে গলায় বললেন,

ও বাইবেল, চাবিতে বাঁধা বাইবেল,
উত্তর দাও এই ধাঁধার,
আস্তে আস্তে ঘুরে যাও সত্য,
দোষী কে, বলে দাও।

ছেলেদের দিকে ফিরে কড়াস্বরে প্রত্যেকের নাম ডাকতে লাগলেন, যেন প্যারেডের প্রস্তুতি চলছে—শুরু হলো সোরীকে দিয়ে, তারপর একে একে সকলের নাম ডেকে বাইবেলটা লক্ষ্য করলেন।

অবশ হয়ে কোজো কাঁপতে লাগলো, মনে হতে লাগলো— কেউ যেন কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে ওব শরীবে ; যেন তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, কোনো এক দৈত্যাকার শক্তি তাব পেছনে দাঁড়িয়ে তার ক্লান্ত কনুইগুলো তুলে ধরে রেখে দিয়েছে। মনে হলো চাবি আর বাইবেলেব যেন নিজস্ব জীবন হয়েছে। চমৎকৃতভাবে সে দেখলো—মাঝে-মাঝে আটকে আটকে গোটা ব্যবস্থাটা ঘুরছে বৃত্তাকারে, যেন তার নিজস্ব কোনো হৃদস্পন্দন হয়েছে।

'আয়ো সোগাবেনরি, সোন্নির কার্গবো, ওজি এন্‌ডেবু'—আবু এবাব অর্দ্ধচন্দ্রের শেষ ভাগে পৌছে গেছেন, 'টমি লোঙ্গে, আজায়ী কোলে, বানডেলে ফাগ্‌ব ...'

কোজো বাইবেলটা হাত থেকে ফেলে দিল। 'আমি আর পারছি না', চিৎকার করলো, 'আমাব ক্লান্ত লাগছে।'

'হ্যাঁ, তা হতেই পারে', আবু সায় দিলেন। 'কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে এসছে, বাকি শুধু বাণ্ডেলে আব বাসু।

'বইটা তুলে ধরো, কোজো' বাণ্ডেলের চাবুকের মতো স্ববে হিম হিংস্রতাব ছোঁয়া, কোজো সম্বিত ফিবে পেল যেন, বইটা মাটি থেকে তুললো।

'দয়া করে আমাব নাম দিযে শুরু কববেন, মি. আবু ?' বাণ্ডেলে জিগ্যেস করলো, জানালার দিকে ফিরে।

'কোজো, চট্‌পট্‌ নিজেব জাযগায ফিবে যাও' আবু বললেন। 'ভেবনিয়ার আসছেন, উনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন, খুব ধর্মপরাযণ মানুষ তো, বাইবেল-চাবির ব্যাপারটা উনি বিশ্বাস করেন না।'

যেন ধড়ে প্রাণ এলো—এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে কোজো স্বস্থানে ফিরে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ভেরনিযার ঘরে ঢুকলেন।

দূরে স্কুলেব অন্য ছেলেরা শেষ প্রার্থনার জন্য একত্র হচ্ছে। এদের ক্লাসেব ছাত্ররা ব্ল্যাকবোর্ড আব ডেমনস্ট্রেশন বেঞ্চেব আশপাশে দাঁড়িয়ে বা বসে রযেছে, মুখে হয বিরক্তির ছাপ, নয সমর্পণের, নতুবা নির্দোষের ক্ষুব্ধ ভঙ্গি। কোজোর হৃৎপিন্ডের ধুক্‌পুক্‌ যে অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না, এতে ও যথেষ্ট আশ্চর্য হচ্ছে।

'একবাব প্রত্যেক মানুষ ও দেশেব সম্মুখে আসে সিদ্ধান্তের মুহূর্ত ...'

দিনশেষের প্রার্থনা ভেসে আসছে ওদের দিকে, বিকেলের স্তব্ধতাকে চূর্ণ কবে।

কোজো উঠে দাঁড়ালো। ওর মনে হতে লাগলো, এবার সত্যি কথাটা বলে দেওয়া দরকাব, নাহলে পববর্তী জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে; ওব আগেই তড়িৎগতিতে বাণ্ডেলে উঠে দাঁড়ালো—আসলে অনেক কিছুই যেন একসঙ্গে ঘটে গেল। অন্য ছেলেরা নড়েচড়ে বসলো, ভেরনিয়ার যে বইয়ের সমালোচনা পড়ছিলেন, তার থেকে চোখ তুলে চাইলেন। একটা কালো-সোনালি ডানাওয়ালা প্রজাপতি উড়ে এসে ব্ল্যাকবোর্ডের এক কোণে বসে

ডানা ঝাপটাতে লাগলো, সেও যেন অপেক্ষা করছে।

'অন্য কেউ এসে পৌছানোর আগেই বাসু এখানে এসে গিয়েছিলো।' বান্ডেলে দৃঢ়স্বরে বললো, সকলে বাসুর দিকে তাকালো। সে তার গলা পরিষ্কার করলো।

'আমি এক্ষুণি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম, স্যার', বাসু ভেরনিয়াবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিব উত্তরে বললো।

'দুঃখের বিষয়, এটা একটু আগে তোমার মাথায আসে নি', ভেবনিয়ার শুষ্ক স্বরে বললেন, 'কি করছিলে এখানে?'

'আগের ক্লাসটা করতে পারি নি, তাই সোজা ল্যাবে এসে অপেক্ষা করছিলাম। ওই জানালাটাব কাছে দাঁড়িয়ে নীল আকাশ দেখছিলাম, আমি থার্মোমিটার ভাঙি নি, স্যাব।'

দু'একজনেব চাপা হাসির শব্দ। কেউ কেউ চোখ ফিরিয়ে নিল। অন্যেরা গুনগুন করে কি যেন বললো। বাসুব নিশ্বাসে সবসময় পেঁয়াজেব গন্ধ, কিন্তু যদিও সে কোনো খেলাই পারে না, কেউ কেউ তাকে পছন্দ করতো, করুণাবশত সাহায্যও কবতো।

'বেশ, তুমি না ভাঙলে অন্য কেউ তো ভেঙেছে। আমবা আটক অবস্থা চালিযে যাবো।'

পাশে দাঁড়ানো আবুর দিকে চোখ পড়তে ভেবনিযাব বললেন, 'মিঃ আবু, আপনার থাকার দরকাব নেই। আমিই বন্ধছন্ধ করে দেবো। চলুন, এখনই পেছনেব গেট খুলে দিই, আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

আবুকে সঙ্গে কবে তিনি বাইরে গেলেন। তাবা চলে যাওযার পব সোবী বাসুব দিকে তাকিযে সহজভাবে জিগ্যেস করলো, 'ঠিক বলছিস, তুই ভাঙিস নি?'

'না।'

'ও-ই ভেঙেছে', কেউ একজন চিৎকার করলো।

'বাইবেল আব চাবিতে কি হলো?' বাসু জিগ্যেস করলো, 'শেষ হয নি তো, ওকে দেখ।' বাণ্ডেলের দিকে আঙ্গুল উঁচিযে দেখালো।

'আমি তো ও ব্যাপাবটা থামাতে বলি নি।' বাণ্ডেলে বললো, 'বাকি ছিলি তো শুধু তুই।'

কে যেন বাসুকে তাক করে একটা বই ছুঁড়ে দিযে বললো, 'স্বীকার কব।'

বাসুর পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে।

'ভগবান সাক্ষী, আমার গায়ে হাত দিলে, আমি পুলিশ ডাকব', সে রুষ্ট স্ববে বললো।

'ভাবছে, পুলিশ ওর কেনা', কেউ একজন বললো।

'ওটাই তো প্রমাণ করে।' অন্য একজন বলে উঠলো পেছন থেকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয ও-ই ভেঙেছে', বাকিবা বলতে লাগলো, আর বাসুকে তাক করে বই ছোঁড়া আরম্ভ করলো। সোবী হাত তুলে ওদের থামাতে চেষ্টা করলেও কোনো ফল হলো না। বই, ছিপি, দেশলাই বাক্সেব বর্ষা নামলো বাসুর মাথায়। মাথা নামিয়ে, নামানো হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো সে।

'আমি কবি নি, দিব্যি দিয়ে বলছি, আমি করি নি। থাম্ থাম্, তোরা' বাববাব গোঙাচ্ছে সে। কপালে একটা ছোট ক্ষত দেখা দিলো, রক্ত পড়ছে। কিছুক্ষণ কোজো চুপচাপ বসে

ছিল, তারপর ওর আপাদমস্তক একটা অদ্ভুত গুঞ্জন খেলে গেল, হাত কাঁপতে লাগলো, বগল ভিজে গেল। ঘুরে, একটা বই বেপরোয়া শক্তিশালী হাতে ছুঁড়ে মারলো বাসুর দিকে। তারপব আর একটা। মনে হলো, নিজের মধ্যে অপরাধবোধের বিশাল স্ফীতিটাকে অন্য কাউকে আঘাত করেই শুধু সারানো সম্ভব। ভিন্ন যেকোনো কিছু বা যে কারো বিরুদ্ধে এক অন্ধ ক্রোধ, ক্ষোভ চেপে ধরলো তাকে। মনে হতে থাকলো—যদি সকলে, সবকিছু এক রকম সমান হতো তাহলে কোনো অসুবিধে, কোনো সমস্যা থাকতো না। সকলে সুখী হতে পারতো, কোজো ভেসে গেল এক দুর্বার স্রোতের টানে—ঘূর্ণিতে, আঘাতে। মনে হলো যেন বাসুই দোষী, নিশ্চয় ও-ই ভেঙেছে। যদি সে ওকে চূড়ান্ত আঘাত করতে পারে, তাহলে কোজো নিজেকে আর অন্য সকলকে বোঝাতে পারবে যে ও নিজে থার্মোমিটাবটা ভাঙে নি, ও কখনও কোনও ভুল করে নি। যথেষ্ট ভারি কিছু একটা ছোঁড়াব জন্য হাতড়ে-হাতড়ে বাইকেলটা তুলে নিল।

'থামো !' ভেরনিয়ার খোলা দবজার মুখ থেকে চেঁচালেন। 'থামো, শয়তান জানোযার সব!'

চুপ কবে লজ্জায় মাথা নুইয়ে যাব যা হাতে ছিলো নামিযে রাখলো সকলে। বাসু কাঁদছিলো নিঃশব্দে, নিবাশ হযে, ওব বোগা দেহটা কাঁপছিলো।

'বাড়ি যাও সকলে, বাড়ি যাও— তোমাদের ওপব ঘেন্না হচ্ছে আমার', তাঁর কালো মুখ রাগে চক্চক্ করছে, 'দেশ ও জাতিব কলঙ্ক তোমরা।'

ওরা অস্বস্তিতে চুপচাপ সট্‌কে পড়লো, একে অপরেব চোখে চোখ বাখতে পারছে না, সবাই যেন কোনো গোপন সংরাগেব শিকার।

ভেবনিয়াব ফার্স্ট-এইড আলমাবি খুলে বাসুব ক্ষতে ওষুধ লাগাতে আবম্ভ করলেন।

কোজো আব বাভেলে ফিবে এসে দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুনছে। বাণ্ডেলে নাছোড়বান্দা, কথাগুলো ওদেব শুনতেই হবে।

ভেবনিয়াব বাসুব পট্টি-বাঁধা মাথাটা নিজের ওয়েস্টকোটের সঙ্গে ঠেকিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন, সস্নেহে ওব কম্পিত কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলেন।

'আমি যদি সত্যিই ভাঙতাম, তাহলে এতোটা খারাপ লাগতো না স্যাব', ও বিড়বিড় করে বললো। 'কিন্তু আমি ভাঙি নি স্যাব, ভগবানের দিব্যি, আমি ভাঙি নি।'

'চুপ, চুপ', ভেরনিয়াব সান্ত্বনা দিলেন।

'এবার ওরা আমায আরো ঘেন্না করবে', ও কাঁদো-কাঁদো হযে বলল।

'চুপ, চুপ।'

'ক্ষতগুলো আমার কাছে কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে।'

'চুপ, চুপ।'

'ওরা ফুটবল ম্যাচটায় যেতে পারলো না। এবার থেকে ওরা কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না, ও ... ই ... ও ... ই ... কেন আমার এই শাস্তি হলো ?'

'তুমি যখন আরও বড় হবে', ভেরনিয়ার উপদেশ দিলেন, 'তখন নিশ্চয় শিখবে যে

মানুষ যা করে সেজন্যেই সে সবসময় শাস্তি পায় না, মাঝে মাঝেই বরং অন্যরা নিজেরা যা করবে কিংবা নিজেদেরকে যা মনে করে, সেজন্যে। এটা মনে রেখো, তাহলে তাদের ক্ষমা করতে অসুবিধে হবে না। নিজের কাছে নিজে সত্য থেকো—' ভেরনিয়ার বাসুকে হাসানোর জন্য হাতের মুঠো নকল নাটকীয়তায় উঁচিয়ে, সে বছর পরীক্ষায় শেক্সপীয়রের যে নাটক থেকে প্রশ্ন দেওয়া হবে সেই নাটকের বেদবাক্য-অভিনয় করলেন, তার দর্শক শুধু টুপটাপ জল-পড়ে-যাওয়া-কল, ফাঁকা বেঞ্চ আর স্তব্ধ বিকেল।

বাসু চোখ মুছে, হেসে ছুঁড়ে দিল : 'তাহলেই ঘটে যাবে পরপর যা ঘটাব, দিনের পর যেমন রাত। হ্যামলেট—এ্যাক্ট ওয়ান, সীন থ্রী, পোলোনিয়াস টু লেয়ার্টেস।'

'বাঃ, এই তো, ফার্স্ট ক্লাস, গ্রেড এ, চলো, তোমায় বাড়ি পৌছে দিই।'

কোজো আর বান্ডেলে লাল মোরাম-বেছানো পথ ধরে হেঁটে গেল, কোজো নিস্পৃহ ভাবে পায়ে পায়ে নুড়ি ঠেলে ফেলছে নালীর ভেতর।

'একটা ফালতু থার্মোমিটার নিয়ে কী হুলস্থূল কান্ড...' বান্ডেলে শুরু করলো।

'জানি না ভাই, জানি না।' অধৈর্য হলো কোজো। ফাঁকা ল্যাবের দৃশ্যটি দু'জনের মনকেই নাড়া দিয়েছে। দুজনের মাঝে অবিশ্বাসের পাতলা একটা অদৃশ্য দেওয়াল উঠে যাচ্ছে।

'বাসু অবশ্যই ওটা ভাঙে নি', বাণ্ডেলের স্বীকারোক্তি।

কোজো থমকে দাঁড়ালো, 'ভাঙে নিই তো, আমরা ভেঙেছি', সে চিৎকার করলো।

'চেঁচাস নে বাবা। যা হোক, ধারণাটা তো তোরই ছিলো।'

'মোটেই না', কোজো ভীষণ রেগে গেল, 'তুই-ই তো বললি, দেখি কি হয়।'

'তর্কটা তো তুই জুড়েছিলি। ছেলেমানুষি করিস না।' চুপচাপ হেঁটে গেল তারা খালি পায়ে ধুলোর ছোট ছোট মেঘ উড়িয়ে।

'খুব একটা ভাবার দরকার নেই।' বাণ্ডেলে বলে চলেছে, 'ওই বাসুটার বাবা চাল আর তেলের কালোবাজারি করে। সব গুদোমে ভরে রাখে, যখন বাজারে মালের ঘাটতি দেখা দেয়, তখন চড়া দামে ছাড়ে। পুলিশ ওর ওপর নজর রাখছে।'

'তাতে কি ?'

'আহা, বুঝতে পারছিস না, বাসু থার্মোমিটারটা ভাঙতেই পারতো। বাজি রেখে বলতে পারি, ও নিশ্চয় আগে এরকম অনেক কাজই করেছে, যার জন্য শাস্তি পেয়েছি আমরা', বান্ডেলে নিশ্চিত।

ওরা স্থির হেঁটে গেল বড় রাস্তা দিয়ে, টুকিটাকি আর কাপড়ের বান্ডিল বোঝাই সিরিয়ান আর লেবানিজ দোকানের পাশ দিয়ে, জানালার ওধারে সাজানো ফ্যাকাসে লাল কার্পেট আর কাঁসার ট্রেওয়ালা ইণ্ডিয়ান দোকানের পাশ দিয়ে, সন্তর্পণে সরু রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে এবং দুপুরের ভাতঘুমের জন্য পাহাড়ী শহরগামী ব্রিটিশ আমলাদের গাড়িগুলোকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

কোজো অবশেষে বাড়ি পৌছুলো। পা ধুয়ে দিনের প্রধান ভোজনটা সারলো, ভারি অশান্তভাবে এদিক-ওদিক বসে রইলো কিছুক্ষণ। রাত নামলো হঠাৎ, রোজকার মতো,

ছ'টা নাগাদ। তাড়াতাড়ি হোমওয়ার্ক শেষ করে শুতে গেল কোজো।

বিছানায় শুয়ে পরের দিন যা করবে স্থির করেছে, তাব একটা মহড়া দিয়ে নিল। ভেরনিযারেব কাছে যাবে সে। বলবে, 'স্যার, আপনার সঙ্গে আলাদা,করে একটু কথা বলতে চাই।'

'পরে হলে চলবে?' ভেরনিয়ার জিগ্যেস করবেন।

'না, স্যার', দৃঢ়স্বরে উত্তর দেবে সে, 'আসলে কথাটা খুব জরুরী।'

একটা ফাঁকা ক্লাসঘবে নিয়ে গিয়ে ভেরনিযার তাকে শুধোবেন— 'বল, তুমি কেন এত চিন্তিত, কোজো আনান্সে ?'

'আমি দোষ স্বীকাব করতে চাই, স্যার। কাল থার্মোমিটারটা আমি ভেঙেছিলাম।' ও ঠিক কবেছে বাঙেলের নাম করবে না; সে নিষ্পাপ জীবনযাপন করতে চায় কি না, তা তার নিজেরই ঠিক করা উচিত।

নাকেব ডগায় নেমে আসা চশমা ঠিক করে ভেবনিয়ার একটু ভাববেন, তাবপর বলবেন —'এটা তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কোজো। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পাবছো যে গতকালই তোমাব স্বীকাব কবা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি খুবই দুঃখিত।'

'তুমি খুব ভুল করেছো, কিন্তু যাহোক, একেবারে না করার থেকে দেবি করে করাও ভালো। সব ছেলেদের সামনে তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে। বিশেষ কবে বাসুব কাছে, তার চরিত্র তোমাদের সকলের থেকে অনেক বেশি দৃঢ়, সে তা প্রমাণ করেছে।'

'তাই কববো, স্যার।'

'এখন আমাব কাছে ক্ষমা চাইতে এসছো কেন? তুমি কি ভেবেছিলে, আমি সহজেই তোমায় ক্ষমা করে দেব ?'

'আশা করছিলাম, তাই করবেন, স্যার। আশা করছিলাম যে আমায দু'এক ঘা মেরে আপনি যে আমায় ক্ষমা কবেছেন, তা প্রমাণ করবেন।'

ভেরনিয়াব চশমাটা নাকের ডগা থেকে আবার ঠেলে উঠাবেন, জিভটা চিন্তিতভাবে মুখের মধ্যে ঘোরাবেন, 'হুঁ!, ঠিকই বলেছো। কি মনে হয়, তোমার কি ছ' ঘা প্রাপ্য, নাকি ন' ঘা ?'

'ন'ঘা স্যাব।'

'নিচু হও।'

কোজো স্থির কবেছে সে কাঁদবে না, কারণ, সে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।

সপাং ! সপাং ! সপাং !

বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে যা যা ঘটবে, তা ভাবতে–ভাবতে দাঁতে দাঁত চেপে কাল্পনিক ব্যথা সহ্য করার জন্য চামড়া শক্ত করলো কোজো।

সপাং ! সপাং ! সপাং !

হঠাৎ ছোট ঘরে পাতলা সুতির চাদরের তলায় সে কাঁদতে লাগলো। কারণ তীক্ষ্ণ ব্যথার ফলা এখনই তার চামড়া চিড়ে ফেলছে। কারণ, বাসু, সিম্পসন ও থার্মোমিটার। কারণ,

সে অনেক কিছু করতে চায় ও হতে চায়—কিন্তু কিছুই পারবে না। কারণ, সেই সব মনীষী যাদের কথা ওদের বলা হয়, যীশু খ্রীস্ট, মোহাম্মদ, জর্জ ওয়াশিংটন—যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি। কারণ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ডেভিড লিভিংস্টোন। কারণ, জাপানি কাগাওয়া, গান্ধী ও আফ্রিকান কোয়েগির আগ্রে ও ... ই ... ই ... ও ... ইই। কারণ, ও জানে স্কুলের গানে যেরকম বলা আছে, ও কোনোদিনই সেরকম বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও সত্যবাদী হতে পারবে না। প্রথমবারের মতো সে দেখলো মানুষ হওয়াটা, এই ব্যাপারটা কেমন দেখাবে। চিরন্তন, অসহ্য এক কষ্টের সীমা সে ছুঁয়ে গেল, যেখানে কোনো সান্ত্বনা সম্ভব নয়। ও ... ই ই ... ও ইই; সর্বদা, ও ভাবলো, সর্বদাই আমি দেশের ও জাতির কলঙ্ক হয়ে থাকবো।

মা ওর ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন তাঁর চটি-পরা পা ধীরগতিতে টেনে-টেনে, সবসময় যেমন যান। ভিজে বালিশেব মধ্যে মুখ গুঁজে নিজেব কোঁকানোটা চাপা দিতে চাইলো কোজো; কিন্তু উনি শুনতে পেলেন। ঘবে ঢুকে আলো জ্বালালেন,

'কি হযেছে রে তোর?'

সে মুখটা বালিশেব আবো গভীরে ডুবিযে দিল।

'কিছু না', অস্পষ্ট, নিশ্বাস-বন্ধ-হয়ে-আসা গলায় বললো।

এগিযে এসে ঠান্ডা ভিজে আঙ্গুলগুলো তিনি তার গলায় ছোঁযালেন,

'তোর তো জ্বর হয়েছে', উত্তেজিত স্ববে বললেন। 'দাঁড়া, রান্নাঘরে থেকে কিছু নিয়ে আসি।'

তিনি চলে গেলে কোজো চোখ মুছে বালিশের শুকনো দিকটা উপরে নিযে এলো। মা ফিরে এলেন এক হাতে থার্মোমিটার, আরেক হাতে কিছু কুইনিন মিকশ্চার নিয়ে।

'নিয়ে যাও, সরিয়ে নাও', কোজো চেঁচালো, শক্তভাবে চোখ বুজে, মায়ের ডান হাতের দিকে ইশারা করতে-করতে।

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা;' তিনি ডান হাতের থার্মোমিটাবটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।

অদ্ভুত ছেলে, তিনি ভাবলেন, কোজোকে কিঞ্চিত ভয় মেশানো গর্বিত দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে। দেখলেন, সে পরিষ্কার তেতো তরল ওষুধটা খেয়ে নিল।

তারপর ওর কাছে দাঁড়িয়ে মাথাটা কোলে টেনে নিলেন। ও নিচু বিছানাটাতে উঠে বসেছিলো। তিনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বুঝতে পারলেন, কোজো কাঁদছিলো, কিন্তু কেন—তা জিগ্যেস কবলেন না। তাঁর বিশ্বাস যে সে কখনোই তাঁকে খুলে বলবে না। তিনি জানতেন যে, ও এখনও শিখছে, প্রথমে ধীরে এবং ক্রমশ, আরও দ্রুত, এবং অচিরেই তিনি আর মা থাকবেন না; হয়ে যাবেন তার পরিবারের একজন মেয়েমানুষ, কত অল্প সময়, তিনি ভাবলেন, কতটুকু সময়ই বা তারা একেবারে নিজের মতো থাকে, সব কথা বলে ফেলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে তার ঘুমন্ত মাথাটা বালিশের ওপর রাখলেন।

পরদিন কোজো তাড়াতাড়ি স্কুলে গিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করলো। বাণ্ডেলেকে জানিয়ে দিল যে সে স্বীকার করবে দোষ তার, কিন্তু বাণ্ডেলের নাম করবে না। আশা করছিলো, বাণ্ডেলেও তার সঙ্গে যাবে, কিন্তু সে শাসিয়ে দিল, কোজো নিজে বয়স্কাউটসুলভ আচরণ

কবতে চাইলে স্বচ্ছন্দে করতে পারে, ঘুণাক্ষরেও যেন বান্ডেলের নাম না উচ্চারণ করে। এই টিট্‌কিরি কোজোর তেজ বাড়িয়ে দিল, সে সোজা ল্যাবে গিয়ে হাজির হলো। মিঃ আবুব সঙ্গে দেখা হতে ভেরনিয়ারের কথা জিগ্যেস করলো। আবু বললেন, 'ভেরনিয়ার ব্যস্ত, যাই হোক, ব্যাপারটা কি ?'

'কাল থার্মোমিটারটা আমি ভেঙেছিলাম', কোজো সোজাসুজি বললো।

হাতের কাঁচের জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলেন আবু।

'সত্যি, আর পারি না। এসব কবে তোমার লাভটা কি ?

'আমি ভেঙেছি', কোজো আবার বললো।

অসহিষ্ণু স্ববে আবু বললেন, 'বাসু ভেঙেছে। সোরী ওকে দিযে স্বীকার করিয়েছে, বাসু নিজে এসে সকালে আমাকে আর বিজ্ঞানের মাস্টারমশাইকে বলে গেছে যে, এখন সে জেনেছে যে গতকাল দুপুরে যখন ও এসেছিলো, ভুল কবে থার্মোমিটাবটায ধাক্কা লেগে গিযে সেটা পড়ে গেছে। ও ঘুরে তাকায় নি, কিন্তু নাকি কাচ ভাঙার শব্দ স্পষ্টই শুনেছে। কেউ নিশ্চয় তুলে ওটা ময়লা ফেলার টিনে ফেলে দিয়েছে। ব্যস্, সমস্যাব সমাধান হয়ে গেছে, ঝামেলা চুকে গেছে।'

দেয়ালে একটা ব্যারোমিটার ঠুকে চোখ ছোট করে চাপের মাত্রাটা দেখলেন আবু। তারপর কোজোকে লক্ষ্য করে বললেন,

'আমার তো মনে হয়, ওর গতকালই ব্যাপারটা চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো। তাহলে তোমবা ম্যাচটা দেখতে পেতে, কিন্তু কী আর করবে বলো', কাঁধ ঝাঁকিয়ে, যুক্তি দেখানোর ভঙ্গিতে যোগ করলেন, 'একটা সিরিযান ছেলের কাছ থেকে আব কীই বা আশা করা যায়।'

অনুবাদ : ইঙ্গিতা চন্দ

একটি প্রাপ্তি-সংবাদ □ আমা আটা আইডু

ধরো, তোমবা আক্রা যাচ্ছো। কাকা'রা, তখন কেউ যদি বলে, শহরেব বিশাল চক্রটাব সামনে তোমাদের গাড়ি থেকে নেমে যাওয়াটাই ঠিক হবে, তো আমি বলবো সে তোমাদেব উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু ... হুম্ ... ওটাকে কিভাবে বর্ণনা কবলে তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

'এই যে চক্রটার এপাশ ওপাশ দিয়ে পিল্‌পিল্ কবে সব লোক বেবিয়ে যাচ্ছে, ওরা কি মানুষ? এই যে এত অসংখ্য মোটরগাড়ি, এগুলো কি সব টাকা দিয়ে কেনা ... ?' ওটাব সামনে দাঁড়িয়ে আমার এবকমই অনুভূতি হযেছিলো।

সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। আমি অযথা তোমাদেব সময় নষ্ট করতে চাই না।

আমি চারদিকেই খুঁজলাম, কিন্তু আমার ব্যাগটা পেলাম না। ওটা হারিয়ে গেল। নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগলো। চোখ দুটোকে পথেব দিকে নামিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। কেন ? আমায় জিগ্যেস কবো না। যতবাবই আমি চোখ তুলে তাকাতে চেষ্টা করছিলাম, ধাবমান ঐ অসংখ্য গাড়িগুলো আমার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত কবছিলো। আমি হতবুদ্ধি হযে পড়ছিলাম। আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিলো। যাই হোক, এগুলো বাড়তি অভিজ্ঞতা, আমি বরঞ্চ মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ঐ চক্রটাব সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ আমি ওখানটায় দাঁড়িয়ে বইলাম। এমন সময় একটা লবি ওই পথটা ধরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। আমি তার চালককে থামতে ইশারা করলাম। গাড়িটা ঠিক দাঁড়ালো বলবো না। তবে তার গতি অনেকটা কমিযে বেরিয়ে যেতে-যেতে চালকটা আমায় জিগ্যেস করলো —

'কোনদিকে যাবে ?'

'মাম্‌প্রবি'— আমি বললাম।

'উঠে পড়, উঠে পড়'—বলেই চালকটা গাড়িব এক্সিলারেটরে চাপ দিলো।

হ্যাঁ, আমাকে ঐ চলতি গাড়ির গাযে ঝুলেই উঠতে হলো, প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম আর একটু হলে।

যখন চক্রটাকে চক্কর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, ওটাকে বিশাল এক গাছের গুঁড়িব ওপর বসানো বৃহদাকার একটা বাটির মতো দেখাচ্ছিলো। পরে দুয়ায় আমাকে বলেছিলো,

ওর ভেতর থেকে নাকি ফোয়ারার মতো জল লাফিয়ে ওঠে ওপর দিকে। আমি ওটাকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখন ঐ ড্রাইভারের নানান্ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ওটার দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হচ্ছিলো বারবার। সে আসলে অন্য পথে যাচ্ছিলো। তবে আমায় আশ্বাস দিলো স্টেশনের কাছে সে আমায় নামিয়ে দেবে, ওখানে মাম্‌প্রবি যাবার লরি পেয়ে যাবো।

লোকটি আমায় মিথ্যে বলে নি, কাকা, স্টেশনে পৌঁছেই আমি দেখলাম 'মাম্‌প্রবি, মাম্‌প্রবি' করে চেঁচিয়ে যাত্রী ডাক্‌ছে এক লরিচালক। আমি ওটায় চেপে বস্‌লাম।

দ্যুয়ায'র বাড়ি পৌঁছুলাম দুপুর প্রায় আড়াইটের দিকে। কড়া নাড়বার একটু পরেই দুযারটা খুলে গেলো। সে ঘুমোচ্ছিলো।

'শনিবারের দুপুরবেলা এরা ঘুমোবার সময় পায় কি করে?' নিজের মনেই ভাবছিলাম। আমাকে দেখে দ্যুয়ায উল্লাস প্রকাশ করলো, আমিও ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কাকা, দ্যুযায ভালোই আছে দেখলাম। তার মা সত্যই ভাগ্যবতী।

আচ্ছা, ওটা কি করে হয়? কারো স্কুল জীবন ভালো হয়, আবার অন্য কারো তা হয় না? এই যে স্কুলটা আমি দেখতে পাচ্ছি, মান্‌সা তো দ্যুয়ায়'র সাথে ঐ স্কুলটাতেই পড়তে যেত। আমরা তাহলে এমন কি করেছিলাম, যে মান্‌সা আর স্কুলে যেতেই চাইলো না?

নাহ্, আমি আমার গল্পটা থেকে সরে আসছি... । কি বলছিলাম? হ্যাঁ, দ্যুয়ায় বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। তার ঘরের আসবাবপত্রগুলো ভালোই। ঘরটা খানিকটা ছোট এই যা। আমি সেটা জানতে চেয়েছিলাম। এ শহরে এটুকু জায়গা পেয়েই তাকে বেশ সুখী মনে হলো। কেবল রাতে ঘুমোবার জায়গাটুকুও নাকি পাওয়া মুশকিল এখানে।

আমার শহরে আসার উদ্দেশ্যটুকু জানতে চাইছিলো দ্যুযায়। আমি তাকে সব খুলে বললাম। ক্লাস থ্রি-র পর থেকে মান্‌সার স্কুলে যেতে না চাওয়া, আর তার পেছনে আমার মা'র লেগে থাকা, সব বললাম তাকে।

আমায় বাধা দিও না, মা। এখানে উপস্থিত সবাই ব্যাপারগুলো জানে।

হ্যাঁ, আমি দ্যুয়ায়কে বললাম, মান্‌সা যখন কিছুতেই স্কুলে যেতে চাইলো না তখন কিভাবে আমরা তাকে এক ভদ্রমহিলার কাছে নিয়ে গেলাম, যিনি তাকে গৃহস্থালি ও সেলাই-ফোঁড়াই শেখাবেন বলেছিলেন। মান্‌সা তার পরের ক্রীস্টমাসে বাড়ি এসেছিলো। গত বারো বছরে সেই তার শেষ বাড়ি ফেরা।

দ্যুয়ায় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। হ্যাঁ, আমি আমার বোনকেই খুঁজতে এসেছি। শুনে সে হাসলো।

'সত্যই, তুমি অদ্ভুত। তুমি কি মনে করছো এই শহরে ঠিকানাবিহীন একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাবে? সে ইতোমধ্যে বিয়ে করে নিয়েছে কি না, তাও তুমি জানো না। এমনওতো হতে পারে সে ধনী কোনো বর জুটিয়ে নিয়ে শহরের বাইরে, মাইল দশেক দূরে, ঐসব বিশাল বাংলোগুলোর কোনো একটায় থাকছে এখন। তেমন হলে, তাকে কি করে খুঁজে আনবো?'

মা, তুমি কি কাঁদছো? ঐ বিয়ের ব্যাপারটা কি তোমায় অবাক করছে? না মা, অবাক

হযো না। দ্যুয়ায় যেভাবে বলেছিলো, তাতে আমিও হতভম্ব হয়ে গেছিলাম, আমারও কান্না পেয়ে গিয়েছিলো, মা। কিন্তু তুমি যেমন, আমিও তেমন ভুলে গিয়েছিলাম— মান্‌সা মেয়ে, এবং মেয়েরা খুব দ্রুতই বেড়ে ওঠে। মান্‌সাকে আমরা যখন শেষবার দেখি, তখন তার বয়স দশ বছর। আমাদের স্মৃতিতে মান্‌সা আর বাড়ে নি। কিন্তু মা, সে-ও বারো বছর আগেকার কথা...।

দ্যুয়ায় আমায় বুঝিয়ে দিলো—মান্‌সা সত্যি তখন বিয়ে করার বয়সে পৌঁছে গেছে। শুধু বিয়েই নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু তার প্রাপ্য হয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। তার কি কোনো ছেলেপুলে আছে? 'ছেলেপুলে ?'— বিস্ময় প্রকাশ কবে দ্যুযায়। তাবপর তার সে কি হাসি, ভাবাই যায় না যেন।

দ্যুযায় যতক্ষণ কথা বলছিলো, ততক্ষণ আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে আমায় বোঝাতে চাইলো যে সে আমায় নিরুৎসাহিত করছে না। কিন্তু একটা হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে এভাবে খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। তাতে কিছু এসে যায় না, আমি তাকে বললাম। আমার যা কিছু প্রচেষ্টা, সে হলো মান্‌সাকে, কিংবা সে যদি মারা গিয়ে থাকে তো তাব আত্মাকে, এটুকু বুঝিয়ে দেয়া যে আমরা তাকে পুরোপুরি ভুলে যাই নি। অপরিচিত শহবে সে একাকী পড়ে থাকুক— এটা কখনই আমাদের ইচ্ছে ছিলো না। আমি চাইছি, তাকে যদি অন্তত এটুকু বোঝানো যেত যে আমবা তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

তুমি মিছিমিছি কাঁদছো, মা। আমি কি একবাবও বলেছি, মান্‌সা বেঁচে নেই ?

ঠিক হলো কাল থেকে আমরা মান্‌সাকে খুঁজতে শুরু করবো। এব জন্যে কালকের করণীয় ব্যাপারগুলোর খুঁটিনাটি আলোচনা করে নিলাম। এবপর দ্যুয়ায আমার স্নান ও খাবারের ব্যবস্থা করলো। আমি যখন খাচ্ছিলাম, তখন সে আমার পাশে বসে বাড়ির খবরাখবর নিচ্ছিলো। তাব বাবা যে আর একটা বিয়ে করেছেন— সেটা তাকে বললাম। গেলো বছর পতখপোল 'আকাৎসে' কিভাবে আমাদেব সমস্ত কোকোয়া চাষ নষ্ট করেছে, সেও বললাম তাকে।

দ্যুয়ায় খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিতে বললো আমায়। শুতেই বাজ্যের ঘুম নেমে এলো আমার দু'চোখে। যখন জাগলাম তখন বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। দ্যুয়ায় আলো জ্বেলেছিলো। সেই আলোয় ঘবের ভেতর অপরিচিত এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম। সে বোঝাতে চাইলো ভদ্রমহিলা তার বন্ধু, কিন্তু আমাব মনে হলো মেয়েটি তার বাগ্‌দত্তা, দ্যুয়ায় পরিবাবের অসম্মতি সত্ত্বেও তাকেই বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি ভোরের আলোর মতোই কোমল, সুন্দর। তবে বুঝতে পারলাম সে আমাদের অঞ্চলের নয়।

আমায় জাগতে দেখে দ্যুয়ায় জানালো আট্‌টা বেজে গেছে। তার বান্ধবীটি কিছু খাবার নিয়ে এসেছিলো। আমরা তিনজনে এক সাথে বসে খেলাম।

তোমার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না, কাকা। শহরে এটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা তাদের পুরুষদের খাবার তৈরি করে, আবার তাদের সাথেই বসে খাবার খায়।

আমি অবশ্য ঠিক সুবিধা করতে পারছিলাম না খাবারটা নিয়ে। কাসাবা আর ভুট্টার গাঁজলা মিশিয়ে তৈরি করা খাবারটার কেমন যেন স্বাদ। কোনোভাবে খেয়ে নিলাম বলতে

পারো। রাতে আমরা বাইরে যাচ্ছি, খাবার পর দ্যুয়ায় জানালো। তখনই মনে পড়লো, আমাব ব্যাগটা হাবিয়ে ফেলেছি। দ্যুয়ায়কে ব্যাপারটা বললাম। আর কোনো পোশাক নেই আমার। দ্যুয়ায় সমস্যাটাকে গুরুত্বই দিলো না।

'শহরে এসে শনিবারের সপ্তাহান্তটা উপভোগ না করাটা রীতিমতো অপরাধ', সে আমায় বোঝাতে চাইলো। 'অবশ্য আমবা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পোশাকের বাহুল্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কাজেই তোমারও মাথা না ঘামালে চলবে।'

আমার গলা শুকিয়ে গেছে, কাকা। আমায় কিছু পান করতে দাও ... ।

যখন আমরা পথে নামলাম, আমাব চোখকেই যেন বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না আমি। পুবো এলাকাটা যেন দিনেব আলোয় ঝক্‌মক করছে, বিজলি বাতির এতো বোশনাই। কিছু কিছু বাতি দেখতে সত্যিই সুন্দব। সবাবই সেগুলো দেখা উচিত ... এবকম অনেকগুলোই আছে। 'এতসব ঝলমলে আলোব খবচ দিচ্ছে কে ?'— নিজেকেই শুধালাম। শব্দ করে বিস্ময় প্রকাশ করতে আমাব ভয় হচ্ছিলো, পাছে দ্যুয়ায় আবার ব্যঙ্গ কবে।

অনেকগুলো রাস্তা ঘুবে ঘুরে আমরা একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে ব্যাণ্ড বাজছিলো। দ্যুযায় আমাদের তিনজনেব জন্য টিকিট আনতে গেলো।

জানোই তো, এমন কোনো জায়গায় আগে কখনও যাই নি। সত্যি বলছি, আমি বিস্ময় চেপে রাখতে পারছিলাম না। 'ওহে, এ লোকগুলো কি মানব সন্তান ? কোথায় যাচ্ছে এরা সবাই? কি চায় তারা এখানে ?'

বাইরে থেকে বাড়িটাকে খুব বড় মনে হচ্ছিলো আমার। ভেতবে গিয়ে দেখলাম, অন্দরেব জনঅবণ্য যেন আরো বিশাল। কিছু লোক একটা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মদ কিনছে, কেউ কেউ নাচছে ... ।

এতোক্ষণে ব্যাপাবটা যেন আমি ধরতে পারছিলাম। এমন একটা জায়গায এসে পড়েছি, যেখানে সবাই নাচতে আসে। এমন একটা জায়গা হতে পাবে, আমি জানতামই না।

টেবিলগুলো ছিলো লোহার, চেয়ারগুলোও। লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলো। দ্যুয়ায আমাদের জন্য চেয়ার-টেবিল দিতে বললো যেন কাউকে। মুহূর্তেব মধ্যেই আমাদের বসবার ব্যবস্থা করে দিলো ওরা। আমি কি পান করবো, জানতে চাইলো দ্যুয়ায়। আমি লেবুর শরবত চাইলাম, কিন্তু ওর বান্ধবীটি বললো 'বীয়র'।

অবাক হয়ো না তোমরা।

আমাব পরিষ্কার মনে আছে মেয়েটি বীযর চাইলো, শরবতে চুমুক দিতে-দিতে মেযেটাকে পুরুষদেব মতো বীয়র পান করতে দেখছিলাম অবাক হয়ে।

বাজনাটা কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার শুরু হলে দ্যুয়ায় ও তার বান্ধবী নাচবার জন্যে উঠে গেলো। আমি শরবতটায় চুমুক দিতে থাকলাম। তাদের নাচটা কিরকম আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

কিছুক্ষণ পর বাজনার সাথে-সাথে নাচও থামলো। দ্যুয়ায় ও তার বান্ধবীও টেবিলে ফিরে এলো। আমার কেমন যেন শীত অনুভব হচ্ছিলো। দ্যুয়ায়কে ব্যাপারটা বলতেই সে

বলে উঠলো, 'তাই তো হবে। তুমি তো মেয়েদের পানীয়টাই বেছে নিয়েছ?'

'শরবত খেলে কি শীত লাগে—'

'তুমি কি সেটাও জানো না? তোমার উচিত ছিলো বীয়র নেয়া।'

হয়তো ঠিকই বলছিলো সে। 'ঠিক আছে, তা হলে বীয়রই হোক'—আমি বললাম। যখন বীয়রে চুমুক দিচ্ছিলাম, দ্যুয়ায় বললো—নাচলে শীতভাবটা একেবারেই কেটে যাবে, আরামও লাগবে বেশ।

'তুমি তো জানোই, তোমাদেব এই নাচ আমি পাববো না'— আমি বললাম।

'আমাদের নাচটা কিবকম?'— পাল্টা প্রশ্ন করে সে।

'আমাব মনে হয তোমবা সাদাদেব মতোই নাচো। আমি যেহেতু সেভাবে নাচতে জানি না, লোকে আমাব নাচ দেখে হাসবে।'

দ্যুযায হাহা কবে হাসতে শুরু কবলো। তাব সে হাসি যেন থামতেই চায না। অবস্থা দেখে তার বান্ধবীটি ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো, সাদা লোকদের ভাষায় তাকে কি যেন বললো দ্যুয়ায। এরা দু'জনেই হাসতে শুরু কবলো। 'দেখো, এখানে কে কিভাবে নাচলো, সেটা দেখাব সময় কাবো নেই',— আমায় আশ্বস্ত কবতে চাইলো দ্যুয়ায, 'তাছাড়া, এই শহবে তুমি ভালো কি খাবাপ নাচলে, তা নিযেও কারো মাথাব্যথা নেই, বুঝলে ... ।'

হ্যাঁ, কাকা, আমিও নাচলাম। সত্যি বটে ওখানে কাউকেই আমি চিনতাম না। না, কাকা. মূল কাজটা ফেলে রেখে আমি ফুর্তিতে মেতেছি এমন কথা বলো না। তুমি যদি জানতে, ওখানে কি ঘটেছিলো— তাহলে একথা তুমি বলতে পাবতে না। এ মুহূর্তে ঘটনার শেষটা আমি তোমাদের বলতে চাই না। ঠিক যেরকমটা ঘটেছিলো, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটাই আমি তুলে ধরবো।

যখন আমবা নাচেব ব্যাপারে কথাবার্তা বলছিলাম, কিছু একটা ভেবে দ্যুযায় তার পেছনদিকে তাকালো। সেখানে একটা টেবিলে চারটে মেয়ে বসেছিলো। দ্যুয়ায় এমন একটা আশ্চর্য ভঙ্গি কবলো! আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। সে আমায় বললো— ঐ মেয়েদের মধ্যে যেকোনো একজনকে আমি বেছে নিতে পারি নাচবার জন্যে।

ওব প্রস্তাবটা শুনে আমি হতভম্ব হযে গেলাম, কাকা। যে আমায চেনে না, জানে না, সে কেন আমার সাথে নাচতে রাজি হবে—বিস্মিত হযে দ্যুয়াযকে জিগ্যেস করলাম। এখানে সেটা সম্ভব— আমাকে অবাক করে দিয়ে জানালো সে। এবাব আমি মেযেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ওরা একাই বসেছিলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

কাকারা, আমি নিশ্চয় ব্যাপাবটা বোঝাতে পারছি। তখন কিন্তু আমি পাত্রে রাখা জলের মতো থিরথির করে কাঁপছিলাম।

আমাকে উঠতে দেখে ওদের একজন তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলো। শহরের সাদা লোকদের ভাষায কি যেন একটা বললো সে। ওখানকার অশিক্ষিত যেকোনো লোকও সে ভাষা বোঝে। আমি বুঝতে না পেরে কেবল মাথা নাড়লাম। এবার ওদের চলতি ভাষায় কি যেন একটা বললো সে, এও বুঝলাম না। এবার মেয়েটি ফান্‌তে ভাষায় জানতে চাইলো—আমি ওর সাথে নাচতে রাজি কি না।

আমাব ছোট্ট বোনটি, তুমি বোধহয় আমায় কিছু একটা জিগ্যেস করতে চাইছো? তুমি কি জানতে চাইছো—মান্‌সাকে আমি শেষতক্ খুঁজে পেলাম কি না? আমি ঠিক জানি না ... । কাকারা আমায় বলেছেন, যেমনটি যা ঘটেছিলো বিস্তারিত বর্ণনা করতে, তুমিও তো তাই চাইছিলে। মাঝপথে তড়িঘড়ি কেন গল্পটার ইতি টানতে বলছো?

হ্যাঁ, আমি ওই মেয়েটার সাথে নাচতে গেলাম। তাকে এমন গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা কবছিলাম যে নাচে আমার মন লাগছিলো না। ফলে, প্রায়ই ওর পায়ের ওপর আমার পা পড়ে যাচ্ছিলো। মেয়েটা আমাদের মতোই কালো, কিন্তু তার চুল ছিলো বেশ লম্বা। সাদা মেয়েদেব মতোই চুলগুলোকে সে ঘাড়ের ওপর এলিযে রেখেছিলো। তার চুলে অবশ্য আমি হাত দিই নি, কিন্তু বুঝতে পাবছিলাম বেশ নরম তার চুলগুলো। তার বাঙানো ঠোঁট দুটো মনে হচ্ছিলো যেন সদ্য আঘাত পাওয়া রক্তাক্ত কোনো ক্ষতস্থান। ভীষণ আঁটোসাঁটো পোশাকে তাব শরীবকে আলাদা ভাবা যাচ্ছিলো না। হ্যাঁ, আমি তার সাথে নাচলাম। বাজনা থেমে গেলে, ফিরে এসে টেবিলে বসলাম আমি। মেয়েটা তার সঙ্গিনীদের কি যেন বললো, বুঝতে পাবলাম না। দেখলাম মেয়েগুলো হাসতে শুরু কবলো।

এ মুহূর্তে আমি বুঝতে পাবলাম ওবা শহরের খারাপ মেয়েমানুষ। দ্যুয়ায় আমায় বলেছিলো, নাচলে শরীব গরম হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে যেন আরও বেশি শীত লাগতে থাকলো। মনে হচ্ছিলো কেউ যেন আমার গাযে জল ঢেলে দিয়েছে। মেয়েগুলোর কথা ভেবে নিজেকে খুব অসুখী মনে হচ্ছিলো। 'এদের কি কোনো আশ্রয় নেই?' নিজেকে প্রশ্ন করি। 'এদেব মায়েরা কি এদের ভালোবাসে না?' বেঁচে থাকার জন্যে আমরা সবাই তো লড়াই কবছি। কিন্তু, হা ঈশ্বর, এটা কি কোনো কাজ হলো?

আমাদের হাবিযে যাওয়া ছোট্ট বোনটিব কথা ভেবে কিছুটা অন্তত সুখী মনে হলো নিজেকে। যদিও আমি তাকে খুঁজে পাই নি, সে তো সংসারী হয়ে অন্তত এদের চেয়ে ভালো আছে।

বাজনাটা আবাব বেজে উঠলো। আমার সাথে আরেকবার নাচবার জন্যে ঐ মেয়েটাকে আবাব ডাকতে চাইলাম। ওদের টেবিলেব সামনে গিয়ে দেখি মেয়েটি ইতোমধ্যে অন্য একজনের সাথে নাচতে উঠে গেছে। দু'জন তখনও ঐ টেবিলটায় কারো আহ্বানের অপেক্ষা করছিলো। ওদেরই একজনকে আমি ডেকে নিলাম। নাচতে-নাচতে সে জিগ্যেস করলো আমি ফান্‌তেভাষী কি না। এবপব তার সাথে আর কোন কথাই হলো না। নাচেব শেষে সে তাকে সিগাবেট আর বীযব কিনে দিতে বললো। আমাব সন্দেহ হচ্ছিলো, অত টাকা আমার কাছে নেই। কাউন্টার-এলাকাটা চড়া আলোয় আলোকিত ছিলো। আমার মনে হলো মেয়েটার মুখটা ভাল কবে দেখাই হয় নি। বুকের ভেতর একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। মেয়েটাকে জিগ্যেস কবলাম—

'এটাই কি তোমার কাজ?'

'তুমি কোন্ কাজটার কথা বলছো হে,'—সে আমায় পাল্টা প্রশ্ন করে। আমি হাসলাম।

'তুমি কি বুঝতে পারছো না আমি কোন্ কাজটার কথা বলছি?'

মেয়েটা রাগে যেন ফেটে পড়লো এবার।

'তুমি কে হে আমায় একথা বলবার ? আমি জানতে চাই কে তোমায় এ অধিকার দিলে? জেনে বাখো, যে কোনো কাজই কাজ। গেঁয়ো, গেঁয়ো কোথাকার। কে তুমি ?'

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আশপাশের সমস্ত লোক আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলো, মেয়েটার ঘাড়ে হাত রেখে তাকে শান্ত কবতে চাইলাম। কিন্তু সে আমার হাত দুটো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো।

'মান্‌সা মান্‌সা, তুই কি আমায চিনতে পারছিস না ?'

সে দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসতে শুরু করলো। অদ্ভুতভাবে হাসছিলো সে। তাকে ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছিলো ভীষণ।

'তাহলে তুমি আমার দাদা, হুঁ... ?'

মা, পিসী, আমাব ছোট্ট বোনটি, তোমরা সবাই কি কাঁদছো ! আর সব মেযেবা, তোমবাও!

এতে কান্নাব কি আছে ? আমায পাঠানো হয়েছিলো হাবিয়ে-যাওয়া ছোট্ট একটা মেযেকে খুঁজে বের কবতে, আমি তাকে খুঁজে পেলাম পরিণত রমণীব বেশে।

আমায় একটা পানীয দাও ... ।

যেকোনো কাজই কাজ,— মান্‌সা যখন আমায় একথাটা বলছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো শরীবেব সমস্ত রক্ত তাব মুখটায় এসে জমাট বেঁধে গেছে। যেকোনো কাজই কাজ ... কেন কাঁদছো ? কেঁদো না। এই ক্রীস্টমাসে সে বাড়ি আসবে।

ভাই হে, আমায় আব একটা পানীয় দাও। যেকোনো কাজই কাজ... কাজ...কাজ !

অনুবাদ : উজ্জ্বল ভট্টাচার্য

সুটকেস □ এজেকিয়েল মৃফাষলেলে

টীমি ভাবছিল।

এস্‌পার–ওস্‌পার এবাব একটা কিছু তাকে করতেই হবে। কোনো মওকা এলে সে আর ছেড়ে দেবে না। কত লোক ধনী হয়ে গেছে স্রেফ চান্‌সেব ওপব। এমন একটা মওকা কি তাব নসিবে লেখা নেই?

নতুন বছরেব আগের দিন। বাস্তাব উপর সে বসেছিল। বিকেলবেলাটা বেশ গরম। গায়ে জ্বালা ধবিয়ে দেয়। তারি মধ্যে এক ঘন্টার বেশি টীমি বসেছিল। একটা পোকা ঢুকে গিয়েছিল নাকে। বেশ কয়েকবাব হাঁচিয়ে ছাড়লে তাকে। তার জলভরা চোখে চলন্ত যানবাহন যেন নাচছিল। পোকার ব্যাপাবটা অল্পক্ষণের মধ্যে মিটল। তাবপব টীমির কাছে ফিবে এলো ঠাণ্ডা এবং ধিকিধিকি যন্ত্রণাসহ পরিস্থিতির নিদারুণ ধাক্কা।

আজ যেন বন্য হাঁসের পেছনে তাকে দৌড়াতে বাধ্য কবা হয়েছে। সে তিন জায়গায় গিয়েছিল যেখানে কাজ পাওযাব সম্ভাবনা ছিল খুবই আশাপ্রদ। কিন্তু কিছুই জুটল না। এক জায়গায় তাকে বলা হোলো, "আমাদের লোক আছে, জো।" দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানে এক ছোটখাট চেহাবাব টাইপিস্ট বললে, "তুমি ত বেশ ডাগব হে। আমাদের কর্তা বাচ্চা ছোকরা চায়—এই বছর আঠারোর মত বয়স।"

অতঃপর তরুণী টাইপ শুরু করলে, সিগারেটের একবাশ ধোঁযায তার মুখ আচ্ছন্ন। তিন নম্বর জাযগায বেঁটে–মোটা একটা লোক খন্‌খনা গলায় মজুরির কথা বললে, "হপ্তায় দু'পাউন্ড দশ।" টীমি চেয়েছিল তিন পাউন্ড দশ। মালিক তার শেষ রায দিলে, "নিলে নাও, না হয় যাও।" ধলা–গাল এবং মিট্‌মিটে চোখবিশিষ্ট বেঁটে লোকটার কথা ভেবে টীমি মনে মনে হাসল।

একটা পোকার উপর একটা বোল্‌তার পীড়ন–দৃশ্য অনুধাবন করছিল সে। বোলতাটা প্রথমে উপবে কয়েক চক্কর দিলে, তারপর দেখাই যাচ্ছে জেবড়াজোবড়া প্রতিরোধহীন পোকার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পোকাটাকে দংশনের সময মনে হোলো, বোলতা একদম তার মাথার উপর খাড়া। পোকাটা তখন ভয়ানকভাবে দেহ দুমড়াচ্ছিল যেন পৃথিবী থেকে উড়ে আর কোথাও চলে যেতে চায়। তাবপর পোকাটা সটান লম্বা হয়ে গেল, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ডানাওয়ালা পতঙ্গ শিকার ধরেছে। বেচারা পোকাটার জন্যে টীমির দয়া

হয়। লড়াই হোলো ঠিক। কিন্তু সমানে সমানে নয়। তাছাড়া অন্যায় লড়াই। নিজেকে প্রশ্ন করে টীমি—চিরদিন কি এইভাবে চলবে? অস্ত্রশস্ত্রে যথাসজ্জিত, কর্মতৎপর প্রাণী প্রতিরোধহীনদের মরণ-কামড় দেবে? বোলতাটা এতক্ষণে পোকাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যায় নিজের আস্তানার দিকে।

টীমির মনে পড়ল, তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আর কিছু নেই। স্ত্রী বড় দরদীজন। এই চিন্তা মনে কিছু প্রশান্তি বয়ে আনে। দরদী এবং বড় ধৈর্যশীল তার স্ত্রী। আগেও যেমন বলেছে, আজও সে বলবে, 'টীমি, কাল আবার সূর্য উঠবে। সূর্য সকলের জন্যেই ওঠে। নতুন দিনে সূর্যের নসিব নতুন হয়।" অথবা পূর্বের মতই উচ্চারণ করবে, "টীমি, আমি চুলো জ্বালাই। আমাদের মুরুব্বিরা বলে গেছে, হাঁড়ি গরম করার কিছু না থাকলেও চুলো জ্বালানো উচিত।"

কিন্তু এখন ত সে অসুস্থ। ওর বাচ্চা হবে। তিন নম্বর। গত দু'মাস টীমি বাড়িতে কিছু নিয়ে যেতে পারে নি। সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। টীমি ভাবলে, কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সে এমন কিছু করবে না, যা তাকে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বে। তার বউ-বাচ্চা উপোষ মাববে আর সে জেলে যাবে, না, তা হয় না। খুব জোর দিয়েই সে মনে মনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করল।

এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ টীমির পাশ দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল। বোঝাই যায় মাতাল। একটু এগিয়ে সে থামল এবং মুখ ফিরিয়ে টীমিকে দেখার চেষ্টা করল। সে টীমির কাছে ফিরে এলো এবং তার সামনে ব্র্যান্ডির বোতল ধরল। চরণ অবিশ্যি টলোমলো।

"এই জন, মাল্‌টা টেনে নাও। শুভ নববর্ষ।"

টীমি মাথা নাড়ল।

"টানো—খেলোয়াড়—ট-ট-টানো .... পু-পু- পুলিশ নে-নেই তোমাকে ধরবে।"

আবার টীমি মাথা নাড়লে এবং ওকে ফিরিয়ে দিলে।

"দ্যা-দ্যাখো এই এক হালার পুৎ...... শুভ নববর্ষ করতে চায় না। যা জাহান্নামে যা।"

শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বোতল ভাঁজতে-ভাঁজতে ঘুরে পড়ল এবং তিড়িংবিড়িং করে হাঁটতে লাগল।

বোতলটা যদি টাকা হোত। টীমি বড় তিক্ততার সঙ্গে ভাবে।

তখন ওর মনে পড়ল, এখন বাড়ি ফেরা উচিত এবং সোফিয়াটাউনের বাসে উঠে পড়ল। বাসে সে দেখলে ফূর্তির আবহাওয়া। নববর্ষের মওজ। সবাই গা হেলিয়ে দিয়েছে ভাবনাচিন্তার বাইরে। মাঝে মাঝে চিৎকার দিয়ে উঠছে, "শুভ নববর্ষ, শুভ ......।"

একটা লোক গির্জার থামের এলাকায় ঠিক তার উল্টোদিকে গীটার বাজাচ্ছিল। টীমি তার দিকে তাকিয়ে দেখে। এখানে আর একটা মেয়ে নাচছে সুরের তালে তালে। গীটার-বাদক এলোপাতাড়ি আনাড়ির মত ঝঙ্কার দিচ্ছিল। বোঝা যায়, সে নিজের ভাবে উড়ে চলেছে। লোকটা নিজের যন্ত্রকে মিষ্টি কথায় আদব করছে, আবার গায়ে হাত বুলাচ্ছে। বিনা আয়াসে লোকটা তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাজিয়ে যায়। আর সামনের মেয়েটার দিকে ভ্রূকুটিমাখা চোখে তাকায়, যখন প্রলুব্ধকর ভঙ্গিতে মেয়েটা তার দেহভঙ্গি করে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে,

বায়ু–আন্দোলিত চারাগাছের মত। আস্তিনহীন হালকা ব্লাউসের ভেতর দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসে তার স্তন। সেই সময় গীটার–বাদক যন্ত্রের উপর কান নামিয়ে আনে যেন তার যাদুময়ী সুর সে আরো ভালরূপে শুনতে পায়। অথবা, যন্ত্রের কাছে ফিস্‌ফিস শব্দে বলতে চায় তার আনন্দ–রহস্য।

টীমির পাশে এসে বসল দুটো মেয়ে। একজনকে দেখায় বড় পাংশু এবং রোগাটে। অন্যজন তার নিজের ও টীমির পায়ের মাঝখানে রাখল একটা সুটকেস। দু'টি মেয়ের উপস্থিতি টীমিকে সঙ্গীত থেকে ফিরিয়ে আনল। মেয়ে দু'টির মধ্যে, মনে হোলো, না–বলা অনেক কথা রয়ে গেছে।

পরবর্তী স্টপে নামার জন্যে মেয়ে দু'টি উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে ওরা যখন যায়, টীমির এক চোখ সুটকেসের উপর নিবদ্ধ থাকে। বাস ছেড়ে দিলে টীমির পেছনে বসা একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, মেয়ে দুটো সুটকেস ফেলে গেছে।"

"না, ওটা আমার" টীমি ব্যস্ততাসহকারে বললে।

"না, আমি দেখেছি ওরা সুটকেস নিয়ে ঢুকেছে।"

.... এই একটা মওকা পাওয়া গেছে ....

"ও সুটকেস আমার।"

"আমাকে একথা বলতে পারো না।"

না, এ নিয়ে কোনো তর্কাতর্কি হওয়া উচিত নয়। না হলে.....

"তুমি কি আমাকে সুটকেস নিয়ে আসতে দ্যাখো নি?"

আমি মেজাজ খারাপ করতে চাই নে। না হ'লে দেখিয়ে দিতাম.....

"হাচা কথা বলো না, মিয়া। কারো গায়ে ত কেউ কামড় দিচ্ছে না।"

"এখন তুমি চাও আমি আরো কী বলব?"

চারপাশের লোক আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আল্লা রে আল্লা, এখন আমি কী করব?

"ওর জন্যে আজ শুভ দিন।" পেছনের সিট থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল।

"না ওর নয়। আজ শুভ দিন কী করে?" একজন শুধায়।

"–হাহ্–হাহ্–হা" একটি মেয়ে হেসে উঠল এবং বললে, "তুমি আমার জিনিস নিলে, আমি তোমার জিনিস নিলাম, ও আর একজনের জিনিস নিলে। সুতরাং আমাদের সকলের জন্যে শুভ দিন। হাহ্...হা.... ?" ডবল হাসি হেসে উঠল রমণী নিজেকে হাসির মধ্যে সোপরদ্দ করতে।

"আহ্, যেতে দাও, ভাই", আর একদিক থেকে এক বর্ষীয়ানের কণ্ঠ শোনা গেল, "একজন লোক শুধু বলছে মেয়েরা সুটকেস এনেছিল। একজন শুধু দাবি করছে। সুতরাং এক বনাম এক। সুতরাং, যার যা আছে তার কাছেই থাক। যদিও লোকের বিশ্বাস সুটকেসটি ওই মেয়েদের।"

সবাই হোহো হেসে উঠল। আনন্দময় নববর্ষের মওজের আবহাওয়ায় যুক্তিতর্ক মিলিয়ে গেল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে টীমি। সে জিতে গেছে।

বাস স্টপে এলে সে নেমে পড়ল। সে শুনল না তার পেছনে বাসে একজন কাঁদোকাঁদো গলায় বলছে, "সুটকেসই বলতে পারে, ওটা কার। খোদা সাক্ষী।"

লোকে নিজের চরকায় তেল দেয় না কেন? ওর মনে হোলো, সমস্ত লোক তার দিকে চেয়ে আছে।

বাস থেকে নামামাত্র কৌতূহল, উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা টীমিকে ছেয়ে ধরল।

চান্স্ পাওয়া গেছে। একেবারে এস্‌পার–ওস্‌পার চান্স। আর টীমি তা ছেড়ে দেয় নি। হাঁটার সময় এই কথাটাই তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল।

টীমি এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি যে এক দঙ্গল লোকের মধ্যে এসে পড়েছে এবং পুলিশ, দু'জন শ্বেতাঙ্গ কনস্টেবল, তাদের তল্লাশি করছে। ওদের তক্‌মার ঝল্‌মলানিতে সে হক্‌চকিয়ে গেল। টীমি তাড়াতাড়ি এক বাড়িব পেছনদিকের উঠানে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা একজন চীনা লোকের দখলে। বিরাট লোহার দরজার আড়ালে দাঁড়ানোর কালে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তখন টীমি ভাবলে, আল্লা তার সহায়।

পনের মিনিট সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল এবং রাস্তায় কী ঘটছে সবই সে দেখতে পায়। রাস্তাটার নাম গুড্ স্ট্রিট। এখানকার হৈচৈ কলগুঞ্জন ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সেদিন তীব্র উচ্চগ্রামে উপনীত তা'–মনে হয় হিংস্র, নির্বিকার, ভয়াবহ একটা কিছু। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ভয়ার্ত অনুভূতি টীমিকে ছেয়ে ধরে, সে ভাবে সে এই সব বিশ্রী শব্দের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাকে ঘিবেই এই সব উত্তেজনাময় হৈচৈ ঘুরপাক খাচ্ছে। লোকজনকে ডাকাডাকি করার জন্যে চিৎকার তারই কৃতকর্ম।

মরিয়া এক মুহূর্তে টীমি ভাবল, সুটকেসটা ওখানে ফেলে দেওয়াই ভাল। কাজটা ওর জন্যে কঠিন কিছু নয়। হ্যাঁ, সুটকেসটা ওখানে রেখে দেওয়াই ভাল। তাহলে তার হাত কী আত্মাও হয়ে পড়বে ভারমুক্ত। শেষমেশ সুটকেসের মালিক ত সে নয়।

তার নয়। এই চিন্তা তাকে মনে করিয়ে দিল যে সে মালিক নয় বলেই এত কাণ্ড। সুটকেসটা তার নয়। তাই ত বাসে অমন জলজ্যান্ত কাণ্ড ঘটার মওকা দেখা দিল। টীমি ভাবলে, তার শিগ্‌গির বাড়ি যাওয়া উচিত, যেহেতু সুটকেসের মালিকানা তার নয়। সে এখানে সমাজচ্যুত মানুষের মত উবু বসে আছে; কারণ, সুটকেস তার নয়। এখানে ওটা ফেলে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। মালিকানার কোনো ঝঞ্ঝাটই আর থাকে না। ওর ভেতরে নিশ্চয় দামী দামী কিছু আছে। টীমি মনে মনে ধানাই–পানাই শুরু করল। সুটকেসটা এত ভারি। ভেতরে দামী কিছু আছে। তাছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। আল্লা এতদিনে তার মুখের পানে চেয়ে দেখেছেন। ঘরে রুগ্ন বউ আর ক্ষুধার্ত ছেলেপিলে। স্বর্গীয় মুরুব্বিরা এতদিনে তাকে দয়া করেছে। টীমির মধ্যে তখন ভর করে বসে এক রকমের বন্য সঙ্কল্প। অন্ধ এই সঙ্কল্প তখন কাজ শুরু করলে, তারপর আর হিসাবের কোন প্রশ্ন ওঠে না। সময় থাকতে সর্বনাশ এড়িয়ে যাবে কি না, তুচ্ছ বা মূল্যবান জিনিস রাখবে কি রাখবে না—এসব বাছবিচার আর থাকে না। না, সুটকেস সে হাতছাড়া করবে না কস্মিনকালেও।

আসামী বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভ্যান বা গাড়ি এসে আটক মেয়ে–পুরুষদের তুলে নিল।

পুলিশের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে রাস্তা ধরল। টীমি বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। পেছনে তাকানোর সাহস হয় না তার, পাছে ঘাবড়ে গিয়ে সে ডাহা কোন ভুল করে বসে। সে জানে, সে ত এসব করার বান্দা নয়।

রাস্তার উল্টোদিক থেকে আসছে পিৎসো। ও আল্লা, এমন সময় পিৎসো কোথা থেকে এলো? পিৎসো ত কথার থলি। বিদ্‌ঘুটে বক্‌বককারী। ও থাকলে সবসময় পার্টি ভেঙে যায়।

ওদের সাক্ষাৎ ঘটে গেল।

"টীমি, আদাব। মনে হচ্ছে তুমি খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আছো, টীমি?"

পিৎসো চিরাচরিত জোর শব্দ এবং খোশ-মেজাজে ডাক দিলে, "আসছো, না যাচ্ছো?"

"আসছি।" টীমি ওকে কথা বলার সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক।

"আচ্ছা, কবে থেকে তুমি আবার এ.জে.বি হলে?"

"কে বলে আমি এ.জে.বি?"

"ওই ত দোস্ত," পিৎসো সুটকেসের উপরকার আদ্যাক্ষরগুলোর দিকে আঙুল বাড়ায় এবং বন্ধুর দিকে চোখেমুখে হাসিসহ তাকায়।

"ওটা আমার এক মামাতো ভায়ের।" টীমির তখন ইচ্ছা হয়, ওই হুকামুখো নচ্ছারটার মুখের বাঁকা হাসি সে ঘুচিয়ে দিতে পারত। পরক্ষণে তার মনে পড়ল, কী নিস্তেজ আর অসহায় এখন সে। কারণ, পিৎসো এবং তার ব্যঙ্গ হাসি ঠিক পিৎসো আর তার মুখের মত অবিচ্ছেদ্য। টীমি তখন চাইছিল যেন মুখে তার অসোয়াস্তির ছাপ না থাকে। সে বললে, "পিৎসো, আমার স্ত্রী ত অসুস্থ, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

টীমি কেটে পড়ল। পিৎসো তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চওড়া মুখে তখনও ফাঁকা হাসি লেগে রয়েছে।

রাস্তা বরাবর একটা শিভ্‌রলেট গাড়ি এসে থামল। তারপর আবার রাস্তা ঘেঁষে খুশিমত এগোতে লাগল, খানিকটা হেলাফেলাভাবে।

"এ-ই", শব্দে টীমি তার বাঁ দিকে তাকায়। কি যেন তার ভেতরে মট্ শব্দে কিছু ভাঙল। আর সেই ভাঙা পিণ্ড তার গলা পর্যন্ত উঠে এলো।

"এ-ই জো, থাম্।" ড্রাইভার হাত নেড়ে ইশারা করল।

ওই ত তারা। দু'জন শ্বেতাঙ্গ কনস্টেবল। আর সাদা লেবাসে পেছনের সিটে বসে আছে এক কাফ্রি। টীমি তখনই বুঝে নিল, এখন দৌড়ানো বোকামি হবে। তাছাড়া সুটকেসটা ত তার পাওয়া উচিত। সে থামল। ড্রাইভার তার কাছে গিয়ে সুটকেস নিয়ে নিল। একই সময় ঘাড়ে ধরে সে তাকে গাড়ির কাছে আনল এবং পেছনের দরজা খুলল টীমির জন্যে।

থানার দিকে গাড়ি শাঁ-শাঁ বেরিয়ে গেল।

নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়ার দশা—যখন টীমি দেখল, তার পাশে কালো একটা লোক বসে আছে। এ সেই ব্যক্তি বাসে সুটকেসটা তার নয় বলে যে তর্কাতর্কি করেছিল। পূর্বপুরুষদের আত্মার দোহাই, লোকটার ন্যায়বিচারের বোধ কি এত প্রখর যে সাক্ষী দিতে আল্লাকে ডেকে আনবে? এমনকি নববর্ষের পূর্বাহ্লে? অথবা, লোকটা গোয়েন্দা? না, ও ত

বাসেই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত। লোকটা কদাচিৎ টীমির দিকে তাকাচ্ছিল। সাধুগিরির একটা ভঙ্গি নিয়ে সে বসেছিল। ব্যাপারটা টীমির চোখ এড়ায় না।

টীমির বিরক্তি ধরেছিল, ভয়ানক বিরক্তি। ব্যাপারটা ত চ্যালেঞ্জ। বেশ, মোকাবেলা করবে সে। কোন না কোন দিকে পরিস্থিতি গড়াবে। টীমির মনে হোলো, অদৃষ্ট যা দিতে পারে সবই এখন তার প্রয়োজন।

থানায় দুই কনস্টেবল সুটকেস একটা ছোট কামরায় নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে তাবা ফিরে এলো। টীমির মনে হলো ওদের দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে ছিল একটা অস্বাভাবিক যোগাযোগ।

"এদিকে আয়, জো, এদিকে" ওদের মধ্যে এক কনস্টেবল বললে, অবিশ্যি খুব মোলায়েম স্বরে। তারা সুটকেস তার সামনে রাখলে।

"এ সুটকেস কার?"

"আমার।"

"তোমার জিনিসপত্র ভেতরে আছে?"

"আমার বৌর জিনিসপত্র।"

"সেগুলো কী?"

"আমার মনে হয়, ওর কাপড়-চোপড় আছে।"

"তুমি কেন বলছ, আমার মনে হয়?"

"মানে, ও খুব তাড়াতাড়ি সুটকেস গোছগাছ কবে আমাকে তার পিসির কাছে নিযে যেতে বললে। ওকে সুটকেস গুছাতে আমি দেখি নি।"

"আচ্ছা। তোমার বৌর কাপড়-চোপড় চিনতে পারবে ত?"

"কিছু ত পারব।"

ওর জন্যে ব্যাপারটা এমন সহজ করে দিচ্ছে কেন? শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের চোখে অমন নিরুত্তাপ হাসির ছোঁয়াচ কেন?

কনস্টেবল সুটকেস খুলে এক একটা জিনিস বের করে।

"এ-টা তোমার বৌর?"

একটা ছেঁড়া জামা।

"হ্যাঁ।"

"আর এগুলো, এগুলো ?" টীমি দু'বারই জবাবে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেল।

এমন ছেঁড়া কাপড়-চোপড় সুটকেসে ভরেছে কেন? প্রত্যেকটা টীমির চোখের সামনে কনস্টেবল তুলে ধরল। টীমির চিন্তা তখন তার মাথার ভেতর কুদোকুদি করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। নসিব তার সঙ্গে এ কী পরিহাস করল?

ছেঁড়া, ন্যাতা কাপড়গুলো বের হওয়ার পর কনস্টেবল ভেতরে একটা জিনিসের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বেশ গরম চোখে চেয়ে বললে, "এগুলোও তোমার বৌয়ের?"

দেখার জন্যে টীমি গলা বাড়ায়।

ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য। বারো ঘন্টার বেশি হয় নি— এমন এক সদ্যোজাত শিশুর মরা লাশ।

উলঙ্গ, সফেদ, কুঞ্চিত-কেশ মৃত্যুর প্রতিমূর্তি।

টীমির দম ফুরিয়ে আসে। নিজেকে সে অসুস্থ মনে করে এবং মূর্ছা যায়। জবানবন্দি করার জন্যে ওকে ধরে-ধরে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। টীমি সত্য কথাই বলে। সে জানে, চান্সের সঙ্গে সে জুয়োর বাজি ধরেছে। এই চান্সের মূল্য আঠার মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

অনুবাদ : শওকত ওসমান

গৃহশান্তি □ চিনুয়া আচেবে

জোনাথান ইওয়েগবু নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করে। যুদ্ধের পরে শান্তির প্রথম অবস্থার ঝাপ্‌সা দিনগুলোতে চালু আদব-কায়দা-মতোন শুধুমাত্র পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করা আর শুভেচ্ছা জানানোর চেয়ে ভালোভাবে টিকে থাকাটা তার কাছে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ— কথাটা তার বুকের অনেক ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে।' যুদ্ধের' ভেতর থেকে তার নিজের মাথা, তার বউ মারিয়ার মাথা আর চার সন্তানের মধ্যে তিন সন্তানের মাথা—এই পাঁচ-পাঁচটা আশীর্বাদ নিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে। আর পুরনো বাইসাইকেলটাকে ফিরে পাওয়া তার কাছে ভর্তুকি পাওয়ার মতো ব্যাপার। সাইকেলটা ফিরে পাওয়া একটা আজব ঘটনা হলেও পাঁচ-পাঁচটা ঘাড়ের ওপর পাঁচ-পাঁচটা মুণ্ডু অটুট থাকার সাথে তুলনাই চলে না। এই সাইকেলটার একটা ইতিহাস আছে। যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যে একদিন 'জরুরি সামরিক কার্যের' জন্য এই বাইসাইকেলটাকে তলব করা হয়। সাইকেলটা হাতছাড়া হওয়া তার কাছে একটা বিরাট লোকসান হওয়া সত্ত্বেও সে ওটাকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতো, যদি যে-অফিসারটি ওটাকে চাইতে এসেছিলো সে সাচ্চা কি না সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ না থাকতো। সন্দেহটা সামরিক অফিসারটির অশোভন ফাটা ছেঁড়া কামিজ কিংবা পায়ে একটা নীল, আরেকটা বাদামী ক্যানভাস কাপড়ের জুতোর ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি-মারা আঙুলগুলোর জন্য নয়। এমনকি ডট্‌বোন দিয়ে নিশ্চিত তাড়াহুড়ো করে জামায় আঁকা দু'টি তারা, যা নাকি তার ফৌজি পদমর্যাদার ইঙ্গিত, এ সবকিছুর জন্য মোটেই জোনাথানকে সন্দেহের সমস্যায় পড়তে হয় নি— অনেক ভালো আর বীর সৈনিককে এই রকম বা এর থেকেও খারাপ দেখায়। আসলে লোকটার হাবভাবে ছিল দৃঢ়তা আর বোধশক্তির কেমন একটা অভাব। লোকটাকে হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে কব্জা করা যাবে— এই রকম একটা বিশ্বাস নিয়ে জোনাথান তার তালপাতার আঁশে বোনা ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে দু'পাউণ্ড মুদ্রা খুঁজে পেলো— এই টাকাটা দিয়ে তো তার জ্বালানি কাঠ কেনার কথা ছিলো। আর, তার স্ত্রী মারিয়া সামরিক ক্যাম্পের অফিসারদের কাছে আবার সেই কাঠ বিক্রি করে মাছ আর গম কিনে নিয়ে আসতো। সেই দু'পাউণ্ড দিয়েই সে বাইসাইকেলটা ফির পেলো। সে-রাতেই সে সাইকেলটা গোর দিল ঝোপঝাড়ের মধ্যিখানে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা ছিলো, যেখানে ক্যাম্পের লাশগুলোকে

গোর দেওয়া হতো, যেখানে তার সবেচেয়ে ছোট্ট ছেলেটাকেও গোর দেওয়া হয়েছিলো, সেখানে। বছর খানেক বাদে, আত্মসমর্পণের পরে, সাইকেলটাকে সে আবার মাটি খুঁড়ে বের করে দেখে যে ওটাতে শুধুমাত্র একটু পাম-তেল দিলেই চলবে। 'ঈশ্বর কোনো কিছুতেই ঘাবড়ান না', আশ্চর্য হয়ে সে বলে উঠেছিলো।

সাততাড়াতাড়ি সাইকেলটাকে ট্যাকসির মতো ভাড়া খাটিয়ে ক্যাম্পের অফিসার ও তাদের পরিবারদের ক্যাম্প থেকে সবচেয়ে কাছে যে পাকা রাস্তা সেই চার মাইল দূরত্ব পারাপার করে সে সামান্য 'বায়াফ্রান'[২]-টাকা জমিয়ে ছিলো। এটুকু রাস্তার এক পিঠের 'রেট' ভাড়া ছিলো ছ'পাউন্ড। যাদের পয়সা ছিলো তারা এভাবে কিছু পয়সা উড়িয়ে দিয়ে খুশিই হতো। এক পক্ষকাল বাদে সে মোট একশো পাউণ্ড জমিয়ে ফেলে এই ক্ষুদ্র সম্পদের মালিক হয়ে বসলো।

তারপর সে এনুগুতে গিয়ে দেখে যে তার জন্য আরো একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। নিজের চোখ দুটো কচ্‌লে নিয়ে সে আবার তাকায়, ওইতো সেটা তার সামনে সটান খাড়া আছে। তবু, বলা বাহুল্য, আকাশ-ছোঁয়া এই যে দৈব-আশীর্বাদটি অপর-যে আশীর্বাদের কৃপায় তার পরিবারের পাঁচ-পাঁচটা মাথা ঘাড়ের ওপর এখনো খাড়া আছে—তার চেয়ে মাপে খাটো তো বটেই। এই নতুনতম অলৌকিক ব্যাপারটা আসলে তার ওগুইয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছোট্টো বাড়িটা। সত্যিই, ঈশ্বরকে কোনো কিছুই ধাঁধা লাগিয়ে দেয় না। ওইতো তার বাড়ির মাত্র দুটো বাড়ির পরে যে কংক্রিটের বিশাল প্রাসাদটা একজন পয়সাওয়ালা ঠিকাদার খাড়া করেছিলো ঠিক যুদ্ধের আগে, সেটা এখন একটা ইটপাটকেল, পাথরকুচির পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। আর, এইতো, এখানে জোনাথানের খাদহীন দস্তার পাতের বাড়িটা, যা কিনা কাঁচামাটির ইট দিয়ে বানানো— একেবারে অক্ষত। অবিশ্যি দরজা-জানালা আর ছাদের চালার পাঁচ-পাঁচটা পাত লোপাট হয়ে গেছে। তাতে কি এসে যায়? আরে, সে তো যে করে হোক যথেষ্ট আগেই এনুগুতে ফিরে এসেছে, যাতে সে সহজেই ধ্বংসস্তূপ থেকে পুরনো দস্তার টুকরো, কাঠের টুকরো, ভিজে ল্যাত্‌প্যাতে পিচবোর্ডের ফালি—এসব ছড়ানো-ছিটানো আশপাশ থেকে কুড়িয়ে নিতে পেরেছে, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা আরো হাজার-হাজার মানুষ বেরিয়ে এসে এগুলো হাতড়ে নেবার আগেই। তারপর সে একটা নিঃস্ব, চালচুলোহীন ছুতোরকে যোগাড় করে; যার যন্ত্রের থলেতে সম্বল মাত্র একটা পুরোনো হাতুড়ি, একটা ভোঁতা র‍্যাঁদা, আর কিছু মরচে-ধরা ব্যাঁকাত্যারা পেরেক দিয়েই ছুতোরটা ওই পাঁচমিশেলি কাঠের ফালি, পিচবোর্ড আর ধাতুর পাতগুলোকে দরজা-জানালার কপাটে কোনোরকম একটা রূপ দিলো। মাত্র পাঁচ নাইজিরীয় শিলিং, যা কিনা পঞ্চাশ বায়াফ্রান পাউণ্ডের সমান, মজুরিতে। টাকাটা সে দিয়ে দিলো, আর খুশিতে ডগমগ ঘাড়ের ওপর পাঁচটা অটুট মুণ্ডুসুদ্ধ তার পরিবারকে নিয়ে সে তার ডেরাটায় প্রবেশ করলো।

তার সন্তানেরা সেনাদের গোরস্থানের কাছের আমতলা থেকে আম কুড়িয়ে সেপাইসান্ত্রীদের বউ-বিবিদের কাছে দু'চার পেনিতে বিক্রি করতে লাগলো—সত্যিকারের পেনি এবারটায়। আর তার বউ পাড়াপড়শিদের সকালের নাস্তার জন্য পাম তেলে ভাজা,

মরিচ-ছড়ানো ময়দার পিঠে বানিয়ে বিক্রি করতে থাকলো—তাড়াতাড়ি করে আবার ঘরসংসার শুরু করে দেবার জন্য। এই পারিবারিক আয় থেকে সে তার বাইসাইকেলটায় চ'ড়ে চারপাশের গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে তাজা তাড়ি কিনে এনে নিজের ঘরে বসে অকৃপণ হাতে ওই তাড়িতে ইদানীং আবার রাস্তার বারোয়ারি কলে যে জল পড়তে শুরু করেছে, সেই জল মিশিয়ে, সেপাই আর দেদার পয়সাওয়ালা ভাগ্যবান লোকদের জন্য একটা শুঁড়িখানা খুলে ফ্যালে।

কোল কর্পোরেশনের আপিসে, যেখানে সে একসময় খনি মজদুর ছিলো, প্রথম-প্রথম সে প্রতিদিন যেতে শুরু করে দেয়। পরে একদিন অন্তর যাওয়া শুরু করে, শেষে সপ্তাহে একদিন করে, খবরটবব আনতে, কি হয না হয় জানতে। শেষমেষ সে একমাত্র যা আবিষ্কার করলো তা' হলো যে, তার নিজের ছোট্টো বাড়িটার টিকে থাকাটা সে আগে যতোটা ভেবেছিলো তার চেয়েও বড়ো রকমের আশীর্বাদ। তার কিছু সহকর্মী প্রাক্তন খনি-মজদুররা, সমস্ত দিনের ধরনার পর যাদের কোথাও ফিরে যাবার মতো জায়গা নেই, তারা শুধু আপিস বাড়িগুলোর দবজার বাইরে ঘুমিয়ে পড়তো, আর লুকিয়ে-চুরিয়ে যা কিছু খাবার মতো যোগাড় করতে পারতো বোর্নভিটার টিনে ভরে তা রান্না করে খেয়ে নিতো। সপ্তাহগুলো ক্রমে যখন লম্বা হয়ে যেতে থাকলো, তবুও কেউই যখন বলতে পারলো না কাজ-কর্মের ব্যাপারে কি হবে না হবে, জোনাথান তখন তার এই হপ্তা-হাজিরা একেবারে বন্ধ করে তার তাড়িখানার দিকে মুখ ফেরালো।

কিন্তু, ভগবানকে কিছুই ধাঁধায় ফ্যালে না। ছপ্পর ফেড়ে পাবার দিন এলো, যেদিন, পরপর পাঁচদিনের রোদের মধ্যে, ট্রেজারির বাইরে লাইন আর পাল্টা লাইনের ধস্তাধস্তি-গুঁতোগুঁতির শেষে সে তার হাতের তালুতে পেয়ে গেলো গুন্‌তি করা মোট কুড়ি পাউণ্ড (নাইজিরীয় পাউণ্ড), যা কি না তার বিদ্রোহী মুদ্রা (বায়াফ্রার মুদ্রা) সমর্পণের বদলে পাওয়া ভরতুকি-প্রদানের টাকা। এটা তার কাছে আর তার মতো অনেকের কাছে বড়োদিনের আনন্দের মতো, যখন টাকাটা দেয়া শুরু হলো। তাদের কাছে এটা 'হবতুকি' বা 'হত্তুকী'র টাকা (যেহেতু খুব অল্প ক'জন 'ভরতুকি' বা 'অনুদান' ইত্যাদি সরকারি পরিভাষাগুলো সামলাতে পারে)।

যে মুহূর্তে তার হাতের তালুতে পাউণ্ডের নোটগুলো দেয়া হলো জোনাথান তক্ষুণি শুধু তার হাতের মুঠোটা শক্ত করে বন্ধ করে নোটসুদ্ধ তার মুঠো ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিলো। তাকে একটু বেশি রকম সতর্ক হতে হয়েছিলো। কেননা, দিন কয়েক আগে সে একটা লোককে ঐ জনসমুদ্রে পলকের মধ্যে প্রায় উন্মাদের মতো ভেঙে পড়তে দেখেছিলো। কারণ, লোকটা কুড়ি পাউণ্ড পাওয়া মাত্রই একটা নির্দয় গুণ্ডা টাকাটা ছিনতাই করে নিয়ে পালালো। যদিও এটা ঠিক নয় যে, কোনো মানুষের এইরকম একটা চূড়ান্ত যন্ত্রণার সময় তাকে দোষারোপ করা, তবু লাইনে-দাঁড়ানো অনেকেই সেদিন নিচুগলায় ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া লোকটির অসতর্কতাকেই দায়ী করেছিলো, বিশেষ করে লোকটি তার পকেটের ভেতরের কাপড়টা টেনে বের করে সকলের সামনে একটা চোরের আস্ত-মুণ্ডু-গলে-যাবার মতো ছ্যাঁদা মেলে ধরে দেখানোর পর। লোকটি অবশ্য জোর

দিয়ে বলেছিলো যে টাকাটা তার অন্য পকেটে ছিলো। অপর পকেটটাও টেনে বের করে সেটার অখন্ডতা সে দেখিয়েছিলো। তাই, সাবধান হওয়া উচিত।

জোনাথান তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তার বাঁ হাতে চালান করেছিল, বাঁ হাত থেকে পকেটে, যাতে তার ডান হাত প্রয়োজন হলে অন্যের সাথে হাত মেলানোর জন্য মুক্ত থাকে, যদিও তার দৃষ্টিটাকে সে এমন একটা উঁচুতে রেখে চলতে থাকলো যাতে কাছে এগিয়ে আসা মানুষের মুখগুলো তার দৃষ্টি থেকে ফস্‌কে যায়; আর যাতে সুনিশ্চিত হাতে হাত মেলানোর দরকার না হয়—যতোক্ষণ না সে বাড়ি পৌঁছে যায়।

সে স্বাভাবিকভাবে খুব ঘুমকাতুরে। কিন্তু সেই রাত্তিরে সে শুনতে থাকলো চারপাশের সমস্ত রকমের শব্দ এক এক করে থেমে যাচ্ছে। এমনকি রাতের চৌকিদারটা, যে কিছুদূরে কোথাও কোনো ধাতব কিছুর ওপর আঘাত করে প্রত্যেকটা ঘন্টা জানিয়ে দেয়, সেও রাত একটার ঘন্টা বাজিয়ে নীরব হয়ে গ্যালো। আর এটাই ছিলো ঘুমের অতলে আত্মহারা হবার আগে তার শেষ ভাবনা। সে এভাবে বেশিক্ষণ নিমগ্ন থাকতে পারে নি, কারণ প্রচণ্ডভাবে তাব ঘুম ভেঙে গেলো, সে জেগে উঠলো।

'কে দরজা ধাক্কাচ্ছে ?' তার পাশে মেঝেতে শুয়ে থাকা তার বউ ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করলো।

'আমি জানি না,' শ্বাসরোধী ভয়ে সেও পাল্টা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো।

দ্বিতীয়বার দরজার ধাক্কাটা এ্যাতো জোরে আর উদ্ধতভাবে বেজে উঠলো যে আর একটু হলেই পেঁচোয় পাওয়া, পুরনো দরজাটা ভেঙে পড়তে পারতো।

'দরজা ধাক্কায় কে ?' সে তখন প্রশ্ন করলো, তার গলা শুক্‌নো শোনালো আর থরথর করে কাঁপতে থাকলো।

'চোর আর চোরের দলবল,' ঠাণ্ডা একটা উত্তর এলো।

'তোমাকে দরজাটা খুলতে বলছি' কথার পরে দরজার ওপর আগের চেয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হোলো।

মারিয়াই প্রথম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো, তারপরে সে, জোনাথান; দেখাদেখি তাদের সন্তানরাও।

'পুলিশ, পুলিশ! চোর, ওরে বাবারে! ও পড়শি কুটুমরা! পুলিশ! আমরা গেলুম! মরে গেলুম রে। ও পাড়াপড়শি কুটুমরা, তোমরা ঘুমাও নাকি গো! জাগো! ওঠো! পুলিশ রে!'

অনেক্ষণ ধরেই এই চিল্লানি চললো। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেলো। বোধহয় তারা চিৎকার করাতে চোরগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। সেখানে পুরোপুরি নীরবতা, কিন্তু, মাত্র অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

'তোমাদের হয়ে গ্যাচে তো?' বাইরের সেই গলাটা প্রশ্ন করলো। আমরা তোমাদের এটুখানি সাহায্য করবো। অ্যাই, তোরা সকলে আয়!

'পুলিশ, পুলিশ! চোর, ওরে বাবারে। ও পড়শিকুটুমেরা! আমাদের সব্বস্ব গ্যালো গো! পুলিশ গো! ...'

সেই সর্দারের গলার সাথে কম করেও আরো পাঁচটা গলা ছিলো।

জোনাথান সপরিবারে ভয়ে এখন পক্ষাঘাতে পঙ্গুর মতো। মারিয়া আর তার ছেলেমেয়েরা দিশাহারার মতো নিঃশব্দে গোঙাতে থাকলো। জোনাথানও ক্রমাগত গোঙাতে থাকলো।

চোরচোট্টাগুলোর হাঁকডাক, শাসানির পর স্তব্ধতাটুকু ভয়ংকরভাবে ছড়িয়ে পড়লো। জোনাথান শুধু কাকুতি-মিনতি করে সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো যে তাদের কি চাই, মুখ খুলে বলুক, যা চাই তা নিয়ে তাদের রেহাই দিক।

'দোস্ত,' শেষ পর্যন্ত সর্দার বলে উঠলো, 'আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করলাম তোদের হয়ে ডাকাডাকি কত্তে, কিন্তুক মনে হয় ওরা সব ঘুম মারচে ... তাই ভাবচি আমরা কেটে পড়ি। তোরা সেপাই-ম্যালেটারি ডাকতে চাস ? নাকি চাস, তোদের জন্য ওদেরকে আমরা ডেকে আনি ? পুলিশের চেয়ে সেপাই-ম্যালেটারি ভালো হবে। ঠিক কি না ?

'ঠিকই তো।' সর্দারের সাগরেদরা বলে উঠলো। জোনাথানের মনে হলো এবার আগের চেয়েও বেশি লোকের গলা সে শুনতে পেলো। সে ভয়ে গোঙাতে লাগলো। তার পা দুটো নিজের শরীরের ভারে যেন বেঁকে দুমড়ে মাটিতে ডুবে যাচ্ছিলো আর তার গলা শিরীষ কাগজের মতো খসখসে হয়ে যাচ্ছিলো।

'দোস্ত, কোনো কতা বলচিস না যে আর। জিগেস করচি তো, তুই কি চাস তোদের জন্য ম্যালেটারি ডেকে আনবো আমরা ?'

'ন্না'।

'বহোতাচ্চা! এবার এট্টু কাজের কতা বলা হোক। আমরা মোটেই ছ্যাঁবড়া, দু'নম্বরী চোর নই। ঝুট-ঝামেলি আমরা পছন্দ করি না। যুদ্ধ-টুদ্দু সব খতম, ঝামেলি-টামেলির হাগা-টাগা সব ভেত্তরে সেঁদিয়ে গ্যাচে গে। আর গিহ যুদ্ধ (গৃহ-যুদ্ধ) হবে না। এবার শালা গিহ শান্তি। ঠিক কিনা!'

'ঠিক! ঠিক!', সমস্বরে বীভৎস গলাগুলো চেঁচিয়ে উঠলো।

'তোমরা আমার কাছ থেকে কি চাও ? আমি গরীবগুর্বো মানুষ। আমার যা' কিছু ছিল, এই যুদ্ধে সব গ্যাছে। তোমরা সব আমার কাছে কেন এসেছো ? যাদের টাকাকড়ি আছে, তাদের তো তোমরা চেনো। আমরা ...'

'বহোতাচ্চা! আমরা জানি যে তোমার বেশি টাকাকড়ি নেই। কিন্তু আমরা একটা পেনিও পাই নি। তার জন্য তোকে এই জানলাটা খুলতে হবে। আমাদের একশ' পাউণ্ড দিয়ে দে আর আমরা ফুটে পড়ি। না'লে আমরাই ভেতরে ঢুকে পড়ি আর তোকে একটু এইর'ম ঝিঙ্চ্যাক বাজনা শোনাই ...'

আকাশ ফাটিয়ে এক ঝাঁক স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গ্যালো। মারিয়া আর ছেলেমেয়েরা আবার তারস্বরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

'হায়, ছিমতী (শ্রীমতি) ফের কান্‌তে লেগেচো। কান্নার কোনো দরকার নেই। আমরা তো বলিচি আমরা ভালো চোর। আমরা আমাদের জন্য অল্প এট্টু টাকা নিয়ে ভদ্দরভাবে চলে যাবো। মারধোর জুলুমবাজি না। আমরা কি মারধোর করি?'

'মোটেই না', সুর করে ধুয়ো তুললো বাকি গলাগুলো।

'শোনো বন্ধুরা', শুকনো কর্কশ গলায় জোনাথান শুরু করলো, 'তোমরা যা' বললে আমি শুনলুম, তোমাদের ধন্যবাদ। আমাব যদি একশো পাউণ্ড থাকতো ...'

'দ্যাখ্ দোস্ত, ছেলেখেলা করিস না, আমরা মোটেই খেলা করতে আসি নি। আমরা যদি ভুল করে তোর ঘরে ঢুকে পড়ি, তা'লে আর পালাবার পথ পাবি না। তাজ্জন্য ...'

'সিষ্টিকত্তা ভগবানেব দোহাই— তোমরা যদি ঘরে ঢুকে একশো পাউণ্ড পাও তো নিয়ে যাও আর আমাকে গুলি করে মেরো আর আমার বউ-ছেলেমেয়েদেরও গুলি করে মেরো। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি। আমার কাছে যা টাকা এ জীবনে আছে, তা' হোলো 'হত্তুকি'র কুড়ি পাউণ্ড যা আজই ওরা আমাকে দিয়েছে ...।'

'ঠিক হ্যায়। সময় চলে যাচ্ছে। তুমি জানলাটা খুলে ওই কুড়ি পাউণ্ডই নিয়ে এসো। আমরা ওই দিয়েই চালিয়ে নেবো।'

এবার জোব শোরগোল শোনা গ্যালো দলটার মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য : 'মিথ্যে বলচে লোকটা, মিথ্যে বলছে, ঢপ মারচে ; ও অনেক টাকা পেয়েচে ... ভেতরে ঢুকে ভালোভাবে খুঁজে দেখবো ... কুড়ি পাউন্ড আবার কি ?' ...

'চুপ কব।' বন্দুকের গুলির মতো সর্দারের গলা শোরগোলটাকে এক পলকে থামিয়ে দিয়ে আকাশে বিঁধে গ্যালো। 'তুই ওখানে আছিস নাকি ? টাকাটা চটপট নিয়ে আয়।'

'আমি আসছি', জোনাথান অন্ধকারে নিজের মাদুরের কাছে রাখা কাঠের বাক্সটার চাবি হাতে নিয়ে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বললো।

ভোরের প্রথম আলো ফুটবার সাথে-সাথে যখন প্রতিবেশী আর অন্যান্য কিছু লোক মিলে সমবেদনা জানাতে জড়ো হলো, জোনাথান তখন পাঁচ গ্যালনের বিশাল বোতলটা তাব বাইসাইকেলের ক্যারিয়ারে দড়ি দিযে বাঁধছিলো, আর তার বউ খোলা আগুনের তাপে ঘামতে-ঘামতে মাটির মালসায় ফুটন্ত তেলে পিঠে ভাজছিলো। এককোণে তার বড়ো ছেলে কযেকটা পুরোনো বিয়ারের বোতল থেকে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলছিলো গতকালের তাড়ির গাদ।

'আমি এসব কিছুই গেবাহ্যি করি না', যারা সহানুভূতি জানাতে এসেছিলো তাদের সে বললো, তার চোখ তখন বোতল বাঁধবার দড়িটার ওপর আটকে ছিলো।[৩] 'হত্তুকি' আবার কি ! গত হপ্তায় আমি কি ওই 'হত্তুকি'র টাকাটার ওপর ভরসা করে কাটিয়েছিলাম? নাকি ঐ ক'টা পাত্তি যুদ্ধে যা' সব হারালাম তার চেয়ে বেশি ? আমি বলি, ঐ 'হত্তুকি'-ভাত্তা-টাতা চুলোয় যাক্। যেতে দাও সে চুলোয়, যেখানে আর সবকিছু গ্যাছে। ভগবানকে কিছুই ধাঁধা-ধন্দে ফ্যালে না।'

অনুবাদ : অতনু চট্টোপাধ্যায

১. এখানে বাযাফ্রার গৃহযুদ্ধের কথা বলা হযেছে। নাইজেরিযার এই যুদ্ধ চলে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত।
২. বাযাফ্রার নিজস্ব মুদ্রা চালু ছিলো, যা ক্রমশ মূল্যহীন হযে পড়ে।
৩. এনুগু—নাইজেবিযাব তৎকালীন পূর্বাঞ্চলেব রাজধানী।
৪. নাইজেবিযাব পূর্বাঞ্চল খনিজ কযলায সমৃদ্ধ, ষাটের দশকে খনিগুলোতে প্রচুব শ্রমিক কাজ করতো।

ক্রুশ সকাশে বিবাহ □ নগুগি বা থিয়োঙ্গো

সবাই তাদের 'প্রশংসাতে পঞ্চমুখ', এমন একটা পরিবার দেখা যায় না—স্বামীটি কাঠের ব্যবসায়ী, মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা, বউটি অনুগত; ভগবান, স্বামী ও পবিবারের প্রতি কর্তব্য পালনে তার কোনো ত্রুটি নেই। ওয়ারিউকি আর মিবিয়ামু—স্বামী-স্ত্রীব পারস্পরিক সহযোগিতায় তাদের মধ্যে প্রেম ও ভক্তির বন্ধনে দাম্পত্য জীবনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তারা। দীর্ঘাঙ্গ, টিপ্‌টপ্‌, একটু আড়ষ্ট কিন্তু ধনী স্বামী, শান্তশিষ্ট ঝামেলা-বিহীন ছোটোখাটো মানুষ বউটি, বিশালাকৃতি স্বামীর পাশে ক্ষীয়মাণ ছায়ার মতো।

যখন সে মেয়েটিকে বিয়ে করে তখন সে ছিল কপর্দকশূন্য, ঘোর বর্ষার দিনের জন্যও তার সামান্য সঞ্চয় ছিল না, কারণ তখন সে একটা সাহেবদের খামারের দুধের ফেরিওয়ালা, আয় মাসে ত্রিশ শিলিং—তখনকার দিনের পক্ষে মোটা মাইনে বটে, তবে মাসের প্রথমে মদের খবচে তা উবে যেত। জোয়ান তখন, কোনো কিছুরই তোয়াক্কা রাখত না, শক্তি ও সম্পদের আশঙ্কা তার আদৌ ছিল না; অবশ্য চাকুরেদেব সম্মিলিত দাবি ও প্রতিবাদে সে অংশ নিত, তাদেব হয়ে চিঠিও লিখে দিত সে। দু-চাবটে খামাব থেকে বিপজ্জনক ও নাশকতামূলক কর্মী হিসেবে সে বরখাস্তও হয়েছিল। কিন্তু ওব মন টানত সম্পূর্ণ অন্য জিনিস—খেলাধুলা। বুক ফুলিয়ে নিজের র‍্যালে সাইকেল চালিযে বেড়াত, পুরোনো রেকর্ডের গানের সুবে শিস দিতে দিতে আর জিম্ রজার্স-এব গলা কাঁপানো নকল করতে করতে। মাঝে-মাঝে মোলো টাউনশিপে সাইকেলে চড়ে সপ্রশংস জনতার সামনে কসরত দেখাত, সাইকেলের ওপর শুধু বাঁ পায়ে ভর দিযে দু'হাত ওড়বার ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দিত, অথবা উল্টোদিকে পেডাল করে সাইকেল চালিয়ে বাচ্চাদের খুব হাসাত। সাইকেলটা পুরোনো ছিল, তবে চড়া রকমের লাল সবুজ এবং নীল রঙ লাগিয়ে সে তাকে বাহারের করেছিল। তাছাড়া ঘরে তৈরি হেডল্যাম্প ও রিফ্লেক্‌টার আর পেছনের সিটের সঙ্গে আটকানো একটা সাইনবোর্ডও আঁটা ছিল; তাতে লেখা—"আমাকে ওভারটেক্ করলে সম্মুখেই কবর।" সাইকেলের কসরত ছাড়া নানা চরিত্র এক্‌টো করে দেখানোও ছিল তার কাজ, সাহেব-বসদের নকল করা, তাদের কথা বলার, হাঁটবার ভঙ্গি নিয়ে বিদ্রূপ করা, তাদের নানা ধরনের মুদ্রাদোষের অনুকরণ, কালা আদ্‌মিদের প্রতি তাদের ব্যবহার—সব সে নকল করে দেখাত। এমনকি যেসব দেশবাসী সাহেবদের নকল করত তারাও বাদ

পড়ত না। মাঝে-মাঝে সে নাচ ঢুকিয়ে দিত—নাচত ভালই—মোয়েমৃবোকো নাচের সময় হাঁটুর ওপব ইচ্ছে করে ছেঁড়া ফাঁক দিয়ে পায়ের অনাবৃত অংশে গুণগ্রাহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, ভিড়ের মধ্যে অল্পবয়সী মেয়েরা নিশ্বাস ফেলত।

এভাবেই সে প্রথম মিরিয়ামুব হৃদয় হবণ করে।

প্রতি রোববার বিকেলে কোনো না কোনো ফাঁক পেলেই মিরিয়ামু ছুটে যেত বাজারের চত্বরে, সেখানে উৎসুক ভক্তবৃন্দেব দলে সে মিশে যেত। ওযাবিউকিব খেলা দেখে, অল্পের জন্য বেঁচে যাওযাব কাযদা দেখে তার উত্তেজনা ওঠানামা করত, ওব কটিদেশের নাচের তালেব সঙ্গে মিবিযামুব হৃদযকম্পনেব তাল মিলে যেত। এই গ্রস্ত উপত্যকায় যারা ডেরা বেঁধেছে তাদের তুলনায় মিরিয়ামুর পরিবারের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। ওর বাবা ডগলাস্ জোন্‌স্ ছিল শহরের গোটাকয়েক মুদির দোকান আর চাযের স্টলের মালিক। বাপ-মা খুবই ধর্মভীরু, প্রতি রোববার তাবা গির্জায় যেত, সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিল প্রার্থনা। সন্ধে এবং রাতের খাওয়াব আগেও তা কখনো বাদ পড়ত না। আশপাশের শ্বেতাঙ্গ খামাব মালিকরা তাদের বেশ নেকনজরে দেখত, জেলা অফিসার আসা-যাওয়ার পথে ঢু মারতেন। ভাল ক্রিশ্চান পবিবার—তাদের মেয়ে একটা হতচ্ছাড়া গরিবকে বিয়ে করবে, এটা ভাবতেই পারত না তারা। কী দেখেছে মেয়েটা ঐ মুরেবিটার মধ্যে? মেয়েকে তারা রোববারে ঐ বিধর্মীদের হল্লাগুল্লা পুতুলপুজোর মধ্যে ভিড়তে বারণ করত। কিন্তু মিরিয়ামু বরাবরই স্বাধীনচেতা। ছেলেবেলা থেকেই রোববারের ধর্মোপদেশ শুনেছে—পিতা-মাতা ও শাসককে মানিয়া চলিবে—রেভারেন্ড ক্লাইভ শোমবার্গের চিরাযত গ্রন্থ 'আফ্রিকানদের নিমিত্ত ব্রিটিশ সহবৎ' পড়েছে। এদিকে ওয়ারিউকি—তার র‍্যালে সাইকেল, তার শিস দেওয়া, ঢোলা প্যান্ট আর দেহের বাঁধন ছেঁড়া নাচ তাকে ডগলাস্ জোন্‌সের বন্ধ্যা জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যেত, সেখানে দিগন্তের নিযন-আলো-করা নগর হাতছানি দেয়। অবশ্য একদিক থেকে তার মনে সংশয় থাকে, ওর নোংরা তালিমারা প্যান্ট একটু খারাপ লাগে, তবু তাব পিছু পিছু ওর মন ধায়, নিজের দৃঢ়তায় নিজেই অবাক হয়। জোন্‌স্ ওকে একটু প্রশ্রয়ও দেয়, প্রাণ দিয়ে সে মেয়েকে ভালবাসে, যাতে মেয়ের ভাল হয় তাই তার ধ্যান-জ্ঞান। ঐ অর্ধশিক্ষিত অপদার্থ হঠাৎ-বাবুদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না। বিশেষত খামারের নিয়মবাঁধা শান্তি ও সচ্ছলতার জীবনকে ওরা বিপন্ন করে। বোয়ানা জেলা অফিসার প্রায়ই ওদের কথা বলেন, হামেশাই জেলে পুরতে হয় ওদের। লোভী ওরা, সাদাসিধে নিরক্ষর শ্রমিকদেরকে সাহেবদের আর মিশনারীদের ওপর ক্ষেপিয়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করে ওরা। ওয়ারিউকিকে সবদিক থেকে 'ওদের টাইপ' মনে হতো।

একদিন হবু জামাইকে ডেকে পাঠাল সে, পয়সাকড়ি কেমন করেছে যাচাই করার জন্য। ওয়ারিউকির হাঁটু দুটো একটু ঠক্‌ঠক্ করে উঠল, ঐ সব খ্রীস্টান খামারওয়ালাদের ওর কেমন ভয় ভয় করত—প্যান্টের বাঁ পা-টা মেরামত করে, চুল ব্রাস করে একটু ভব্যসব্য হয়ে সে হাজির হলো। দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখল ওকে, বসবার জন্য কোনো চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হলো না, পা থেকে মাথা অব্দি তাকে পরখ করা হলো। বেচারা ওয়ারিউকি অপ্রস্তুত হয়ে একবার দেয়ালের দিকে, একবার মিরিয়ামুর দিকে বোকার মতো

তাকাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একটা চেয়ার পেয়ে বসে সোজা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল, গণ্যিমান্যি লোকদের, মিরিয়ামুর বাপ-মা'র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির দিকে চোখ ফেরাতে পারল না সে ; কিন্তু তবু তাদের জ্বলন্ত দৃষ্টি ও ধিক্কার সে সর্বাঙ্গে বোধ করতে লাগল। ডগলাস্ জোনস্ অবশ্য খ্রীস্টীয় মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। 'আমাদের হলো গিয়ে হবু জামাই'-এর জন্য চায়ের ব্যবস্থা ছিল। 'কি কাজ করা হয়? দুধেব বোতল ফেবি? তা ভাল, ভাল; কেউ ত আর ধন সম্পত্তি নিয়ে জন্মায় না—ভাগদ দিযে তা পেতে হয় জানই ত—তা এখন ত বযস কম—তা কত পাওযা হয ? মাসে ত্রিশ শিলিং? সে যাক্, অনেকেই এর চেযে খাবাপ অবস্থা থেকে আরম্ভ কবে ভালো পয়সা করেছে ; আসল সম্পদ ত প্রভু দেন, ঐ স্বর্গ থেকে জানই ত।'—এধরনের কথাবার্তা শুনে ওয়ারিউকি মনে বল পেল, এমনকি সাহস করে সে বুড়ো ডগলাসের দিকে চেয়ে একটু হেসেও ফেলল। চোখের দিকে চেয়েই বুঝল এবারে মৃত্যুবাণটি নিক্ষিপ্ত হবে, চট করে দেযালের দিকে মুখ সবিয়ে নিল সে। বাণটি খুব নিষ্ঠুর হলো না, তবু তার তীক্ষ্ণ লোহা বেশ কেটে চেপে বসল। এত কম বয়সে ওয়ারিউকি বিয়ে করতে চায় কেন? তা বেশ, যা তোমরা চাও, আজকালকার ছেলে। আমাদের জমানায় এমন ছিল না। তাছাড়া আজকে যুবসমাজের কি কর্তব্য তা আমরা বলবার কে? বিয়েতে আমাদের আপত্তি নেই ; কিন্তু খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। আমি আবার বলছি : এ মিলনে আমাদের সম্মতি আছে। কিন্তু বিয়ে হতে হবে পবিত্র ক্রুশের সামনে। বিধান মতো গির্জায় বিয়েতে খরচ আছে ওয়ারিউকি। স্ত্রীর ভরণপোষণেও অনেক খবচ। তাই নয় কি ? মাথা নেড়ে স্বীকার যাচ্ছ ত ? উত্তম। আজকালকার দিনে এমন বুঝের ছেলে দেখলেও ভাল লাগে। এখন যে জন্যে আমার সলাপরামর্শের সাথীদের এখানে ডেকেছি, যেজন্য তোমায় এখানে ডাকা হয়েছে, সে কথায় আসা যাক। তোমার সেভিংস অ্যাকাউন্টটা দেখাতে হবে। ইয়ংম্যান, পোস্টাপিসেব পাসবইটা সমবেত গুরুজনদের দেখাতে পারো?

বিধ্বস্ত হলো ওয়ারিউকি। সমবেত বয়স্কদের ঘোব লাগা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। তারপর মিরিয়ামুর মায়ের দিকে অসহায চোখে তাকাল। কিন্তু সে কিছু দেখতে পেল না। গরুর পুষ্ট বাঁট, তার সাইকেল, গণ্যিমান্যি মানুষের ভিড়, চায়ের স্টল আর বিযার বারের নিরাপত্তা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি দূরে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াল। শিকারের পশুর মতো কোণঠাসা মনে হলো নিজেকে ; উদ্গ্রীব আকাঙ্ক্ষায় শিকারীরা হাঁপাচ্ছে যেন। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে, দৃষ্টি ঘোলাটে। ডগলাস্ জোন্সের 'মেয়েকে ত আমি কষ্টে পড়ে তার জীবন নষ্ট হতে দিতে পারি না'—গানের কলির মতো মধুমাখা ঐ স্বর কানে অস্পষ্ট বাজতে লাগল। মরিয়া হয়ে ওয়ারিউকি খোলা জায়গার খোঁজে দরজার দিকে তাকাল।

ছাড়া পেয়ে বাঁচল শেষমেশ, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। তখনও গা একটু কাঁপছে, কিন্তু নিজের চেনা জগৎটাতে ফিরে এসে সে বেঁচে গেল। কী যেন একটা বদল ঘটে গেছে মনে হলো, ঠিক আগের মেজাজটা যেন নেই। মিরিয়ামু ওর পিছু পিছু এসেছিল ; ক্ষণিকের জন্য ওয়ারিউকির মনে হলো, ডগলাস্-এর ওপর এক হাত নিয়েছে সে।

ওরা পালিয়ে গেল, ইলমোরোগের বনে একটা কাঠগোলায় চাকরি পেল সে। রোজ

ভারতীয় মালিকদের গালিগালাজ শুনে সে তার ডেরায় ফিবে যেত। ক্রমে সে–সব অপমান হজম করতে অভ্যস্ত হলো ওয়ারিউকি। করাতের গতির সঙ্গে তাল রেখে সে গান গাইত। নিজের মনেই সে বনের গাছ আর করাতকে নিয়ে গল্প বানাত, সব গল্পেরই শেষ হতো করাত আর গাছেব গুঁড়ির মর্মান্তিক বিবাহ দিয়ে ; কাঠের গুঁড়ো গায়ে–মাথায় ছড়িয়ে পড়ত, কিন্তু তবু মনের ভাব লাঘব হতো কিছুটা। উঁচু থেকে যখন গুঁড়িতে করাতের আক্রমণ চালাত, শরীর চলত স্বচ্ছন্দে আগুপিছু, সঙ্গে গাইত ডেমি–না–মাথানিব গান, বহুকাল আগে যে ইলমোরোগ–এব চেয়ে ঘন বনজঙ্গল কেটে সাফ করেছিল বসত করবে বলে।

মিবিয়ামুর কানে মাতাল বাতাসেব ফিস্‌ফিসানি ছাপিয়ে সে গান ভেসে আসত, সুরের ওঠানামার তালে তার মন নাচত। প্রভু আমার, বাবার গির্জার গানগুলোর গোঙানির থেকে এ সুর কত, কত আলাদা! ভেবে মিরিয়ামুর অন্তরটা ভরে উঠত। শনি-বোববার ওয়ারিউকি তাকে বনে নিয়ে যেত নাচতে। নাচগানের শেষে ফেবাব পথে ঘাসের ওপর সুবিধাজনক স্থান বেছে নিয়ে রমণে রত হতো তারা। সেই সব চরম সুখের রাতে মিরিয়ামুর নিতম্বে কাঁটার খোঁচা আনন্দের শিহরণ জাগাত। ওয়ারিউকির সোহাগ তার কণ্ঠে গোঙানি আনত, জ্বলন্ত তরবারিতে বিদ্ধ হবার সময়ে সে তার মাকে, তার কল্পিত বোনদের ডাকত, 'রক্ষা করো'!

ওয়ারিউকিরও সুখের সীমা ছিল না। ব্যাপারটা তার ভেল্‌কির মতো মনে হতো, সামান্য একটা রাস্তার ছেলে, পিতৃহীন, (প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের হয়ে জার্মান টাংগানিইকায় পল্টনদেব বন্দুক আর রসদ বইতে গিয়ে পিতা নিহত হয়।) তার ভাগ্যে এমন এক উঁচু সমাজের মেয়ের দুর্লভ প্রেম ! সে যেন আর আগেকার ওয়ারিউকি নয়। লিমুরুতে হিমের হাওয়ায় বা গা পোড়ানো রোদে পাইবেথ্রিয়াম ফুল সংগ্রহ করা থেকে মোলোতে দুধ–বিলির কাজ পর্যন্ত কত কী করেছে সে ; তাই বসে বসে ভাবত। ডগলাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাতে এসে তাব স্মৃতিচারণ থেমে যেত। সেদিনের কথা সে ভুলতে পাববে না। মিবিয়ামু ও তার মা'র চোখেব সামনে ঘরঘব করে হেসে ডগলাস্ ও তার বন্ধুদের তার পৌরুষকে তুচ্ছ করবার মুহূর্তগুলো ভোলবার নয়। কখনই নয়। দেখিয়ে দেবে তাদের। ওদের মুখের ওপর সে হাসি ফিরিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার গানে বেসুরো পর্দা লাগল একটা ; অপূর্ণ আশা, অসাধিত প্রতিভার অস্বস্তির স্মৃতি। করাতের ঘস্‌ঘস্ শব্দের মতো কর্কশ হলো তার কণ্ঠ, লোভী হিংস্র চিৎকারে আকাশ ফাটাল সে। চাকরি ছেড়ে মিরিয়ামুকে নিয়ে ফিরে এল লিমুরুতে।

মিরিয়ামুকে নিজের বুড়িমা'র কাছে রেখে সে উধাও হয়ে গেল। এই শোনা গেল সে আছে নাইরোবিতে, এই মোম্‌বাসায়, নাকুরুতে, এই কিসুমুতে, এমনকি উগান্ডার কাম্‌পালাতেও। গুজব শোনা গেল নানারকম। সে নাকি জেল খাটছে, একটা মুগান্ডা মেয়েকে বিয়েও করেছে নাকি। মিরিয়ামু অপেক্ষা ছাড়ল না। ইল্‌মোরোগ বনের সুখের দিনগুলো সে মনের মধ্যে লালন করতে লাগল, ব্যথামাখা আনন্দের মুহূর্তগুলো মনে করে লিমুরুর জুন–জুলাই মাসের দারুণ শীতের রাত শূন্যশয্যায় কাটাল বিনিদ্র হয়ে। বাপ–

মা তাকে ত্যাগ করেছে, অবশ্য তাদের কাছে ফিরে যাবার কোনো বাসনা তার নেই। তার শরীরে সে যে-বীজ বপন করে গেছে তারই উত্তাপ তার সারা দেহে ছড়িয়ে গেছে। যথাকালে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো। সে তার বুড়ি শাশুড়ির সরল সাহচর্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেল। উড়ো খবর এল কত, সাহেববা নাকি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে, গোলাবারুদ মজুত করছে, আর কালা আদ্‌মিদের, এই মাটির সন্তানদের, ধরে ধরে পাঠাচ্ছে তাদের হয়ে যুদ্ধে জবাই হতে। এ কি সত্যি হতে পারে? তারপর একদিন ওয়াবিউকি ফিরে এল, মিবিযামু দেখল মানুষটা কেমন বদলে গেছে। আগের চেয়ে কথা কয় কম ; তাব গান, তার সুরেলা শিস্? দিন সাতেক ছিল সে। তারপর একদিন বলল, যুদ্ধে যাচ্ছি। মিরিযামু বুঝতে পারল না, কেন এমন ধারা? কেন এই ঘুরে বেড়াবার মোহ? কিন্তু তবু অপেক্ষায় রইল সে, আর খেতের কাজ চালিয়ে গেল আগের মতো।

ওয়ারিউকির মনে তখন একটাই গোঁ, মন থেকে ডগলাসের সেই অপমানের স্মৃতি মুছে ফেলা, সেই সব ঘৃণাভরা দৃষ্টির দুষ্টু আত্মাকে বিনাশ করা। মিশরে, প্যালেস্টাইনে, বার্মাতে, মাদাগাস্কারে সে লড়ল। কালো মানুষের পক্ষে এ যুদ্ধের মানে কি–তা সে তলিয়ে দেখল না, যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো চিন্তাকেই মনে স্থান দেয় নি সে। সে শুধু চাইত যুদ্ধের আশু অবসান, আবার যাতে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। ক্ষতি কি যদি সে যুদ্ধে লুট করা ধনের ভাগ নিযে ঘরে ফেরে? কেনিয়া কলোনির সব শহর হন্যে হয়ে ঘুরেছে সে, নতুন কবে জীবন শুরু করবার সুযোগ জোটে নি, এবার তা মিলতে পারে। চাই কি একটা ভাল চাকরি জুটেও যেতে পারে। বদমাস জার্মানদের হারাতে পারলে চাকরি-বাকরি, টাকা-কড়ি দেবে বলেছে ইংরেজরা। যুদ্ধের পর সে লিমুরুতে ফিরে এসেছে, শরীর একটু রোগা হয়েছে, কিন্তু মনের বল অটুট। ফেরার কয়েক সপ্তাহের পর, মিরিয়ামু ওর মধ্যে পুবোনো আগুনের ফুলকি দেখতে পেল, জড়িয়ে ধরল তাকে নিবিড় করে। যুদ্ধ নিয়ে খানিক ঠাট্টা মস্করা করল ওয়ারিউকি, ছেলেকে শোনালো কয়েকটা ফৌজি গান। আবার একটি সন্তানেব অঙ্কুর জন্মাল মিরিয়ামুর শরীরে। আবার একটা চাকরি জোটাবার চেষ্টা করল সে, লিমুরুর জুতো ফ্যাক্টরিতে নাকি ধর্মঘট চলছে। সব কর্মীকে বেমালুম ছাঁটাই করা হয়েছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কিছু রৌপ্যমুদ্রা উপায় করার জন্য ওয়ারিউকি এবং আরো কয়েকজন কাবখানার বন্ধ গেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধর্মঘটী কর্মীরা তাদের বেইমান বলে গালাগালি দিল, গেটে পিকেট করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হেলমেট পরা পুলিশ ডাকা হয়েছিল, ব্যাটনের গুঁতোয় তাদের তারকাঁটা ঘেরা কম্পাউন্ডের বাইরে বার করে দিয়ে তারা নতুন কর্মীদের আগলে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দিল। ওয়ারিউকি ওদের সঙ্গে গেল না। কি কপাল নিয়ে জন্মেছিল সে! যুদ্ধ থেকে ফেরা বেকার পল্টনদের সঙ্গে সে নাইরোবির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো। চাকরিই বা কোথায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারই বা কোথায় ; 'সুমহান' ইংরেজ এবং 'শয়তান' জার্মানরা হেসে হেসে করমর্দন করলেন, কালা আদ্‌মিদের চাকরি দেওয়া হলো না কেন, তা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। পুমওয়ানি, কারিওকর, শাওরি মোয়োতে সবাই জমায়েত হলো 'জবাব চাই' বলে, সে সে-দলে ভিড়ল না। যুদ্ধের আগে শ্রমিকদের সঙ্গে দলবাজি করার কথা মনে পড়ে গেল,

ওসবে কোনো ফায়দা হয় নি। এদের এইসব চেষ্টায়ও কোনো লাভ হবে না। তখনকার কথা মনে পড়ে তার লজ্জা হতো ; তখন লোফারের মতো ঘুবে না বেড়িয়ে সে যদি একটু উজ্জুগি হয়ে ভাল একটা কাজকর্মের হদিস পেত, তবে মিরিয়ামু ও তার মা'র কাছে তাকে অতটা অপমানিত হতে হতো না। ছোকরাদের মিছিল, আর্জি, বন্দুক,, শাদাদের পিটিয়ে দেশছাড়া কববাব গরম গরম কথা, এর সঙ্গে ওয়াবিউকিব ভাবীজীবনের কল্পনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নিজেব পথ নিজে কেটে নিতে হযেছে ওকে। ফিবে এসে বুড়ো ডগলাস্ জোন্সেব মুখের ওপর ঘৃণাভরে তার বড়লোক হবার খবরটা ছুঁড়ে মারবে— এই ছিল তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বছরের পর বছর পার হয়েছে, অপমানের স্মৃতি তখনই প্রখরতর হয়ে তার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে তাব। জমিজমা-সম্পত্তি, ব্যবসাপাতির আসল মালিক শাদারা আর ভারতীয়রা—এ কথা তার কখনও মনে হয় নি। তার চোখের সামনে শুধু ডগলাস্ জোন্সের ছাই রঙয়ের সুট, ওয়েস্টকোট, টুপি পরা হাতে ভাঁজকরা ছাতা ধরা মূর্তিটা ভেসে উঠত। মানুষের বড়মানুষ হবার চাবিকাঠিটা কী? কী সেটা ? এখানে-সেখানে এটা-সেটা কাজ করল সে, বাহাটির খোলাবাজারে মাল নিয়েও বসেছিল। ইন্ডিয়ান বাজার থেকে পেন্সিল, রুমাল পাইকারি দরে কিনে খুচরো বেচে কিছু লাভ তার হয়েছিল। কিন্তু এটা কি একটা জীবিকা হলো ?

নিজের জিজ্ঞাসার জবাব জুটবার আগেই মাউ মাউ বিদ্রোহ শুরু হলো। কাতারে কাতারে বেকার সমেত মজুরদের নাইরোবির রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ পোরা হলো। কোনোক্রমে জালছুট হয়ে সে লিমুরুতে পালিয়ে এল। রাগে গা জ্বলে যেতে লাগল তার, শাদাদের বা ভারতীয়দের ওপর নয়, নদীপাহাড়ের মতো তাদেরও দেশের অঙ্গ হিসেবেই নিয়েছিল সে, রাগ হতো তার জাতভাইদের ওপরই। এমন করে অশান্তি ডেকে আনার মানে হয়? সবে ব্যবসা থেকে দু'পয়সা হচ্ছে, তখনই এসব ঝামেলা পাকানো ? ব্রিটিশরা যে বলত—শিগগির কালোদের বরাত খুলবে, তাদের সুদিন আসবে—এবার তার সে বিষয়ে সন্দেহ হতে লাগল। বছরখানেক ধরে সে হাঙ্গামা থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে রইল ; অপমানের বদলা নেবার গোঁ নিয়ে দিন কাটাল কতক। তারপর কেমন করে বিদেশি শাসকদের ফ'রে হয়ে গেল। ক্যাম্পের বন্দিদশা আর বনবাদাড়ে হারাউদ্দিশে ফেরার হাত থেকে এইভাবে বেঁচে গেল সে। ফ'রেগিরির সুফল দেখা দিল অচিরে। বিদ্রোহে যোগদানকারীদের জমিজমা বিদেশি সরকার কেড়ে নিল, ছোট হলেও তার ক্ষেতটি অটুট রয়ে গেল। স্বামী বা ছেলে যখন হয় জেলে পচছে, না হয় বনেজঙ্গলে জান দিয়ে লড়ছে, তখন বহু নারী ও বৃদ্ধের জমি কন্সলিডেশন-এর নাম করে কেড়ে নেওয়া হয়, সে সুযোগে ওয়ারিউকি ও অন্যান্য ইংরেজ-চেলার দল বাড়তি জমি বাগিয়ে নেয় ; ওয়ারিউকি লোকটা খুব নির্দয় ছিল না, শুধু এই দুঃস্বপ্নের অবসান ছিল তার কাম্য, যাতে আবার সে নিজের ব্যবসাটি চালু করতে পারে ; মন থেকে ডগলাসের অপমানের স্মৃতি ও কখনও ভুলতে পারে নি ; নিজের জিব দিয়ে নিজের দাঁত ব্যথাকে সযত্নে লালন করার মতো সে তার অপমানের ব্যথাকে লালন করত।

মারালাল থেকে জোমো কেনিয়াট্টা বাড়ি ফিরে এলেন। ওয়ারিউকি একটু ঘাবড়ে গেল,

মেজাজটা একটু দমে গেল তার। বিজয়োৎসবে সাহসী বীরদের মধ্যে তার স্থান হবে কোথায় ? হায়রে ! কোথায় সেই ভূমি-আলো-করা শ্বেতকায়দের দল ? তবু আসন্ন স্বাধীনতার পটে ওয়ারিউকির সত্যিকাবের পুরস্কার মিলল ; বিদায়ী ঔপনিবেশিক সরকাব তাকে মোটা টাকাব একটা ঋণ দিয়ে গেলেন। মোটবচালিত করাত কিনে সে কাঠেব ব্যবসা শুরু করল।

স্বাধীনতার পব কিছুদিন পর্যন্ত ওযারিউকিকে ভযে ভয়ে থাকতে হতো; ক্যাম্প থেকে, বনাঞ্চল থেকে ফিবে আসা সংগ্রামী মানুষগুলো তাকে আব তাব ব্যবসাকে টিকতে দেবে কি না এই নিয়ে তার সংশয় উপস্থিত হলো ; কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না, যাবা ফিরে এল তাবা বড় ক্লান্ত। বৈধ সংগ্রামের সার্থক সমাপনেব পব প্রতিহিংসা নেবাব কথা তাদের মনে স্থান পেল না। ওয়ারিউকির ব্যবসা নির্বিঘ্নে বেড়ে চলল। উহুরু যোদ্ধাদের তুলনায সে ত কযেক ধাপ এগিয়েই ছিল এ ব্যাপারে।

যিশুব প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে গির্জায় যোগ দিল। প্রভু তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ; মিবিযামুকেও দলে টানল, ক্রমেই গির্জা-হাজিরাব ক্ষেত্রে ওরা আদর্শ জুটি বলে গণ্য হলো।

কিন্তু মিরিয়ামুর প্রার্থনা ছিল ভিন্ন, সে তাব স্বামীকে নিজের করে ফিবে পেতে চেয়েছিল। ছেলে দুটো সিরিয়ানা সেকেন্ডারি স্কুলে কোনোমতে ঠেলেঠুলে উঠেছিল। সেজন্য মিরিয়ামু প্রভুকে ধন্যবাদ জানাত অষ্টপ্রহর। তবু সে তার সেই আগেকার ওযারিউকিকেই ফিরে পেতে চাইত সর্বদা। এমার্জেন্‌সির সময় সে প্রায়ই ওয়ারিউকিকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা বিষয়ে সাবধান করত। তার গান, তার নাচ, তার সহজ সরল হাসি কোথায় গেল! চোখের দৃষ্টি কেমন কঠিন, অনড়—দেখে মিরিয়ামুব ভয় হতো।

গির্জাতে সে আবার গান গাইতে শুরু করল। যেসব সুর একদিন তার মনকে জয কবেছিল, সেসব নয়—পরিচিত সেই করুণ প্রার্থনা-গীত। বিশ্বাসীর কানে যিশু নামটি কী মধু ঢালে! কয়ারে সে পয়লা নম্বর গায়ক হয়ে উঠল। সে প্রায়ই ড্রামও বাজাত, স্বাধীনতার পর সেসব ড্রামকে আফ্রিকান সংস্কৃতিকে পিঠ চাপড়ানোর জন্য গির্জাতে প্রবেশের অনুমতি দেওযা হয়েছে। প্রায়ই ব্যাপ্টিজমের ক্লাস করত সে, এবং যেদিন সে ওয়ারিউকি নাম ফেলে ডজ্ ডব্লিউ লিভিংস্টোন নাম গ্রহণের অনুমতি পেল, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত রচিত হলো, সেদিন থেকেই সে প্রথম সারিতে বসবার অধিকার পেল। ব্যবসার উন্নতির ধাপে ধাপে সে ক্রমশ চার্চে পদোন্নতি করতে লাগল।

অন্যসব দিকের খবরও ভালই। শ্বশুরমশাই তখনও মোলোতেই আছেন, অবস্থা পড়ে গেছে। ওকে অবশ্য তাঁরা তখনও ক্ষমা করেন নি। তবে তার প্রতিপত্তি দেখে সুর পালটেছেন ; তাদের মেয়ে একবার বাপের বাড়ি আসতে পারে কি? মিরিয়ামু অবশ্য সেসব কথা শুনতে চাইত না। কিন্তু ডজ্ লিভিংস্টোন ক্রুদ্ধ হয়ে বলত, 'মিরিয়ামু, কোথায় তোমার খ্রীস্টান ক্ষমাপরায়ণতা'? সে জোর করতে লাগল মিরিয়ামুর ওপর, বাধ্য হয়ে মিরিয়ামু রাজি হতো। লিভিংস্টোন খুশি হতো, কিন্তু এতে তার পুরোনো ক্ষতের ওপর কোনো প্রলেপ পড়ত না। বদলা নেওয়া বাকিই রয়ে গেল।

লিমুরুই তার প্রধান কর্মকেন্দ্র হলেও তাকে কাজের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে

হতো। তাব লাইনের লোকদের সঙ্গে চেনা-পবিচয বৃদ্ধি পেল। সেটা ছিল এশিয়ান হটাও-এব বছর। চিওনা মার্চেন্টরা কেনিযার নাগরিক ছিলেন না, তাদের লাইসেন্স বাতিল কবা হবে ঠিক হলো। ওরা চট করে লিভিংস্টোনকে আধাআধি শেয়ারে অংশীদার হতে বলল। প্রভুর বন্দনা গাও, তার নাম উর্ধ্বে ধ্বনিত হোক! ভগবান ত আর ঘুষ খান নি! এক বছবের মধ্যে তার সঞ্চয বৃদ্ধি পেল, সেই টাকায় সে লিমুরুতে একটা বিরাট খামাব কিনে ফেলল, স্বাধীনতাব আগে সেটা ছিল সাহেবেব সম্পত্তি। লিভিংস্টোন এখন বিরাট কাঠ ব্যবসায়ী ; গির্জাতেও তাব আবো পদোন্নতি ঘটল।

মিবিয়ামু এখনও তার ওয়াবিউকির জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু সে আদর্শ স্ত্রী। লোকেরা সাচ্চা যিশুভক্তি আর অটল পতিভক্তির জন্য তার গুনগান করতে লাগল। পুরোনো স্বপ্নের মোহ থেকে মুক্ত করবাব জন্য সে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাত। হাবভাবে তার কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। জুতো পরা পর্যন্ত সে ছেড়ে দিল। বোজ সকালে সে তাব কিযোন্ডো নিযে খামাবে যেত, অন্য শ্রমিকদেব সঙ্গে একযোগে চা পাতা তুলত। নিজের পুরোনো ছোট জমিটাকে সে ভোলে নি। মাঝে-মধ্যে শ্রমিকদের জন্যেও লাঞ্চ আর চা তৈরি করত। ওর স্বামী এতে খেপত খুব ; এভাবে লোকের সামনে তাকে অপমান করবার অর্থ কী? আদর্শ খ্রীস্টান ভদ্রমহোদযাব মতো আচরণ সে কিছুতেই কবে না কেন? সে নিজে ত শত হলেও খ্রীস্টান ঘবেবই মেয়ে। এখন তার কুলিদের সঙ্গে মিশে, খেটে হাত ময়লা করার অর্থ কি? পোশাকেব ব্যাপাবে সে স্বামীর আদেশ মেনে নিল ; জুতো পায়ে দিতে রাজি হলো সে, গির্জায় যাবাব সময মাথায় সাদা টুপি পরতেও আপত্তি করল না সে। কিন্তু কাজ করার প্রবৃত্তি তার মজ্জায় মজ্জায, সেটা সে ছাড়তে পারল না। মাটির স্পর্শে এক অদ্ভুত স্বাদ আছে ; শ্রমিকদের সঙ্গে খোলামেলা কথাবার্তায়ও সে সুখ পেত।

ওরা ওকে ভালবাসত, কিন্তু ওর স্বামীকে পছন্দ কবত না। লিভিংস্টোন ওদের কুঁড়ের দল বলে অবজ্ঞা করত। আমার মতো জান দিয়ে খাটতে পাবে না কেন এরা? কোন্ মালিকের বউ শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যায়? মিরিয়ামু ওদের লাই দিয়ে মাথায় তুলছে, একদিন সে তা বলেও ফেলল। মাঝে-মধ্যে সে তাদের মুখে চাপা রাগ দেখত। তখন তার এমার্জেনসির দিনগুলো মনে পড়ে যেত, কিংবা আরো আগের চিওনা মার্চেন্ট ফার্মে কাজ কববাব সমযকার অপমানকর দিনগুলোব কথা। ক্রমে সে প্রার্থনার মন্ত্রে তাব অশান্ত মনকে ঠাণ্ডা করত। তাদের নীরব ঘৃণা সম্পর্কে সে সচেতনই রয়ে গেল, তবে তাকে সে গরিব আর অকর্মণ্যের ধনীদের প্রতি স্বাভাবিক ঈর্ষা বলে ব্যাখ্যা করল।

ওদেব মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হতো মিরিয়ামুকে দেখলে। তাদের মনের দরজা-জানালা খুলে যেত, হাসিঠাট্টা-গানে মেতে উঠত তারা। ক্রমে তাদের জীবনের অন্দর মহলে মিরিয়ামুর পথ করে দিল তারা। ওরা একটা গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল—যিশু গরিবদের জন্যই যন্ত্রণা সয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন—এই ছিল তাদের বিশ্বাস। সংঘের নাম ছিল 'দুঃখের ধর্ম'। স্বামী ব্যবসার কাজে বাইরে গেলে মিরিয়ামু ওদের প্রার্থনাসভায় মাঝে-মাঝে যেত। অদ্ভুত নরনারীর সমাবেশ ; নিজেদের বাঁধা গান নিজেরা গাইত, সঙ্গে বাজত ড্রাম, তাম্বুরিন, গীটার, আর ঘুংগুর। সে গানের তালে তার পা দুটোও আনন্দে অধীর হতো

নেচে ওঠার বাসনাতে। ঘুরে ঘুবে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে তাদেব মুখে কিসেব এক আভা ফুটে উঠত, কিসে যেন তারা আচ্ছন্ন হয়ে এক অপার্থিব বোধে সজাগ হতো শেষে। অজানা মধুব এক ভাষায় কথা বলত তাবা। মিবিযামুর মধ্যে কী যেন জেগে উঠত, ভেতবে অবরুদ্ধ জানাব আঘাতে অস্থিব হয়ে অনির্বচনীয় এক আশায় অধীব আগ্রহে সে তাব স্বামীব জন্য অপেক্ষা করত, বিধ্বস্ত অতীত থেকে কিছু পুনরুদ্ধাবেব আশায়। কিন্তু ট্যুর থেকে ফিবে এসেও সে ডজ লিভিংস্টোন জুনিয়ার এবং গির্জাব উচ্চ পদাধিকাবী এবং ধনী ভূস্বামী আব টিম্বাব মার্চেন্টই থেকে যেত। সেও আবার আদর্শ স্ত্রী বনে যেত, স্বামীব ব্যবসাপাতির লাভ-লোকসান, হিসেব-নিকেশ শুনত ; নতুন কি কন্ট্রাক্ট পেয়েছে সে, ভবিষ্যতে আবো কী পাবাব আছে এসব শুনতে হতো। রবিবার স্বামী-স্ত্রী যথারীতি যেত গির্জাতে, একঘেযে নিরানন্দ প্রার্থনাগীতি, একই বই থেকে একই প্রার্থনার আবৃত্তি, খ্রীস্টীয় ভ্রাতা-ভগিনীদেব মধ্যে একই সৌজন্য বিনিময় ; যথাবীতি চাযেব আসর আর দাতব্য উদ্দেশ্যে নিলাম— লিভিংস্টোন তাব অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সবাই বলত—'কি সুন্দব পবিবাব একটা'—স্বামী ধনাঢ্য ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী ; স্ত্রী অনুগতা, ঈশ্বর ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যপবায়ণা।

একদিন সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল—মুখে খুশি খুশি ভাব, উদ্বেগের পরিচিত বেখাগুলো নেই। চোখ আনন্দে চক্চক করছে। মিরিযামুর মনে ছোট একটা ঢেউ খেলে গেল। তার স্বপ্ন কি সম্ভব হবে? সৈনিক কি ফিরে এল? ও যে চেষ্টা করছে নিজের উত্তেজনা চাপতে— মিবিয়ামু সেটা টের পেল। কিন্তু, পবমুহূর্তেই মিরিয়ামুর মনটা চুপসে গেল। কথাটা ভাঙল ওয়ারিউকি, শ্বশুর ডগলাস্ জোনস্ ওকে নেমন্তন্ন করেছে, অনুগ্রহ করে মোলোতে যেতে বলেছে ওকে। ঝট কবে চিঠিটা পকেট থেকে বার করে সরবে পড়তে শুরু করল সে। তারপব হাঁটু গেড়ে বসে প্রভুকে তাব করুণা এবং সুবুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ দিল। একসঙ্গে আমেন বলা মিরিয়ামুর প্রায় অসম্ভব বোধ হলো, প্রভু, আমার মনকে এমন পাথর করল কিসে? আকুল হয়ে সে প্রার্থনা জানাল—আলো দেখাও!

মোলাকাতের দিন এল। উত্তেজনায় তার হাঁটু কাঁপতে লাগল। জয়ের উল্লাস সে গোপন করতে পারল না, নিজের জীবনকে তার ভগবানের অঙ্গুলি নির্দেশ বলে মনে হলো। ছিল রাস্তার ছেলে, তারপর সামান্য এক দুধের ফেরিওয়ালা ... না, তালিমারা প্যান্ট পরা, সাইকেল-এর ওপব ক্লাউনের সেই মূর্তি সে মনে আনতে চাইল না। সেদিনকার সে আর আজকের লিভিংস্টোন কি একই ব্যক্তি, সে-ই কি ঐরকম করে নিজেকে সারা শহরের হাস্যাস্পদ করে তুলত ? ডি.টি. ডোবির গ্যারাজ থেকে একটা মার্সিডিস বেন্‌স্ নিয়ে এল সে, এতে করে গেলে লোকে তাকে ভিন্ন চোখে দেখবে। নির্দিষ্ট দিনে সে একটা ওয়েস্ট কোটসহ গরম সুট পরে হাতে ভাঁজকরা ছাতা নিয়ে অকুস্থলে গেল। বলে বলে মিরিয়ামুকে গভর্নমেন্ট রোডের নাইরোবি ড্র্যাপার্স থেকে কেনা একটা যুৎসই পোশাক পরতে রাজি করাল। তার নিজের মাকেও ফ্রক আর জুতো পরিয়ে লেডি বানিয়ে তাঁকে হতবাক করে তুলল। তার দুই পুত্র স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই গেল, মুখে ইংরেজি ছাড়া কথা নেই (কিকুউ বলতে খুব অসুবিধা বোধ করত তারা, এত ভুল হতো!) ; আদর্শ পরিবারটি গাড়ি করে চলল মোলোর দিকে। বৃদ্ধ ডগলাস্ তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। বুড়ো হয়ে

জরাজীর্ণ হয়েছে শরীর, রুপোলি চুলে মাথা ঢাকা, কিন্তু শরীরে শক্তি তখনও নিঃশেষ হয় নি। লিভিংস্টোন এবং ডগলাস হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনান্তে অশ্রু বিসর্জন করলেন। আমার সন্তান, আমারই ত সন্তান ; আমারই নাতি নাতকুর ! খ্রীস্টীয় প্রার্থনায় ও চোখের জলে অতীত বিধৌত হলো। কিন্তু মিরিয়ামুর মনে অতীতের স্মৃতি অম্লান।

প্রাথমিক উল্লাস প্রশমিত হলে লিভিংস্টোনের মনেও অতীতের অপমানের স্মৃতি একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ডগলাসের ওপর যে এখনও সে কুপিত ছিল তা নয়, বৃদ্ধ তখন তেমন একটা দোষ কিছু করে নি। সে নিজে কি এখন ভাবতে পারে একটা হতচ্ছাড়া দুধের হকারের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে? তবু সে-সাক্ষাতের স্মৃতি সে চিরতরে মন থেকে মুছে ফেলবার সঙ্কল্প করল, আর তখনই, সে সেই ঘটনার মধ্যে দৈব আদেশ প্রত্যক্ষ করল, একটু কেঁপে উঠল সে, আগে একথা ভাবে নি কেন সে। শ্বশুরের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের শেষে সে প্রস্তাবটি উত্থাপন করল। এখন খ্রীস্টীয় বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করলে হয়। ডগলাস্ অবিলম্বে রাজি, বাবাজীবন যে একজন যথার্থ খ্রীস্টান এখন—সে বিষয়ে তার কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু মিরিয়ামু বেঁকে বসল, এসবের অর্থ তার বোধগম্য হলো না। বয়েস হয়েছে তার, দুই সন্তানের জননী করেছেন তাকে ঈশ্বর, এর মধ্যে পাপের প্রশ্ন আসছে কোথায়? আবার তারা দু'জন ওকে প্রাণপণে বোঝাতে লাগল। যিশুর ক্রুশের সামনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ তাদের মিলনকে পরিপূর্ণ করবে, এই তাদের যুক্তি। মিরিয়ামুর আপত্তি টিকলো না। সকলে মিলে প্রভুকে বন্দনা করলেন। ভগবানের লীলা মানুষের বোধের অগম্য।

সেই অনুষ্ঠানের আগেকার সপ্তাহ ক'টি লিভিংস্টোনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সময় বলে প্রতিপন্ন হলো। প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করতে লাগল, এমনকি উদ্বেগ ও সমস্যা থেকেও সে এক ধরনের সুখবোধ করতে লাগল। এমন দিন কি সত্যি তার জীবনে আসবে? যে ক্রুশচিহ্ন তাকে প্রভুর পথের সন্ধান দিয়েছে, তার সম্মুখে বিবাহ! নিজেকে আবার যুবক মনে হলো তার। স্বাস্থ্যে, অস্তিত্বেরই আনন্দে উজ্জ্বল হলো সে। ক্রুশকে সাক্ষী রেখে অঙ্গুরি বিনিময় তার মনের ক্ষতচিহ্নকে সম্পূর্ণ মুছে দেবে। ঝটপট কার্ড ছাপা হলো, অবিলম্বে বিলির ব্যবস্থা হলো। মিরিয়ামুকে সে টেনে নিয়ে গেল নাইরোবিতে; কেনিয়াট্টা এভেনিউ, মুইণ্ডি মুবিংগু স্ট্রিট, বাজার, গভর্নমেন্ট রোড, কিমাথি স্ট্রিট ঘুরে ঘুরে, দোকানে দোকানে ঢু মেরে শেষ পর্যন্ত মিরিয়ামুর জন্য একটা সাদা সাটিনের ফুলহাতা গাউন, একটি ওড়না, সাদা দস্তানা, সাদা জুতো-মোজা আর প্লাস্টিকের গোলাপের তোড়া কেনা হলো। রেভারেণ্ড ক্লাইভ শোমবার্গের 'আফ্রিকানদের নিমিত্ত ব্রিটিশ সহবৎ' নামক আধুনিক চিরায়ত গ্রন্থের দাম্পত্যজীবনের অধ্যায়গুলোর নিয়মাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে নিল লিভিংস্টোন—এসব ব্যাপারে যাতে কোনো ভুলচুক না হয়।

মিরিয়ামু নিজে কাউকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাল না। সে রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত, যাতে সে কোনোরকমে ব্যাপারটা সয়ে নিতে পারে। দিনটা একটা স্বপ্নের মতো এসেই চলে গেলে বেশ হতো। দু'সন্তানের জননী সে, বরের সঙ্গে 'ইলোপ' করা ছোট মেয়েটি সে ত আর নেই। বাপের বাড়ির কুমারী কনে সাজতে তার লজ্জা করছিল। কিন্তু

কিসের তাড়া খেয়ে সে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল। তবে আর অন্যের সুখে বাদ সাধা কেন? গির্জার লোকেরাও ব্যাপারটা নিয়ে খুব খুশি। এতে করে অন্যদের জন্য একটা মূল্যবান দৃষ্টান্ত রচিত হবে বলে ওদের ধারণা। মেয়েরা যারা এসেছিলেন, সকলেই একবাক্যে তার স্বামী–সৌভাগ্যের কথা বলতে লাগলেন। কয়েকজন কাঁদলেনও একটু।

দিনটা পরিষ্কার ছিল। মোলোর ঢেউতোলা মাঠ দেখা যাচ্ছিল; দৃশ্যটি মিরিয়ামুর মনে শৈশবের ব্যথাভরা স্মৃতি জাগাল। চেষ্টা করে খুশি খুশি ভাব দেখাতে লাগল সে। কিন্তু হাসতে গিয়ে চোখে জল এল তাব। এতদিনের প্রতীক্ষার, এতদিনের আশার কি ফল লাভ হলো? কুঞ্চিতচর্ম মুখ তার বাবার, কি রকম দেখাচ্ছিল তাকে! টেলযুক্ত গাঢ় রঙ–এর সুট, ওয়েস্ট জ্যাকেট আর টপ হ্যাটসহ এক বিচিত্র মূর্তি। লজ্জায় সে মুখ ফিরিয়ে নিল। আত্মসংযমের জন্য আরো শক্তির প্রার্থনা জানাল সে। পবিত্র ইল্–এর সামনে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে কারো দিকে ফিরে তাকায় নি। 'দুঃখের ধর্ম' সংস্থার সদস্যরা, তার সহকর্মীরা বাইরে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকেও সে ফিরে তাকাল না।

কিন্তু লিভিংস্টোনের কাছে ঘটনাটি জীবনের চরম মুহূর্ত বলে প্রতীয়মান। প্রতিশোধের চেয়েও মধুর। সারাটা জীবন সে বান্দার মতো কাটিয়েছে এই মুহূর্তটির আশায়, সেটি এখন সমাগত। অনুষ্ঠানের উপভোগী সাজে সে সেজেছে—গাঢ় রঙ–এর সুট, টপ হ্যাট, সমবেত বিশিষ্ট অতিথিদের যাকে দেখছে তার দিকেই সহাস্য মুখে চাইছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই এম.পি., পাদ্রী এবং ধনী ব্যবসায়ী। এক পলকেই লিভিংস্টোন বুঝে নিয়েছে গির্জা এখন ভি.আই.পি–তে পরিপূর্ণ। শ্রমিকরা এলেবেলের দলে, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। 'দুঃখের ধর্মে'র সদস্যরা লাল মদের রঙ–এর পোশাক পরা, হাতে গীটার, ড্রাম আর তাম্বুরিন। তাদের কাছাকাছি এসে লিভিংস্টোন একবার কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। পরক্ষণেই সে তাদের কথা ভুলে গেল। আজ সে সত্যি সুখী।

মিরিয়ামু ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে, সাদা ওড়না তার মুখকে আড়াল করেছে। বুক টিপ্‌টিপ্ করছে তার। মনশ্চক্ষুতে সে দেখতে পেল তার চোখের সামনে এক ঠাকুমা বিয়ের পোশাক পরে কনে সাজবার চেষ্টা করছে। শারাদ্‌ বাজতে লাগল। মিরিয়ামুর মনে পড়ল দশটি কনের গল্প—প্রভু, প্রভু, ক্রীতদাস হবার আগে আমাকে উদ্ধার করো....পাদ্রীর কণ্ঠস্বর কানে এলো, 'ডজ্ লিভিংস্টোন জুনিয়ার, মৃত্যু আসিয়া তোমাদের বিচ্ছিন্ন করিবার আগে *দুঃখে–সুখে ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?' লিভিংস্টোনের* উত্তর পরিষ্কার শোনা গেল : '*হ্যাঁ*'। এবার তার পালা ... '*মিরিয়ামু এই ব্যক্তিকে তুমি পতিরূপে...*' উত্তর দেবার চেষ্টা করল সে। গলায় আটকে গেল ... পঞ্চকন্যা ... পঞ্চকন্যা ... তোমরা ছিলে দশকন্যার মধ্যে ধীমতি ... বর এল পঞ্চকন্যা ... সমস্ত গির্জায় অপেক্ষমাণ নীরবতা।

অকস্মাৎ নীরবতা ভঙ্গ। গির্জার বাইরে দরজার দিকে ধাবিত হলো সকলের দৃষ্টি। কিন্তু 'দুঃখের ধর্মে'র সদস্যরা যেন সম্মিলিত ভর্ৎসনাকে গ্রাহ্যই করল না। হয়তো ওদেরও আচ্ছন্ন করেছিল কোনো অদৃশ্য শক্তি। ড্রাম, তাম্বুরিনে ঘা পড়ল, এক জ্যাজ–ই সুরে বেজে উঠল গীটার। চার্চের স্টুয়ার্টরা শিসধ্বনি তুলে নিষেধ করতে ছুটল তাদের, বিয়ের অনুষ্ঠান

এখনও হয় নি বলতে। ওদের কণ্ঠধ্বনি উর্ধ্ব আকাশে মুখরিত হলো, পদধ্বনিতে কেঁপে উঠল পৃথিবী।

এই প্রথম মিরিয়ামু মুখ তুলল। আবছা মনে পড়ল তার—ওদের সে নেমন্তন্নও করে নি। মোলোতে ওরা এল কী করে? অপরাধবোধ তার কণ্ঠরোধ করল। মুহূর্তের জন্য। ওতে কিছু আসে-যায় না। বিশেষ করে এখন। এই মুহূর্তে। তার চোখে আবার সেই দৃশ্য ফুটে উঠল। ক্রুশের ঠিক সামনে, যে ক্রুশে আমি আমার দেবতাকে পেয়েছি তারই সামনে বাইকটি সহ ওয়ারিউকি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেমন মোলোতে আগে থাকত,...সাইকেল চেপে সপ্রশংস জনতার সামনে কসরৎ দেখাচ্ছে সে...সকলের মধ্য থেকে তাকেই বেছে নিয়েছে সে—তার জন্য—শুধু তারই জন্য তার এই কসরত—তারই জন্য তার এই গান, এই নাচ। প্রভু, জীবনে একবার ভালবেসেছি, একবারই ভালবেসেছি। প্রভু ...। ইলমোরোগ বনের সেই মুহূর্তগুলো... তার সেই শিৎকার। ড্রাম আর তাম্বুরিনের শব্দে সেই শিৎকারেরই ধ্বনি বাজছে তার নাচের তালে দোলায়মান চিত্তে। সে তার সত্যপরিচয় আবিষ্কার করল আজ। নিজেকে তার সবল মনে হলো, গর্বে মাথা তুলে দাঁড়াল সে ... শুনতে পেল পাদ্রী প্রায় চিৎকার করে বলছে, 'মিরিয়ামু তুমি কি...' জনতা অপেক্ষমাণ। সে একবার লিভিংস্টোন ও একবার তার বাবার দিকে চাইল—কোনো তফাৎ দেখতে পেল না তাদের মধ্যে। ফিস্‌ফিস্ করে বললেও সকলে পরিষ্কার শুনতে পেল—'না'।

গির্জার ভেতবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল বেগে। ভুল শুনল নাকি সকলে? পাগলের মতো পাদ্রীমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন আবার—'মিরিয়ামু তুমি কি ...' বাইরের গান ভেতরের নীরবতাকে গাঢ় কবে তুলল। ওড়না সরিয়ে সকলের দিকে সোজা চেয়ে সে বলল, 'না আমি পারব না ... লিভিংস্টোনকে আমি বিয়ে করতে পারি না ... কারণ...কারণ ... আমার বিয়ে হয়ে গেছে আগেই ওয়ারিউকির সঙ্গে ... সে মরে গেছে।'

লিভিংস্টোন সত্যিই পাথর হয়ে গেল। মিরিয়ামুর বাবা কাঁদতে শুরু করলেন, তার মা-ও কেঁদে আকুল। সবাই ভাবল মিরিয়ামুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাই এর জন্য দায়ী করল 'স্বাধীন গির্জাগুলোকে'—ওখানে ত আসলে শয়তানের পুজো চলে! ট্রেন্‌ড পাদ্রী নেই ... ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইরের মানুষগুলো ড্রাম ও তাম্বুরিনের ধ্বনির তালে গান গেয়ে চলল, উর্ধ্বমুখ মানুষের কণ্ঠস্বর আকাশগামী।

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

দুল্‌হা □ নাদিন গর্দিমার

সড়কের ধারে তার তাঁবুতে সেদিন বিকেলে শেষবাবের মতো ফিবে এলো তরুণটি। অন্য যেকোন বাড়ির মতোই ছিমছাম, পরিপাটি তার সেই আবাস। সামনের জমিটুকু মসৃণভাবে পেটানো। তিবপলের তলায় জলের ড্রামগুলো রাখা। ভেতরটাকে মরুভূমির দাবদাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁবুর বাড়তি কাপড় দিয়ে প্রবেশদ্বারটা ঢাকা। তাঁবু থেকে তিরিশ গজ দূবে এক কৃষ্ণাঙ্গ রমণী ঝুঁকে পড়ে ভুট্টার দানা গুঁড়ো করছিলো। কালাহারির ধুলোয় ধূসরিত দু'তিনটে বাচ্চা তখন শীর্ণকায় এক কুকুরেব সাথে খেলা কবছে। বিশাল শূন্যতায় ভেসে আসা পাখিব ক্ষীণ আওয়াজের মতোই শোনাচ্ছিল তাদের গলার স্বর। সেই প্রান্তর তরুণটির আবাসটিকেও যেন শূন্যতায় গিলে নিয়েছে।

তার তাঁবুর ভেতর আগের রাতের জীর্ণ একটা শীতল হাওয়া খেলে বেড়ায়, অনেকটাই গির্জার ভেতরকার বাতাসের মতো। একপাশে লোহার খাটটা রাখা, তার ওপর পরিপাটি বিছানা, পরিচ্ছন্ন বালিশের ঢাকনা ও আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের তৈরি বিশেষ ধরনের কম্বল— কারোস্। অন্যদিকে আছে একটি টেবিল ও লাল ক্যানভাসের গদিয়লা ফোল্ডিং চেয়ার। আরো আছে তার কাপড়-চোপড় রাখার জন্য একটা চেস্ট। ওটার মাথার ওপর এলার্মঅলা একটা ঘড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ঘড়িটা রোজ ভোর পাঁচটায় তাকে জাগিয়ে দেয়। সেটার পাশেই রাখা আছে সপ্তদশী এক তরুণীর ছবি। ও'কেই বিয়ে করতে যাচ্ছে সে। বহুদিন ধরেই ঘড়ি আর ঐ ছবিটা ওখানটায় পাশাপাশি রাখা আছে। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আর সন্ধেয় কাজ থেকে ফিরে সে চেয়ে থেকেছে ছবিটার দিকে। তবে এই শেষবার সড়ক বিভাগের দশ টনি লরিটা নিয়ে কাল ভোরবেলা সে ফ্রান্সিস্‌টাউনের দিকে যাত্রা শুরু করবে। সামনের সপ্তায় সে যখন ফিরে আসবে তখন সে বিবাহিত। সঙ্গে থাকবে তার সপ্তদশী নববধূ। আর থাকবে চাকা লাগানো একটা আবাস-গাড়ি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে এমন সব বিবাহিত কর্মীদের পরিবার নিয়ে থাকার জন্য সড়ক দপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলো বরাদ্দ করে।

বিছানায় বসে বুটজোড়া খুলতে খুলতে একদৃষ্টিতে ছবির মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। মেয়েটির হাসিমুখটা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া সুন্দরী নারীদের ছবির মতো মনে হয় তার। পরনের আলখাল্লাটা খুলে ফেলে আস্তে ডাক দেয় সে, 'পিয়েত'।

গাট্টাগোট্টা সেই পিয়েত নামের কালো মানুষটা কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁবুর ভেতর এসে গিয়েছিলো। তার ভুরু দুটো সার্কাসের ভাঁড়দের মতো তোলা, যেন সে যথেষ্ট কায়দা করেই এটা করেছে। তার হাতে ধরে থাকা টিনের বড় পাত্রটায় স্নানের গরম জল। সেই জল পাত্রের দু'পাশে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মৃদু সুরধ্বনি তুলছিলো।

স্নান করে একটা পরিষ্কার খাকি জামা ও পাজামা পরে নেয় সে। চুলে সুগন্ধী তেল মেখে নিয়ে সে যখন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল তখন দিগন্তে সূর্য রক্তিম হয়ে উঠেছে। এখন শীতকাল। পাঁচটা বাজবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্তে যায়। ধূসর মাটি আবছা লাল দেখাচ্ছে, একাকার হয়ে আছে কাঁটা ঝোপের ছায়া। দূরবীনের মধ্য দিয়ে চাঁদের ভূমিকে যেমন ক্ষুদ্র গর্তবিশিষ্ট দেখা যায়, মরুভূমির মাটিকে এ মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সেরকমই দেখাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসা পৃথিবীর ফিকে আকাশে এখন সন্ধেবেলার তারাগুলো উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে। তার এবং কৃষ্ণাঙ্গ ঐ শ্রমিকদের তাঁবুগুলোর আশপাশে জ্বলন্ত আগুনের প্রায় অদৃশ্য কাঁপা কাঁপা শিখাগুলো অন্ধকার ঘন হয়ে আসার সাথে সাথে গভীর আলো ছড়াতে থাকে। এখন সন্ধ্যা।

রোজ সন্ধ্যায় পাইপে তামাক ভরতে ভরতে আগুনের দিকে আরাম করে ফিরে বসে আড়মোড়া ভেঙে শ্রমের ক্লান্তি দূর করতে করতে দিবাবসানের এই সময়টুকু উপভোগ করে সে। হঠাৎই অদ্ভুত এক উত্তেজনায় চাপা হাসির ভাব ফুটে ওঠে তার চোখেমুখে। ছবির মেয়েটিকে তার বাস্তব মনে হয়। সে যেন দেখতে পায় মেয়েটা একটা আবাস-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির পায়চারি করতে থাকে সে। পা দিয়ে কাঠের একটা টুকরো আগুনের দিকে ঠেলে দিয়ে পিয়েতকে ডাকে। তাঁবুর দিকে ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরে সরে আসে।

তার তাঁবুর শেষ সীমায় অন্য শ্রমিকরা তাদের তাঁবুগুলোর কাছাকাছি ঠাট্টা-তামাশায় মেতে আছে, এই একটা ব্যাপারে ওদের কোন অন্যথা হয় না। দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই ওরা সবাই মিলে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে। তাদের কৃষ্ণাঙ্গ শরীরগুলো পুরোটাই সাবানের সাদা ফেনায় ঢাকা। কোথাও মাথার ওপর বালতির জল ঢালার শব্দ হয়। রান্নার আয়োজনের অঙ্গ হিসেবে লোহার চক্‌চকে হাঁড়িগুলো বিরামহীন কথোপকথনের মধ্য দিয়েই এদিক-ওদিক আনা-নেয়া হতে থাকে। ওদের ৎসোয়ানা ভাষাটা খুব একটা বুঝতে পারে না সে। একটু-আধটু কোনোরকমে আদেশ দেয়ার মতো কিছু শব্দ সে জানে একাজটা সে করে পিয়েত ও অন্য দু'একজনের সাহায্যে, যারা তার নিজস্ব ভাষা, আফ্রিকান্‌স্‌, বোঝে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যাচ্ছে না। এ মুহূর্তে ওদের উচ্চারিত ধ্বনিমালা সন্ধের এ সময়টাকে আচ্ছন্ন করছে। সবসময় কাঁদে যে বাচ্চাটা, সে অবহেলার মধ্য দিয়েও কেঁদে চলেছে। কিছু উলঙ্গ শিশু একটা কুকুরকে তাড়া করছিলো। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ আর্তনাদ তাদের ফুর্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

সে ফিরে আসে। আগুনের ধারে বসে পাইপটা আবার টানতে শুরু করে।

তার স্নান করা, পাইপ টানা ও রাতের খাবার খাওয়া, এই প্রত্যেকটি পর্যায়ই সময়ের একটা নির্দিষ্ট সুতোয় বাঁধা। ও পর্যায়গুলো ঘড়ি ধরে চিহ্নিত করতে হয় না তাকে।

দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সে বুঝতে পারে কখন তার খাওয়ার সময় হচ্ছে। আজো অন্যথা হলো না। সেই নির্দিষ্ট সময়েই সে তার আফ্রিকান ভাষায় ডেকে ওঠে — 'কি হে, তোমরা আমার খাবারটা দিতে ভুলে গেলে কি?'

আবছা অন্ধকার ভেদ করে প্রতিবাদসূচক হাসি ভেসে আসে।

কিছুক্ষণ পর সে আবার ডাক দেয় — 'পিয়েত, আমার মনে হয় তোমরা সবকিছুই পুড়িয়ে ফেলেছো।'

'হু।'

'খাবার কোথায় হে?'

পিয়েত তার নিজস্ব সময়েই একটা ভাঁজ করা টেবিল আর রেড়ির পিদিম নিয়ে ঘরে ঢোকে। সে বারবার আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া-আসা করতে থাকে। কখনো-বা থালা আনে, কখনো-বা খাবার ইত্যাদি নিয়ে ফিরে আসে। আর নিজেব মনে বিড়বিড় করতে থাকে —

'তুমি কোয়েকসাস্টার্স খেতে চাইলে সকালবেলা। তা সেটা বানাতে গেলে তো আমায় তেলটা ভালো করে গরম করতে হবে। তাছাড়া আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলোও তো করতে হবে। এতে খানিকটা সময় তো লাগবেই। কিন্তু তুমি তাড়া দিচ্ছো। তা যদি হয় তো শনিবার দিন কোয়েকসাস্টার্স খেয়ো এখন থেকে। আমার হাতে সময়ও থাকে সেদিন বিকেলে। ধীরেসুস্থে রান্না করা যাবে। মনে হয় সেটাই ভালো হবে — '।

পিয়েত ভালোই রান্না করে। সবকিছুই তাকে শিখিয়ে নেয়া গেছে। 'এমন কি সে কোয়েকসাস্টার্স রান্না করতে পারে' — পিয়েত সম্পর্কে উদার প্রশংসা করেছিলো সে তার হবু শ্বাশুড়ির কাছে। সে এক কঠিন সময় গেছে তার। ঐ শ্বাশুড়ি ভদ্রমহিলাকে এ বিয়েতে রাজি করাতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছিলো তরুণটির। তার সঙ্গে বিয়ে হলে তাঁদের মেয়ের জীবনটা কেমন হবে সে সম্পর্কে যথেষ্টই দুশ্চিন্তা দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। মেয়েটি অবশ্য খামার-পরিবেশে বড় হয়েছে বলে শহর সম্পর্কে তার কোন আলাদা মোহ ছিলো না। কিন্তু বাপ-মায়ের কাছাকাছি কিংবা তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে থাকা এবং দু'শ' কুড়ি মাইল দূরে নির্জন প্রান্তরে সড়কের ধারে একাকী তাঁবুতে 'কাফের' পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। তার হবু শ্বাশুড়ির এ উদ্বেগ অস্বীকারও করতে পারছিলো না সে। পিয়েতের মুক্ত প্রশংসা কিছুটা তাঁদের আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যযুক্ত ছিলো। সত্যি বলতে, সে নিজেও সমস্যাটা নিয়ে ভাবে নি এর আগে। সে যখন কাজে বাইরে যাবে, একা মেয়েটি তাঁবুতে কিভাবে থাকবে—সেটা তার চিন্তার মধ্যেই ছিলো না। মেয়েটার কাছে অবশ্য বিয়ের ব্যাপারটাই জরুরি ছিলো। বিয়ের ঝক্‌মকে পোশাক, অর্ডার দেয়া কেক যার ওপর চিনামাটির ছোটখাটো একজোড়া বরবধূ রাতের পোশাক পরে দাঁড়ানো, কিংবা তার ছোট্ট দু'টি বোন তার পেছন-পেছন তাকে বিয়ের আসরে এগিয়ে দিচ্ছে, ইত্যাদি সব নিয়ে মোহমুগ্ধ হয়েছিলো।

সে আঁকিবুকি করা খাবার টেবিলটার দিকে তাকালো। তার চোখ পড়লো জ্যাম-এর খোলা টিন আর বাদামী কাগজ দিয়ে মোড়ানো লবণের ভাঙা পাত্রটার দিকে। 'আমার স্ত্রী

যখন আসবে তখন তোমাকে সবকিছু সুন্দরভাবে করতে হবে' — সে পিয়েতকে উপদেশ দেয়।

'হুঁ'। তারা পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকায়। এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু বলার দরকার হচ্ছিলো না আর।

'টেবিলটা পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন করে সাজাতে হবে তোমায়' — তরুণটি বলে ওঠে।

'আমি সবসময়ই সবকিছু পরিপাটি করে করি। তুমি এখন আমায় এসব উপদেশ দিচ্ছ কেন —' অনুযোগ করে পিয়েত।

তার কথায় কান না দিয়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করে সে।

খেতে খেতেই তার চিন্তা হতে থাকে, বউ এলে কি কি পরিবর্তন তার করা দরকার। কল্পনাশক্তি খুব একটা প্রবল নয় তার। বর্তমানই তার ভাবনাকে আচ্ছন্ন রাখে বেশির ভাগ সময়। ব্যাপাবটা অনেকটা প্রাত্যহিক যান্ত্রিকতার মতো। সামগ্রিকভাবে তারপ্রয়োজনগুলোকে সে জানে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে ব্যাপারগুলো ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলে সে। হুম, তার কর্মীদেরকে তাঁবু থেকে দূরে রাখতে হবে। এ ব্যাপারটা জরুরি। পিয়েতকে অবশ্য রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজে বারবারই তার তাঁবুতে আসতে হবে। যারা লরি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে তাদেরকেও নানা সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসতে হয়। সে সবদিকে নজর না রাখলে, ঐ লোকগুলো সব গুবলেট করে ফেলবে।

মাংসের একটা হাড় উগরে দেয় সে। অন্য এক সম্ভাবনা তার মাথায় আসে। ঐ যে মেয়েগুলো, তারা ধোয়া-মোছার কাজে তার স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারবে। তারা এমনই নিচুজাতের কাফের, আদৌ কি তারা ঠিকমতো কোন কাজ করতে পারে? ওদের ওপর আস্থা হয় না তার। কিন্তু কুড়িটা লোক ও তাদের পাঁচের অধিক মেয়েমানুষ—এদের সবাইকে তো কাঁটা ঝোপেব আড়ালে ঠেলে রাখা যাবে না। তাহলে, দেখতে হবে তাঁবুর আশপাশে যেন তারা ঘুরঘুর না করে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে তারা যেন তার স্ত্রীকে অযথা বিরক্ত না করে। ব্যস।

আগুনের ওপাশে আবছা অন্ধকারে দৃষ্টি ফেলে সে। দূরের আওয়াজগুলো তখন অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। কাঠ টুকরো করা কিংবা বাচ্চার সরু গলায় কান্না, এসব থেমে গিয়ে খাবার আসরের মৃদু কিছু শব্দ ভেসে আসছে এখন। তারা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু অস্বস্তিকর এক অনুভূতি তাকে বিদ্ধ করতে থাকে।

খেতেখেতেই তার চিন্তা বিষয়ান্তরে ছোটাছুটি করে। এ এক যন্ত্রণাদায়ক নতুন অভিজ্ঞতা। এই প্রথম উদ্বেগ তাকে আচ্ছন্ন করে। হঠাৎই জিহ্বায় কামড় পড়ে তার। পিয়েত, ওহ্ পিয়েত। ওই কাফেরটা এতো বেশি কথা বলে! সে তো নিশ্চয় তার স্ত্রীর সাথেও কথা বলবে। এ ব্যাপারে কিভাবে পিয়েতকে নিরস্ত করা যায়, ভাবতে থাকে সে। কি বলবে সে তাকে? এমন কতগুলো শব্দ মনে হতে লাগলো তার, যেগুলো সাধারণত গোপনে দেয়ালে আড়ালে লেখা হয়ে থাকে, যা কি না উচ্চারণের যোগ্য নয়।

পিয়েত কফি আর কোয়েকসাস্টার্স নিয়ে আসে। কিন্তু সে পিয়েতকে আমলই দেয় না।

খাবারটা অবশ্য সত্যিই সুস্বাদু হয়েছে। শিশু যেমন চকোলেট পেলে আর সবকিছু ভুলে যায়, সেও তেমনি আনন্দে খাবাবটা উপভোগ করতে থাকে। কোয়েকসাস্টার্স তাকে অদ্ভুত তৃপ্তি দেয়। প্রথম যখন সে ওভারসিয়রের কাজ নিয়ে এখানে আসে, তখন তার রাত ও ছুটির দিনগুলো অস্থির যন্ত্রণায় কাটতো। নিজেকে ভীষণ ক্ষুধার্ত মনে হতো তার, কিন্তু খেয়েও তৃপ্তি হতো না কিছুতেই। তার চলাফেরায় ব্যাপারটা বেশ বোঝা যেত। তার ঐ জায়গা থেকে চোদ্দ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে পশুচিকিৎসার একটা কার্যালয় ছিলো। সেখানে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। সে বাদে ঐ সমগ্র এলাকায ওঁরাই ছিলেন একমাত্র শ্বেতকায় লোক। তাঁদের ভাষাও ছিলো আফ্রিকান। এক রোববারে সে ঐ বালির মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে ওঁদের বাড়ির দিকে রওনা দেয়। অবশ্য না হেঁটে উপাযও ছিলো না। সরকারি যান ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে সড়ক বিভাগ মোটেই উদারতা দেখাতো না। তার অস্থিরতা এমনি পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো। ঘটনাচক্রে সেদিন ওই দম্পতিও তার সাথে পরিচিত হবার জন্য আসছিলেন। মাঝপথে যখন তাদের পরস্পরের দেখা হলো, তখন ইতোমধ্যেই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। এর কিছুদিন পবেই পিযেত তার রান্নাবান্না ও যাবতীয় দেখাশোনার ভার নেয়। এমন কি পিয়েত কোয়েকসাস্টার্স বানানোটাও শিখে নেয় তাদের কাছ থেকে, ঠিক যেমনটি ঐ পশু কর্মকর্তাব স্ত্রী তাকে শিখিয়েছিলেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে থিতু হয় সে। সেই নির্জন তাঁবুতে তার নিজস্ব এক জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে।

'ওহো, পিয়েত, তুমি খাবারটাকে কি করেছো?' — আনন্দের ডাক ভেসে ওঠে তার গলায়।

'এক্ষুনি আসছি', বলতে বলতে পিয়েতের উদয় হয়। ভেজা হাতটা ব্যস্তসমস্তভাবে গামছায় মুছতে থাকে সে। তাব বিনম্র, শিশুসুলভ ভঙ্গিমা দেখে বোঝা যায় পিয়েত পরিতৃপ্ত বোধ করছে। সে বুঝতে পেরেছে খাবারটা তার মনিবের খুব পছন্দ হয়েছে।

'খাবাবটাকে তুমি কি করেছ হে?'

পিয়েত ঘাড় ঝাঁকায়। 'তুমি বল কি করেছি, আমি তো বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।'

'নাও, আরো খানিকটা নিয়ে এসো ও'টা' — কপট গাম্ভীর্যে খালি প্লেটটা এগিয়ে দেয় সে পিয়েতেব দিকে। হাসতে হাসতে পিয়েত যখন ফিরে যাচ্ছে, তরুণটি চিৎকার করে বলে ওঠে—

'খাবারটা এখন থেকে এরকমই হওয়া চাই, বুঝলে?'

বিশেষ বিশেষ দিনে, যেমন বিয়ের আসবে, কিংবা ক্রীষ্টমাস উৎসবে সে পান করতে ভালোবাসে। ফ্রান্সিস্‌টাউনে সে যেদিন বাজার করতে যায়, একটা বোতলও নিয়ে আসে। সপ্তাহান্তে শনিবার দিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় সে দু'পেগ ব্র্যাণ্ডি খায়। অন্যান্য দিন বোতলটা তার দেরাজেই পড়ে থাকে। কিন্তু আজ, তার কুমারত্বের শেষদিনে, কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে সে। তাঁবুর ভেতর গিয়ে বোতলটা নিয়ে আসে। তার এই একটা কাজের জন্য সে কাফেরদের ফরমায়েশ করে না। মদের বোতল দেখলে ওরা নিজেদের স্থির রাখতে পারবে না। তার হালকা রঙিন ছ'খানা গ্লাসের সেটটা থেকে একটা গ্লাস বের করে নেয় সে। ছোট্ট

একটা পেগ ঢেলে নিয়ে ওতে, সে আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে। জুতো জোড়ার তলা ভেদ করে আগুনের উষ্ণতা তার পা দুটোতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ভোররাত দুটো–তিনটের দিকে সাধারণত ঠাণ্ডাটা জেঁকে আসে। তখন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। কিন্তু এই সন্ধ্যাতেই তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস অনুভব করে সে। আগুনের তাপটাও যেন কমে আসে, নীলাভ শিখা থেকে তেমনই বোঝা যায়। এসময় কালো মানুষদের একজন এসে কাঠ ফেলে দেয় নিভু–নিভু আগুনের ওপর। ভেতরে ভেতরে তারও কেমন যেন একটা পড়ন্ত উত্তাপ অনুভূত হয়। শেয়ালের কেঁউ কেঁউ স্বর যেন আকাশে আকাশে শিকারের আহ্বান ছড়াতে থাকে, ঠিক যেমন হাওয়া একটা বাড়িকে খুঁজে বেড়ায় তাকে পেঁচিয়ে ধরার জন্য। এখানে কোন বাড়ি নেই। কিন্তু তাঁবুর আগুনের ছড়ানো আলোর শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে আসা অর্থহীন কোলাহল সব, বাচ্চার কান্না, কাশির দমকের শব্দ ও বুক থেকে কফ টেনে তোলার আওয়াজ, এইসব মিলে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে গার্হস্থ্য জীবনের এক প্রতিরূপ তৈরি হয়ে গেছে। তার সত্তাও যেন উড়োজাহাজের জানলায় লেপ্টে থাকা মরা মাছির ক্ষুদ্র একটা চিহ্নের মতো উন্মোচিত হয়ে পড়ে এই প্রান্তরে, কিন্তু সে যেন সেটা বুঝতেই পারে না।

অন্ধকারে বহু রকমের সুর তৈরি হয়, আবার ঐ অন্ধকারেই তারা হারিয়ে যায়। কোলাহলের মাঝে বিলীন হয় সঙ্গীতের সুর। এসময় বিশালদেহী এক লোক ধীর পদক্ষেপে আলোর প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। তার পোশাক যেন কৃষ্ণকায় সেই সুঠাম দেহের চাপ বইতে পারছিলো না। উপবিষ্ট তার আড়াআড়িভাবে রাখা পা জোড়া যেন কিছু একটা ঘটার জন্য অপেক্ষা করছে। তার মুখের কাছে বীণার মতো দেখতে এক তারের একটা বাদ্যযন্ত্র তুলে ধরে সে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা বাঁকানো কাঠের মতো দেখতে সেটা। তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি শুকনো এক তালপাতার অংশ ফিতার মতো লাগানো আছে। তার পুরু ঠোঁট দুটোকে সেই সরু ফালিটার ওপর চেপে ধরে ফুঁ দিতে থাকে লোকটা। অন্য হাতে ফালিটার কম্পনকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে হ্রস্ব, হাল্‌কা অথচ পরিষ্কার একটা সুর তৈরি করে সে। এতোই মৃদু তার অনুরণন, তা যেন মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে রয়ে যেতে চায়। এ যেন মানুষের শোনা সেই আদিমতম সুর, নদীর ধারে নলখাগড়ার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে শিখে প্রথম যেটা মানুষ শুনেছিলো। সুরটা যখন আর শোনা গেল না, বোঝা যাচ্ছিল না ঠিক কোন্ সময়টায় সেটা থেমে গিয়েছিলো।

'এরকম অন্য একটা বাজাও' — ৎসোয়ানা ভাষায় বলে ওঠে সে। তার মুখ থেকে পাইপের ধোঁয়াটাই বেরিয়ে এলো কেবল, আর সব নিশ্চল হয়ে রইল।

কালো মানুষটার বাদামী হাতের চেটোয় যন্ত্রটা আবার উঠে এলো। পুরু ঠোঁট দুটো তার আবার আর্দ্র হলো। মৃদু সুরে এমন একটা সঙ্গীত ভেসে এলো, বাদক এবং শ্রোতা উভয়েরই মনে হলো—এ যেন তাদের হৃদয়েই অনুরণিত হচ্ছে। ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে লোকটা এবার একটা ছোট্ট কাঠি যন্ত্রটার ভেতর দিককার খাঁজে এদিক থেকে ওদিক টেনে নিচ্ছিল। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন নৃত্যশিল্পীর পদসঞ্চালনের মতোই শোনাচ্ছিল সেটা।

আবছা আঁধারে আরো কয়েকজনকে দেখা গেলো। ওরা এসে বসে পড়লো দৃষ্টির সামনে। ওদের একজনের হাতে প্যারাফিনের অর্ধেক কাটা একটা টিন দিয়ে বানানো একটা যন্ত্র দেখা যাচ্ছিল। যখনই বীণাবাদক বাজনা থামিয়ে দিচ্ছিল তখনই ঐ লোকটা তার যন্ত্র বাজাতে থাকলো। অনেকটাই অযত্নের সাথে বাজানো বেঞ্জোর মতো, পৌনঃপুনিক একটা সুর তৈরি হচ্ছিলো এতে করে।

তরুণটি সুরের তালে তালে পা ঠুক্‌ছিলো মাটিতে। একবার কি দু'বার হাতে তালি দিয়েও তাল ধরছিলো সে। জীর্ণ টুপি পরা পাণ্ডুর চেহারার এক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে, অন্যদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুনতে শুনতে সামনে এগিয়ে আসে। সে তার দু'পায়ের মাঝখানে ছোট একটা মাটির বাটি রেখে বসে পড়ে। সেই বাটির মুখটার ওপর ধাতুর তৈরি একটা যন্ত্র বসানো ছিলো। ওতে পিয়ানোর মতো চাবির সার দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে যন্ত্রটা বাজাতে শুরু করলে অন্যেরা নাকি সুরে গান ধরলো। এসময় আবো কিছু লোক জড়ো হলো সেখানে। নিশ্বাসের ওঠানামার মতোই সুরটার ওঠাপড়া চলছিলো। মাঝামাঝি, বিরতির একটা সময়ে তরুণটি বদ্‌খত সেই যন্ত্রটা দেখতে চাইলো।

'এটা তো নতুন, নয় কি?' — যাকে এই কথাগুলো বলা, সে তার কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু সে বেশ গর্বের সাথেই তার দিশি ম্যান্ডেলিনটা তরুণটির হাতে তুলে দিলো। তার নিজের সৃষ্টিটাকে দেখতে সেও বেশ মজা পাচ্ছিলো।

তরুণটি যন্ত্রটা উল্টেপাল্টে দেখলে। তারটায় টুং করে একটা শব্দও তুললো সে। মাথা নাড়িয়ে, দাঁত বের করে মৃদু স্বগতোক্তি করলো সে। জ্যাম রাখার পুরনো একটা টিন, আর দুটো তার, এই মিলিয়ে একটা পুবো যন্ত্র। অবাক হয় সে। অদ্ভুত সব যন্ত্রের কথা সে আগেও শুনেছে। তাকে ঘিরে থাকা মুখগুলোয় তৃপ্তির একটা আভা খেলে যাচ্ছিলো। লোকগুলো পরস্পবের মধ্যে হাসাহাসি করছিলো। জিনিসটা দেখতে বিটকেলে বটে, কিন্তু বাজনাটা তো ভালোই হয়। যন্ত্রটা ফিরিয়ে নিয়ে আর একবার বাজায় লোকটা। খানিকটা ভাঁড়ামোও মেশায় তার সাথে। জড়ো হওয়া দর্শকেরা মজা পায়। তাদের হাবভাবে প্রশংসাসূচক অভিব্যক্তি খেলে যায়, লোকগুলো এখন আগুনের অনেক কাছাকাছি এসে বসেছে। আগুনের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের গায়ে।

'সামনের হপ্তায়', তরুণটি উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে, 'বুঝলে, সামনের হপ্তায় আমি যখন ফিরবো, একটা রেডিও নিয়ে আসবো। সব নামকরা সাহেবি দলগুলোর বাজনা শুনতে পাবে ওতে, সেই হলো আসল সঙ্গীত।' লোকগুলো তার কথা পুরো বুঝতে পারলো না। ওদের মধ্যে একজন একসময় জোহানেস্‌বার্গ শহরে কাজ করতো। 'সাচ্‌মো'—বলে ওঠে সে। অন্যেরা ভাবলো—তাহলে ওই সাচ্‌মোর কথাই বলছে এই শ্বেতকায় তরুণটি। 'সাচমো, সাচ্‌মো'—মৃদু আওয়াজ ওঠে ওদের কণ্ঠে।

'সঙ্গীত, আহা, শহরের সাহেবি নৃত্যানুষ্ঠানের মতো, সামনের হপ্তায়।' আগুনের উষ্ণতা পোহাতে-পোহাতে মোহমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেয় তারা। নৈকট্যময় এক নিঃশব্দতা ভেসে থাকে সর্বত্র।

এক অদ্ভুত অনুভূতি ওভারসিয়র তরুণটিকেও আচ্ছন্ন করে। প্রথমে তার কাঁধ, আস্তে

আস্তে তার কানে, মুখে এক উত্তাপ অনুভব করতে থাকে সে। ও কোনো ব্যাপার নয়, নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সে। ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে রেডিওর কথা সে বললেও, সামনের সপ্তাহ আসতে-আসতে ওরা নিশ্চয় সব ভুলে যাবে। ওটার আশায় নিশ্চয় থাকবে না তারা। সেই ক্ষণটা কল্পনা করার চেষ্টা করে সে—ওরা সবাই তার আবাস-গাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে শুনবার জন্যে, আর সে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়িয়ে ওদের বলছে ...।

যেটুকু ব্র্যাণ্ডি রয়ে গেছে সেটা ওদেব দিয়ে দিলে কেমন হয়, ভাবলো সে। পরক্ষণেই নিজেকে শাসায়। অসম্ভব, এমন পাগলামো সে করতেই পারে না। একবার স্বাদ পেলেই ওদেব আস্পর্ধা বেড়ে যাবে, বারবার পেতে চাইবে। তার চাইতে পিয়েতকে সে স্টোর থেকে কিছু চিনি, ময়দার গাঁজলা ইত্যাদি দিয়ে যাবে। কাল যখন সে থাকবে না, ওসব দিয়ে পিয়েত ওদের বিয়র তৈরি করে দেবে।

সে প্যান্টের পকেটেব গভীবে তার হাত দুটো চালান করে দেয়। মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে শরীরটাকে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে আসে। বীণাবাদক আবার তার যন্ত্রটা বাজাতে শুরু করেছে। তরুণটিব ভাবনাগুলো যেন সেই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শাব্দিক একটা রূপ পেতে শুরু কবে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ আগের উদ্বেগগুলো যেন ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে সঙ্গীতের মূর্ছনায়। ততোক্ষণ চেপে-থাকা বুকটাও যেন হালকা হয়ে আসে। কোনো অসীম অস্তিত্ব থেকে যেন সুরটা ভেসে আসতে থাকে। মনে হয়, যেকোন মুহূর্তেই সেই অসীমেই সেটা আবার মিলিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রটা বেজেই চলে। কারো মুখে তখন কোন শব্দ নেই। নৈঃশব্দ তাদের নৈকট্য বাড়ায়। এতক্ষণেব যত সব অনর্থক উদ্বেগ ও ভাবনার যন্ত্রণা থেকে সে যেন মুক্তি পেতে থাকে। দূরের আকাশে ছোট্ট চাঁদটাকে বাদ্যযন্ত্রটার মতোই দেখায়। মাথাব উপরে চাঁদ আর পায়ের কাছে আগুনকে রেখে অন্যান্য রাতের মতো আজো এভাবে সে কতক্ষণ বসেছিলো তার মনে নেই।

একসময সঙ্গীতের মূর্ছনা বন্ধ হয়, সময় আবার অস্তিত্বে ফিরে আসে। আজকের রাতটা ছিলো। কাল সে ফ্রান্সিস্‌টাউন যাবে। সে উঠে দাঁড়ায়। অন্যেরাও সবাই ছড়িয়ে পড়ে। বাজনা বাজাচ্ছিলো যে লোকটা, সে আঙ্গুল দিয়ে নাক ঝাড়ে। ধুলোময় পা'গুলো পরিচিত শরীরের ভার নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ওরা ফিরে যায়-যার যার তাঁবুর দিকে। ওভারসিয়র তরুণটিও ফিরতে থাকে তার আশ্রয়ে। মৃদু কোলাহলের শব্দ তাদের পিছু পিছু যায়। একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে নিজের অবস্থান ভুলে যাওয়া একাকী কোন মানবের মতো অকস্মাৎ উচ্চনাদে কুৎসিত এক জান্তব আওয়াজ তোলে তরুণটি। ধীর পদক্ষেপে মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে সে। এ পথ তার এতই চেনা যে, অন্ধকাবে তার চোখ পথ দেখতে না পেলেও তার অসুবিধা হবার কথা নয়।

'পিয়েত'—তাঁবুর কাছে পৌছেই ডাক দেয় সে। 'কাল ভোরবেলা উঠতে দেরি করো না। আর হ্যাঁ, তুমি উঠেই লরীটাকে চালু করে রাখবে। আমি যেন না শুনি গাড়িটা চলছে না, বুঝলে?'

কাপড় রাখার দেরাজটার ওপর ল্যাম্পটা পিয়েত ইতোমধ্যেই রেখে গিয়েছিলো। সে

ওটা জ্বালায়। তার মৃদু আলোয় তাঁবুর ভেতরটা ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দেরাজ, বিছানা, ঘড়িটা, আর সপ্তদশী মেয়েটির সেই হাসিহাসি মুখ। বিছানার ওপব বসে তার কম্বলটার মোলায়েম পশমে হাত বুলোতে থাকে সে। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস নেয়, কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চতুর্দিকে চোখ ফেলে। তারপর খপ্ করে ছবিটা তুলে নেয় দেরাজের ওপর থেকে, পেছনের স্ট্যান্ডটাকে ছবিটার সমান্তরালে ভাঁজ করে নেয। তাবপর তার অন্যান্য জিনিসের সাথে ওটিকেও দেরাজে ঢুকিয়ে দেয়।

আগামী দিনের জন্যে সে প্রস্তুত

অনুবাদ : উজ্জ্বল ভট্টাচার্য

পদক □ ফার্দিনান্দ ওইওনো

প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো। কাঠফাটা বোদে দাঁড়িয়ে থাকতে–থাকতে মেকার মনে হলো তার হৃৎপিণ্ড দু'পায়ের পাতায় গিয়ে দপদপ করছে। পাহাড়েই সে পায়ে জুতো পরেছিলো। সেখান থেকে মি. ফউকোনিব অফিসঘর বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কম্যাণ্ডারের কাছে রিপোর্ট করার সময় তার যে পায়ে জুতো আছে সে কথা তার মনেই হয় নি। পতাকা বহন করে সে যে–কায়দায় নিজের অবস্থানে মার্চ করে ফিবে গিয়েছিলো তাতে মনে হচ্ছিলো শ্রীমান হবেনই 'ওই অঞ্চলের রাজাবাহাদুর।' সামনেই বসেছিলো গোত্রপতিরা। তাদের কুর্তার সঙ্গে আঁটা লাল রঙের তকমা। কিন্তু না, মেকা সেদিকে নজর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে নি।

"ওই আর এক দল, আমাকে দেখে এখন হিংসায় জ্বলে মরবে। তা মরুকগে ব্যাটারা," মনে মনে বলে মেকা।

সাদা আদমি যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তখন সে দেখেছে সৈন্যরা খটাখট পায়ের গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়ায়। সেই রকম এখনও সে সশব্দে গোড়ালি মেরে দাঁড়ায়। সাদা মানুষ তাকে অতিক্রম করে যেতে মৃদু হাসে এবং সঙ্গের সাদাদের তাকে আঙুল দিয়ে দেখায়। মেকা তখন ইউরোপিয়ানদের মধ্য থেকে এক ধরনের দুর্বোধ্য আওয়াজ শুনতে পায়। কিন্তু এ্যাটেনশান অবস্থায় সে জমে একেবারে কাঠ হয়ে থাকে। হ্যাঁ, তার মনে হয় কাঠের মতোই শক্ত হয়ে গেছে সে। তাকে সবচেয়ে তকলিফ দিচ্ছিলো তার তেড়া ঘাড়। মেকা আবার চারদিকে তাকায়। তার অবস্থান চিহ্নিত করতে ওরা চুন দিয়ে একটা চক্র এঁকে দিয়েছিলো। এখন তার হৃৎপিণ্ড যে হারে পায়ের পাতায় দাপাদাপি করছে তাতে মেকার তো ভয়ই হয় যে সাদাদের বড়লাট আসা পর্যন্ত সে ওই চক্রের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। একবার জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখে সে। রাতে সে জুতোয় সবসময় বালি ভরে রাখে। আজ সকালে বালি ফেলতে গিয়ে জুতোর আকার যতো না বড়ো দেখেছিলো এখন তাকিয়ে মনে হলো জুতো জোড়া তার চেয়েও বড়ো হয়ে গেছে। একটা পা সে একটু সরাতে চায়, মুঠি পাকায়, এবং দম বন্ধ করে থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয় চারদিকে অসীম নিস্তব্ধতা। এরপর সে শরীরের সমস্ত ভার ডান পায়ে রাখার চেষ্টা করে। এই পা–টায় ব্যথা ছিলো কম। বাম পা তাকে স্বস্তি

দিয়েছে সামান্যই। কিন্তু ডানটায় কি ঘটছে তা জানার মতো অবস্থা মেকার ছিলো না। আসার সময় এলা তাকে যে সুঁইটা দিয়েছিলো মনে হলো যেন তা তার পায়ের কড়ে আঙুলের ভেতরে ঢুকে গোড়ালি দিয়ে উরু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং শেষে মেরুদণ্ডে গিয়ে আটকে গেছে। এক সুই হাজারটা সুই হয়ে তার সারা গায়ে খোঁচাচ্ছিলো। ঘামে ভিজে মেকা একাকার হয়ে যায়।

"ভাগ্যিস, বাবা, মোজা পরি নি!" মনে মনে বলে সে।

যে দুর্ভোগ সে পোয়াচ্ছিলো তার চেয়েও বড়ো কোনো দুর্ভোগের কথা এখন মনে করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরক্ষণেই এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, "আরে, তাতে কি ? আমি তো একজন পুরুষমানুষ, নাকি ? আমার বাপ-দাদারা যেভাবে আমাকে গড়েছেন আমি তো তাই। আমি এখন যেখানে রয়েছি, তাঁরা আমাকে সেখানেই দেখছেন... আমরা যেন বাপ-দাদাদের লজ্জায় না ফেলি। আমার খৎনার সময় চাকু দিয়ে নুনু কেটে ওঝা ক্ষতের ওপর থুথু করে একগাদা মরিচ ছিটিয়ে দিয়েছিলো। কই, আমি তো কাঁদি নি . ?"

এইসব ভাবতে ভাবতে মেকা আরেকটু শক্ত হয়ে দাঁতে দাঁত চাপে। "আমি কাঁদি নি। জীবনে কখনোই কাঁদি নি আমি। পুরুষমানুষ, হ্যাঁ, সত্যিকারেব পুরুষমানুষ কখনো কাঁদে না . " মেকা ভাবে।

মেকা তো তাদেরই একজন। একজন পুরুষ এবং খাঁটি পুরুষও বটে। সাদারা যখন প্রথম আসে তখন বহুদিন ধরে তাদের প্রতিরোধ করেছিলো যে বিখ্যাত মেকা, বর্তমান মেকা কি তারই বংশধর নয় ? আর এখন ? সে কি এখন সবার সামনে, সগোত্রীয়দের সামনে ভ্যাভ্যা করে কাঁদবে ? এরা তো সবাই তার বাপ-দাদাকে চিনতো, কিংবা না চিনলেও তাঁদেব কথা শুনেছে।

এইসব ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মেকার ভেতর এক ধরনের পরিবর্তন আসে এবং সে সাদাদের দিকে তাকায। একটা পা সে টান টান করে বাড়িয়ে দেয়, অন্যটি রাখে একটু তেরসা কবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে দু'পায়েব ক্ষেত্রেই কয়েকবার করে সে আবার এ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে সগোত্রীযদের দিকে তাকিয়ে সে বোধহয় একটু হাসেও। ভাবখানা যেন তাদের কোনো একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত করছে। পেছনদিকে হাত দুটো জোড় বেঁধে সে অপেক্ষা করতে থাকে। এখন তার মনে হয় পায়ে জুতোটুতো আদৌ নেই। মাথার ওপর উড়ছিলো যে পতাকা, তার দিকে এবং সাদাদের আর সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ঘাড় শক্ত করে দাঁড়ায়।

"তার আসতে যদি রাতও হয তো আমি অপেক্ষা করবো," বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে সে। "হ্যাঁ, রাত কেন, যদি আগামীকাল, কি এক বছর, কি কেয়ামত পর্যন্তও ... "

হঠাৎ তার ভ্রূকুঞ্চিত হয় এবং তা এক ভীতিপ্রদ ভঙ্গি ধারণ করে। আগে থেকেই তার তলপেট ভারি হয়ে নিচের দিকে টানছিলো; এখন দূর থেকে, বহু দূর থেকে এগিয়ে আসে খুব জরুরী এক চাপ। হ্যাঁ, পেশাব করার তীব্র তাগিদ।

লম্বা-গলা পুলিশ প্রধান এবং তাঁর ডেপুটির মাঝামাঝি বসেছিলেন মি. ফউকোনি। ডেপুটিটি বেশ কম বয়সী, ভাঁজ-তোলা শরীর, কালো কুচকুচে চুল, এবং প্রশস্ত শ্রোণী।

কালোরা তাকে ডাকে 'হিজড়ে' বলে।

সামনে এগিয়ে এক ধাপ নেমে মি. ফউকোনি প্রশস্ত চত্বরে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডেপুটিও নেমে এলো। মেকার অবস্থান থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিছুক্ষণ আলাপ করেন। মি. ফউকোনি তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো একবার হাসলেনও। প্রত্যুত্তরে মেকা আকর্ণ বিস্তৃত এক মোহন হাসি প্রদর্শন করে। দুই সাদা তখন একটু দূরে সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কি পরামর্শ করার জন্য চলে যায়। পরে মি. ফউকোনি সাদাদের দিকে ফিরে যান, পেছন পেছন যায় তাঁর ডেপুটিও।

মেকা ভাবে, "আচ্ছা এখান থেকে কেটে পড়লে কেমন হয়?" পা দুটোয় তো জ্বলছে আগুন। "কি হবে যদি আস্তে করে কেটে পড়ি?" সে আবার ভাবে।

অস্থিরভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বহুবার নিজেকে সে এই প্রশ্ন করে। এরপর সাহস সঞ্চয় করে হঠাৎ সে হাতের তালু ঘামে চপচপে ভেজা মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে আনে। চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে কেউ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার কর্তব্যপরায়ণতা দেখছে কি না। এ-পাশ ও-পাশ নড়েচড়ে সে আর একবার দুর্বোধ্য এক ভঙ্গি করে। একবার বোধহয় শিস দেওয়ারও চেষ্টা করে সে। আরেকবার আঁটসাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের ওপর দিয়ে হাতের তালু বুলিয়ে আনে। পুরুষ মানুষের মতো শক্ত হওয়ার বাসনা এবং তার পদযুগলের তপ্ত জ্বালা ভোলার জন্য আর কি করা প্রয়োজন মেকা তা ভেবে পায় না।

নিজের কুঁড়েঘরের পেছনে আম্ব্রেলটা গাছের নিচে প্রতিদিন সকালের প্রার্থনার পর সে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে জিরোয়। এখন সেরকম করার সুযোগ পেলে তো সে বর্তে যায়। নীরবে মেকা চোখ দুটো বন্ধ করে।

"হা ঈশ্বর, তুমিই কেবল জানো মানুষের অন্তরে কি আছে। তুমি জানো এই মুহূর্তে আমি তমঘা পাওয়ার খায়েশে অপেক্ষা করছি কখন সাদাদের বড়লাট আসবেন এই চুনের দাগের পাশে দুই জাহানের মধ্যে, "ঈশ্বর" ... নীরবে প্রার্থনা করতে করতে সে চোখ খোলে এবং সামনে-পেছনে তাকায়। তারপর আবার চোখ বন্ধ করে ... "দুই জাহানের মাঝে, ঈশ্বর, তুমি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তৈরি করেছো, আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে বড়ো বাসনা এখন হলো এই জুতোজোড়া টেনে খোলা এবং পেশাব করা ... হ্যাঁ, ঈশ্বর, পেশাব করা ... আমি এক পাপীতাপি লোক, তুমি যে আমার কথা শুনবে তার যোগ্যই আমি নই। কিন্তু এখন এই দুর্দশায় আমাকে দয়া করো তোমার কাছে এই আবেদন জানাই। এমন দুরবস্থায় জীবনেও পড়ি নি, হে দয়াময়। খৃস্টের নামে বলি আমেন ... এই দ্যাখো, ক্রুশচিহ্ন আঁকলাম, ঈশ্বর!"

চোখ খুলে ঠোঁট দুটো সে জিভ দিয়ে চেটে নেয়। এরপর বেশ স্বস্তি বোধ করতে থাকে।

তখন বাজে বেলা সাড়ে দশটা। মি. ফউকোনি ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। হাই কমিশনার প্রায় এক ঘন্টা লেট। কুচকাওয়াজ দলের স্যালুট নেওয়ার কথা তাঁর। মি. ফউকোনি অস্থিরভাবে প্রথমে দেশীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দিকে যান। তারপর যান গোত্রপতিদের দিকে। আবার তাঁকে মেকার পাশ দিয়ে যেতে হয়।

"খুব গরম, তাই না?"

"জে–আজ্ঞে।" উত্তর দেয় মেকা। তাব ফরাসি জ্ঞান ওইটুকুই। অবিলম্বে ফউকোনির সঙ্গে যোগ দেয় লম্বা–গলা এবং ডেপুটি। মেকার সামনে দিয়ে সাদাদের চলাফেরা শুরু হয়।

"হায়, ওদের কী ভাগ্য, এবকম আগুনে জুতো পায়ে কষ্ট করতে হচ্ছে না।" ত্যক্তবিরক্ত মেকা বলে আপন মনে। "এরা পরে আছে লম্বা টুপি, আর বয়সও এদেব কম। আর শালা, আমি একজন বয়স্ক লোক এই রোদের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে উনোনে ডিমের মতো আমার মাথাটা ভাজনা করছি।"

ইউবোপিয়ানরা আবার তার পাশ দিয়ে চলে যায়। ওদের সাদা ধবধবে পোশাকে তার চোখে লাগে ধন্দ। সে চোখ বন্ধ কবে বটে, কিন্তু কানে প্রচণ্ড আওয়াজে ধাক্কা দেয় তাদের সদর্প পদচারণায় গুঁড়ো হয়ে যাওয়া খোয়া নুড়ি।

মেকা বুঝতে পাবে না কি তাকে এখন বেশি তকলিফ দিচ্ছে ... তার পা, তাব তলপেট, রোদের তাত, নাকি তার দাঁত। সেই মুহূর্তে যদি কেউ ওকে জিজ্ঞেস করতো "কেমন আছো?" তো সে অভ্যাসবশে সাধারণত যেমন বলে "ভালো" সেরকম বলতে পাবতো না কিছুতেই, এবং বলেই ফেলতো যে সাবাক্ষণ তার বড়োই তকলিফ হচ্ছে। মিমিটিটিব মদের দোকানে কিছুক্ষণ কাটিযে আসে নি বলে এখন তাব বড় আফসোস হয়। "ওখান থেকে একটা কিছু গিলে এলেও তো এই পেবেশানি হয না," ভাবে সে।

একবাব মুখ তুলে দূবেব শপিং সেন্টাবেব দিকে তাকায়। ঠিক তখনই বিউগল বেজে ওঠে এবং সবাই তটস্থ হযে সোজা হযে দাঁড়ায়। মেকা দেখতে পায় একটা কালো গাড়ি তিন–রঙা পতাকা উড়িযে সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই চত্বরের দিকে এগিযে আসে। মি. ফউকোনি এবং তাঁব ডেপুটির কাছে এসে গাড়িটা থামে। প্রধান কর্মকর্তা এগিযে গিয়ে একটা দরজা খুলে ধরলে দু'জন বিপুলাকৃতিব সাদা মানুষ বেরিয়ে আসেন। মেকা ভাবে, আচ্ছা ওই দু'জনেব কোন্‌টি বড়লাট, যার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে?

সার বেঁধে দাঁড়ানো সৈন্য। তাদের সামনে দিয়ে সাদা দু'জন এবং পিছে পিছে মি. ফউকোনি ও তাঁব ডেপুটি পরিদর্শন করে যান। এরপর মি. ফউকোনি তাঁদের নিয়ে এগিয়ে যান নিজেব অফিসঘবের বারান্দায়। সেখানে সাদারা অপেক্ষা করছিলো।

কিছুক্ষণ পব মি. ফউকোনি দেশীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, পরে গোত্রপতিদের সঙ্গেও। এদের কারো কারো সঙ্গে তাঁরা করমর্দনও করেন। হঠাৎ মেকা দেখে যে ওঁবা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তার গভীর অন্ত্রে যেন একটা চাকু কেটে বসতে শুরু করে। বিপদ দেখলে যেমন করে, তেমনি সে এখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মাংসপেশি শক্ত করে দাঁড়ায়। মি. ফউকোনি তাব দিকে থুতনি তুলে দেখিয়ে বড়লাটদের দিকে ফিরে কথা বলে যেতে থাকেন। ওরা কি মেকাব পেশাবের বেগ সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছে? কি জানি। চোখ পিটপিট করে সে একবার মুঠি পাকায়। মি. ফউকোনি থামলে সাদা দু'জন একে একে আলতোভাবে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। মেকা তার ভেজা হাতে করমর্দন করে। এরপর তারা ইউরোপিযানদের দিকে ফিরে চলে।

নাহ্, মেকার পক্ষে বোধহয় আব দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। এতোই গরম লাগছিলো তার, যে সে চোখ তুলে একবার দেখে সূর্যটা কি সত্যি আসমানে, নাকি তার পিঠের ওপর।

কিন্তু তারা পদক দিতে এতো দেরি করছে কেন? পুরো একটি ঘন্টা তার মতো একজন বয়স্ক লোককে এভাবে দাঁড়িয়ে রেখেছে! নাকি পদকটা তারা হারিয়েই ফেললো, কিংবা ভুলে গেল পদক দেওয়ার কথা। এই প্রশ্ন মনে জাগতেই তার ভেতরটা ভয়ে শিরশির করে ওঠে। বন্ধুদের কি বলবে সে ? বিশেষ করে যাদের চোখে সে এখন কেউকেটা ? উফ্, এই সাদার বাচ্চারা! এদের হাত দিয়ে কিছুই সহজে পার হয় না। হাঁটার সময় তো মনে হয় দৌড়ায়, অথচ ওয়াদা করা একটা কাজ করতে এখন কেমন গড়িমসি করছে। এখন আবার চত্বরের ওই প্রান্তে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অন্তহীন পরিচয় আর অভিনন্দনের পর্ব চলছে। মাথা নাড়া দিয়ে মেকা একবার তার পায়ের দিকে তাকায়। একটা হিক্কা উঠতেই সে কোনোক্রমে সেটাকে চেপে ফেলে। কিন্তু একি ? আমার পা তো ফুলে ঢোল। সর্বনাশ, দুটো পা-ই এমন ফুলেছে। আতঙ্কিত স্বর তার মুখ ফুটে বেরিয়ে যায়।

তলপেটের ওপর দিয়ে হাত দুটো বুলিয়ে আনলে বেশ আরামই বোধ করে। এবার সে দেখে মি. ফউকোনি, তাঁর ডেপুটি এবং মি. পিপিনিয়াকিস তার দিকে হেঁটে আসছেন। তড়িৎ গতিতে সে পায়েব গোড়ালি দুটো এক করে ফেলে। হাত দুটো উরুর পাশে যথাসাধ্য শক্ত করে সেঁটে রাখে; একবার মাথা তুলে নাড়িয়ে দ্বিতীয়বার আর নড়ায় না। সে আড় চোখে দেখে মি. পিপিনিয়াকিস এসে তার পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। মি. ফউকোনি এবং অন্যরা কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিউগল বাজে আবার এবং এবার সঙ্গে একটা ড্রামও বেজে ওঠে। অতিকায় শ্বেতদ্বয়ের একজন মি. পিপিনিয়াকিসের দিকে এগিয়ে যান।

"ওই হলো বড়লাট," মেকা মনে মনে বলে। কিন্তু কার সঙ্গে, কিংবা কিসের সঙ্গে তুলনা করবে তা আর ভেবে পায় না। তার চোখে যে জিনিসটা প্রথমেই ধরা পড়ে তা হলো সাহেবের থুতনির নিচে প্রকাণ্ড ঝুলন্ত কম্বল। থলথলে মাংসল ওই কম্বলে সাহেবেব টাইয়ের অর্ধেকটা পড়েছে ঢাকা।

মি. পিপিনিয়াকিস মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বড়লাট তাঁর দিকে তাকিয়ে এমন চেঁচিয়ে কথা বলেন যেন তিনি কোনো বধিরের সঙ্গে কথা বলছেন। মি. ফউকোনির ডেপুটি হাত বাড়িয়ে একটা ছোট বাক্স ধরে রেখেছিলো। এখন কথা শেষ হলে তিনি ওই বাক্স থেকে একটা মেডেল বার করে মি. পিপিনিয়াকিস-এর বুকে সেঁটে দেন। মেকা দেখে যে বড়লাট গ্রীকটার কাঁধ ধরে তার গালে গাল ঠেকালেন। প্রতিবার মাথা নড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গলাব কম্বলটাও নড়ছিলো, দেখাচ্ছিলো বুড়ির পাটকিলে রঙের স্তনের মতো।

এবার মেকার পালা। বড়লাট এবার তার সামনে এসে চেঁচাতে শুরু করেন। তাঁর ঠোঁট ফাঁক কিংবা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর নিচের চোয়ালও কয়েকবার ওঠানামা করে। একইভাবে থুতনির কম্বলও কখনো ফুলছিলো, কখনো চোপ্সাচ্ছিলো। তিনি ছোট বাক্স থেকে আরেকটা মেডেল তুলে নিয়ে মেকার দিকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান। মেকা লক্ষ্য করে এই মেডেলটা গ্রীকেরটার মতো নয়।

বড়লাট তাঁর কাঁধ বরাবর ঝুঁকে পড়েন। তার বুকে পদক মারার মুহূর্তে মেকা তাঁর দিকে চায়। খাকি উর্দি ভেদ করে সাহেবের গরম নিশ্বাস পড়ে তার শরীরে। বড়লাট ঘামছিলেন একেবারে কুস্তিগীরের মতো। দেখে মনে হয় যেন বৃষ্টিপাতটা তাঁর পিঠেই হয়ে

গেছে। কাঁধ থেকে পাছা পর্যন্ত ঘামের ভেজা চিহ্ন বিস্তৃত হয়েছে। উদ্বেগ নিয়ে মেকা ভাবে সাহেব কি মি. পিপিনিয়াকিসের বেলায় যেমন তাঁর ভেজা কম্বল তার কাঁধে ঠেকিয়েছেন, তেমনি তার কাঁধেও ঠেকাবেন ? কিন্তু বড়লাট যখন মেডেল পরিয়ে দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে তার দিকে হাত বাড়ান তখন—মেকা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মেকা হাত বাড়িয়ে ঝাপটে ধরে সাহেবের ভেজা তুলোর মতো হাত।

বুকেব দিকে সে আড়চোখে চায়। খাকি উর্দির সঙ্গে আঁটা পিন থেকে ঝুলছে মেডেলটা। একগাল হেসে সে মুখ তুলে তাকায়। অনুভব করে ভেতরে ভেতরে অন্তব তার গাইছে, এবং তার মুখমণ্ডল সেই তালে দপ্‌দপ্‌ করছে। তার দেহবল্লরী আন্দোলিত হয়, এবং হাঁটু দুটো স্প্রিং-এর হাঁটুর মতো ভাঁজ হতে থাকে। তার পেরেশানি সে এখন কিছুই বোধ করে না, এবং শরীরের গিঁটে গিঁটে যে কড়কড় শব্দ হচ্ছে তাও শুনতে পায় না। সমস্ত দাবদাহ, পেশাবেব চাপ, পায়ের ব্যথা ... সব, সব যেন কোন মন্ত্রবলে উধাও হয়ে গেছে। সে আবার তাকায মেডেলের দিকে। মনে হয় যেন তার গলা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, তার মাথাও ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। উঠতে উঠতে ব্যাবেলের স্তম্ভের মতো হঠাৎ তা আকাশ ছাড়িযে ওঠে। হ্যাঁ, এবার তার কপাল স্পর্শ করে যায় মেঘ। দীর্ঘ হাত দুটো আচম্বিতে অদৃশ্যভাবে উত্থিত হয় যেন উড়াল দেওয়ার মুহূর্তে পাখির দু'টি ডানা।

অনুবাদ : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

বুড়ি □ লুই বার্নার্ড হোনওয়ানা

দিব্যি করে বলছি, আসলে কিন্তু আমি জ্ঞান হারাই নি, যদিও পড়ে যাওয়ার ঠিক আগে মনে হয়েছিল চেতনাব গতিটা একটু ঢিমে হয়ে আসছে। এরকম অবস্থায় আত্মরক্ষার ক্ষমতাও কিছু একান্ত সহজাত এবং মূঢ়, শিথিল অঙ্গভঙ্গিতে সীমিত থাকে, যেবকম দেখতে পাওয়া যায় মার খাওয়া মুষ্টিযোদ্ধাব টালমাটাল হাবভাবে। সেই দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে আমি যে কী ভীষণ চেষ্টা করেছিলাম মুঠো-করা হাতগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার, মনে হয় না কাবো পক্ষেই তা আন্দাজ করা সম্ভব। মুঠো-করা হাতগুলো পাশবিক রকমের ভারি ঠেকছিলো নাড়ানোর আগে, কিন্তু যখন হাত তুললাম, তখন আবার অবিশ্বাস্যভাবে টলমল করতে লাগল। ইতোমধ্যে কিল-ঘুষি খেয়েও আমার কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় নি, কাবণ, অনুভূতিগুলো আমি টের পাচ্ছিলাম ক্রমে আবছা হযে আসা এক প্রতিধ্বনিব আড়াল থেকে। আমার মাথার মধ্যে তাব অনুবণন ক্রমশ ক্ষীণ হযে আসছিলো। এই অভিশপ্ত প্রতিধ্বনিই শেষে আমার পতনের জন্য দায়ী হলো। আমার মাথা একেবাবে গুলিযে গেল, হাত ওঠাতে পারার আগেই আমি হাত ওঠানোর কথা ভেবে বসলাম। আস্তে আস্তে আমি পড়ে গেলাম, খুব সচেতনভাবে, পড়ে যাচ্ছি—তা পরিষ্কার বুঝতে পেবেই।

প্রথমে ধরাশায়ী হওয়ার আরামটুকু অনুভব করলাম, যদিও মাথাব ভেতর প্রতিধ্বনি তখনও বাজছে। যখন চোখ খুললাম, শুরু হলো ভন্‌ভনানি, আর পড়ে যাওয়ার জন্য নিজেই নিজের ওপর ক্ষেপে উঠলাম। মাথার মধ্যের আওয়াজটা দৃষ্টিকে এতটা প্রভাবিত করছিল যে, কি দেখছি তা কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পাবছিলাম না। কিন্তু খানিক পরে, চোখ-কাঁপা বন্ধ হলে, টের পেলাম দুটো কালো আস্তরণে ঢাকা শক্ত টানটান পা আমার দেহের ওপর সওয়ার হয়ে সোজা উঠে বেল্টে গাঁথা ঝকঝকে ধাতুর ফলকে মিশেছে। আরও উপরে, অনেক উপরে, ঝুলন্ত আলোর কাছাকাছি, আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে আত্মতৃপ্তির হাসিমাখা মুখ। আমি আবার চোখ বুজলাম। বুঝতে পারলাম, কাঁপছি। কিন্তু মাথার ভেতরে আওয়াজটা এবার কিছুটা সয়ে গেছে। কারণ, এখন এলোমেলো চীৎকার পরিণত হয়েছে বিরামহীন দপ্‌দপানিতে। যখন আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে সে সকলের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছে সে আমায় মেবেছে, আর এবার সে চলে গেছে, তখনও চোখ খুললাম না।

বাড়ি ফেরা দরকার। মনে হয় শুঁড়িখানায় ঢোকার আগে থেকেই বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেটা

ছিল, সুতরাং শুঁড়িখানায় যা ঘটল, তা আমাব বাড়ি ফেরার ইচ্ছেব জন্য আদৌ দায়ী নয়। বুড়ি আর বাচ্চাগুলোকে কে জানে কতকাল দেখি নি, কাবণ ইদানীং আমি খুব দেরিতে ঢুকি, আর ভোর না হতেই বেরিয়ে যাই। কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, সত্যি তাদের দেখতে ইচ্ছে করছে কি না। বুড়ি বড্ড নিষ্প্রভ আর বাচ্চাগুলোর দিনরাত কাঁইমাঁই বড়ই বিরক্তিকব : এ বলে আমায় দ্যাখ, তো ও বলে আমায় দ্যাখ। অবশ্যই শুঁড়িখানায় এক্ষুণি যে কাণ্ড হলো, তাব তুলনায এসব কিছুই নয, আর এরকম তো আজকাল সিনেমা হলের বাইবে, মদের ঠেকে, খাবাব হোটেলে, সর্বত্রই লক্ষ্য করছি। সবাই আমায় অদ্ভুতভাবে দ্যাখে, যেন আমার মধ্যে এমন কোন ব্যাপাব আছে যা ওরা একেবারে অস্বীকার কবতে চায, একটা হাস্যকর কিছু, কিম্ভূত কিছু, আশ্চর্য কিছু, ঈশ্বরই জানেন—আবও কত কিছু। গা ঘিন্‌ঘিন্‌ কবে, কিন্তু আমি অতি কষ্টে নিজের মধ্যে কোনো বিস্ফোরণ ঘটতে দিই না, শুধু ঐ হতভাগী বুড়ি আব ছিঁচ্‌কাঁদুনে বাচ্চাগুলোর জন্য।

শুড়িখানায় এক্ষুণি যা হলো, তা-ই তো হচ্ছে আজকাল। আমি ঐ লোকটাকে মারতে পারলাম না। কারণ, ওকে অন্যসব লোকের মতই মনে হচ্ছিল, আর, সেই কারণেই তো ও আমায় মেরে বেবিযে গেল। বাজে কথা বলে তো লাভ নেই—ওরা সবাই এক। যারা নিজেদেব একটু আলাদা দেখানোব চেষ্টা করে, তারাও আলাদা শুধু সেখানেই, যেখানে নিরপেক্ষ থাকা যায়, অথবা যখন আমাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যায়—কাবণ, ওদের চারপাশে বিধিনিষেধেব দেওয়াল, আর যারা সেই দেওয়ালের ওপাবে, তাদের দিকে গা-গুলোনো বিতৃষ্ণার চাহনি ছুড়ে ওরা নিজেদের রক্ষা করে। আমার চেয়ে ভালো তা কেই-বা জানে।

বাড়ি যাওযা দবকার। বাড়িব ওদেব ইচ্ছেমত আমি ভাত আর বাদামের ঝোল খাব, কিন্তু পেট ভবানোব জন্য নয়। বাড়ি যাওযা দবকার, যেখানে চ্যাঁচামেচির শব্দে কান ভরে যাবে, অভাবে ভরবে চোখ, আর বিবেক ভরবে ভাত আর বাদামের ঝোলে।

মাদুরে বসে বুড়ি চুপচাপ বাচ্চাদের খাওয়া দেখছিল। সময়-সময় ওদের মধ্যে কেউ একজন এ্যালুমিনিয়ামের থালা নিযে উঠে আসে, আর সে তাতে আব কিছুটা বেড়ে দেয়। এর ফাঁকেই তার চোখ পড়ল আমাব উপর। কাঠের হাতাটাতে ভাত তুলে সেটা এগিয়ে থালায় উল্টে দিতে যাবে, এমন সময হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়েছে—এই ভাব করে দরজার দিকে দেখল। আমাকে দেখামাত্র হাঁড়ির তলায় এক নজর দেখে জিজ্ঞেস করল, আমি খাব কি না।

"এখনও বুঝতে পারছি না, খাব কি না", আমি উত্তর দিলাম।

ও উনুনের দিকে ফিরে কিছুক্ষণ হাতাটা শূন্যে ধরে আগুনের হল্কাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

"তুমি রাগ করেছ? এতই রাগ করেছ যে খেতে পারবে না, খেতে চাও কি না, তাও জান না?"

"না, রাগ করি নি।"

বুড়ি অনেকক্ষণ কিছু ভাবল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, "ঠিক আছে, তুমি যদি রাগ

না করে থাক', তাহলে ..."

বলতে বলতে বাচ্চাটার দিকে ফিরে তাকালো, আর হঠাৎ ওকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন সেটাই সে মুহূর্তে ওর কাছে সব থেকে জরুরী—"কিটো! কি এত চিবোচ্ছিস্ তখন থেকে, কিটো ?"

কিটো মুখেরটা গিলে উত্তর দেওয়ার আগেই খাতিদ্যা ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ঐ কিটোটা আমার পাত থেকে মাংস চুরি কবে চিবোচ্ছে মা! আমি যখন দেখছিলাম না, তখন ও চুরি করেছে। ওটা আমার, মা! ছিঃ! কিটো, তুই একটা চোব।"

আর আমাব দিকে ফিবে ও আবার বলল, "ওটা আমার, তোকে বলছি দাদা!"

কিটো মুখ থেকে যা বাব করেছিলো, তা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল, "এটা আমায় মা দিযেছে, বলছি।" তাবপর আমার দিকে ঘুবে, "দেয় নি, দাদা ?"

ইতোমধ্যে দু'জনে হুটোপুটি লেগেছে, তাই বুড়ি এবার ব্যাপারটা নিজের হাতের মধ্যে নিল।

"শ ... শ... শ...।"

সক্কলে তক্ষণাৎ চুপ কবে গেল, এক খাতিদ্যা ছাড়া, সে এখনও ঘ্যানঘ্যান করেই চলেছে, "ওটা আমার, ওটা আমার, ও চুরি করেছে। ছিঃ! কিটো, তোর লজ্জা করা উচিত, আমি তোকে দেখেছি।"

কিন্তু অন্য বাচ্চাকাচ্চারা বুড়িকে মদদ করল—"শ... শ... শ... !"

খাতিদ্যা ওদের দিকে যেই ফিরেছে, সেই ওরা, "শ... শ ...শ...!" প্রাণপণে হিশ্‌ফিশ্ করতে লাগল।

হাতটা উঠিযেই বুড়ি ওদের লক্ষ্য করছিল। তারপর একসময় সব ভুলে ওরা আবার খেতে লাগল, আর কিটো মুখ থেকে বার করা গারসটা আবার গিলে ফেলল। তখন বুড়ি ওর থালায় আবও এক হাতা দিল। ঝোল দেওয়ার আগে একটু ভাবল, তারপর হাতাব পব হাতা ভাত দিয়ে যেতে লাগল। বাচ্চারা যখন চলে গেছে, তখন অন্যমনস্কভাবে আমায জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি কি সত্যিই বুঝতে পারছ না, খাবে কি না?"

"যদি না-ই খেতে চাই ?" আচ্ছা মুশকিল। এই জোবাজুরিটা অসহ্য!

বুড়ির মনটা খারাপ মনে হলো। হাঁড়ির তলায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে ক্ষমাপ্রার্থীর হাসি হেসে আমায় বলল,

"শুধু তলানিটা রয়ে গেছে।"

ঘরের অন্য দিক থেকে বাচ্চারা গুন্‌গুন্ করতে লাগল, "ছি! তলানি।" কিটো বলল, "শ ... শ... শ... !" আর সবাই একে অপরকে চুপ করাতে লাগল, বুড়ি ওদের চেঁচিয়ে বকতে ওরা আবার খেতে লাগল।

"তাহলে বারবার খাব কি না জিজ্ঞেসই বা করছ কেন? আর আমি খেলে, তুমিই বা কি খাবে ?

"আমার খিদে পায় নি, "বুড়ি বলল।

"আর খাবারও তো নেই।"

"আমার খিদে পায় নি, সত্যিই পায় নি। কিন্তু তুমি বললে আমি এক্ষুণি চা করে দিতে পারি। খাবে ?"

"আমারও খিদে পায় নি।"

"ঠিক আছে, তাহলে বাচ্চাদের জন্য একটু চা করি, যদি খাওয়ার পর ওদের আবার খিদে পায়।"

তখন আব বুড়িকে জড়িয়ে না ধরে পাবলাম না। ওর বুকে মাথা রাখতে ও স্থির হয়ে থাকল। অপ্রস্তুত হেসে বাধা দিল।

"তুই তো এমন করিস না ..." যতক্ষণ না আমায় জড়িয়ে ধরার সাহস অর্জন করলো, ততক্ষণ ওভাবেই হাসতে থাকল।

"বাবা ..."

তার কর্কশ চামড়ায় মোড়া আঙ্গুলগুলো ভয়ে ভযে আমার গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছে সে। তারপর একগাল হাসি নিয়ে আমায় আদর করল।

বাচ্চাগুলোর হাসিও শুনতে পেলাম।

"তুই তো এরকম করিস না, তোর কি হয়েছে ? বাবা ...বাছা আমার...খিদে পেয়েছে ? চা করে দেব ?"

ওব গলায় এই স্বব আমি কতদিন যে শুনি নি, তা মনে নেই, অথবা কোনদিন শুনেছি কি না, তাই বা কে জানে?

"ওরা কি মেরেছে ? বল বাছা, তোকে মেরেছে ? কে ওরা ?"

"না আমায় মারে নি।"

"কিন্তু কিছু একটা করেছে, তাই না ? বল বাবা, তুই ওদের ওপর বেগে গেছিস, তাই না ?"

আমি চুপ করে থাকার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভাবার সময় ছিল না। "ওরা সব ধ্বংস করে দিয়েছে ...চুরি করেছে...ওরা চায় না ..."

আমি অনুভব করলাম হঠাৎ ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল, যেন আরও শক্ত হযে গেল ও, "তুই আমায় বলতে চাস্ না ? বলবি না ? বলবি না ?"

"লাভ নেই।"

বাচ্চাগুলো আরও কাছে চলে আসছে, "বলো না, আমাদের বলো না।"

"না বলব না। আগে বড় হও ... এখন বিরক্ত করো না।"

"হ্যাঁ বাবা, এখনও সময় আছে, সময় আছে...সব বদলে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, ওরা যখন বড় হবে ..."

"বড় তো হবেই... এসবের মধ্যেই বড় হতে হবে ..."

"তুই সত্যিই বলবি না ?"

"বলো, বলো না।" বাচ্চারা মাদুরের চারপাশ ঘিরে ধরল।

না, ওদের আমি কিছু বলব না—আমি তো আর এই জন্য বাড়ি ফিরি নি। আর তাছাড়া, ওরা যা-ই ভাবুক, বিশ্বাস করুক, আমি কোনমতেই তা নষ্ট করার ভার নেব না। সময়মত,

এই মিথ্যের আসল সত্যিটা, সব মিথ্যেগুলোর সত্যি ওদের বলে দেবাব দায়িত্ব কেউ না কেউ তো নেবেই। তখন ওরা যৌবন আব বিশ্বাসের বেদিগুলোকে চুরমার করে ফেলবে, মিথ্যে বিশ্বাসের ওপর তৈরি করা এইসব ভুয়ো স্তম্ভগুলোকে তিক্ততার আঘাতে ধ্বংস করবে নিজেরাই। না, আমি তো বলবই না।

"বাছা ... "

বুড়িব গলা শুনে আমি হক্চকিয়ে গেলাম। "বাছা, আমি ঠিক বুঝতে পাবছি না তুই কি বলতে চাইছিস্, সত্যিই বুঝতে পারছি না। কিন্তু তুই কাঁপছিস্—হয় তুই ভয় পেযেছিস্, না হয ভীষণ বেগে গেছিস্ বা ওবকম কিছু—আব তুই যা বলছিস্, তা ভালো কিছু হতে পারে না। কাবণ, তুই কাঁপছিস, তুই সত্যিই কাঁপছিস্।"

হয়ত বুড়ি ঠিকই বলছে, কারণ ও সচবাচর ভুল করে না। তা যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায না, আমি তো বলব না, ব্যস্, আব যদিবা বলি, লাভটা কি হবে? হ্যাঁ, কিই বা লাভ, চারদিকে এমন আবর্জনা, এই নারকীয় আবর্জনা, ওরা সব টের পাবে। অন্য কোন অবস্থা, অন্য খুঁটিনাটি দিয়ে, অন্য নামে।

"এই, তোবা সব শুযে পড়, যা! হ্যাঁ, শুযে পড়। হাঁ করে দেখছিস্টা কি? যা, শুবি যা!"

কিন্তু কেই বা জানে? তাছাড়া, এসব অন্য কেউ বিশ্বাস করবে কেন? একটা ভালো, মহৎ কিছুতে বিশ্বাস করবে নাই বা কেন? যেমন ধরো, আমি যে অবস্থাব মধ্যে, যেভাবে বড় হযেছি, তা তো একেবারে পাল্টে যেতে পারে। ওবা হযত অনেক কিছু সহ্য করতে শিখবে, এতই ধৈর্যশীল হবে যে আমি যা সহ্য কবতে পারি না, তা ওবা হজম করে নেবে। ওদের কথা এখনই বলা যায় কি? হয়ত সময়ে ওবা আরও মেনে নিতে শিখবে, আরও কোমল হবে, হ্যাঁ, আবও মানবিক, কারণ, হযতো বুড়ি যা বলছে, তা-ই ঠিক, এখনও সময় আছে, সময।

"বাবা, বাচ্চাগুলো চলে গেছে।"

"হ্যাঁ—তোমাকে বলতে ক্ষতি নেই, ওবা আমাকে মেরেছে।"

"কে ওরা? কিন্তু আব কিছু কবেনি তো? তুই যে কাঁপছিস্ ..."

"হ্যাঁ, আরও আছে, এটা তো কিছুই নয। আমাকে ওবা ছোট করেছে, আমি নিজে যাতে নিজেব কাছে ছোট হযে যাই, তাই ওবা করতে পেরেছে, আমাকে নিজেব কাছে ছোট করেছে। এটাই আসল। এটাই সব। কিন্তু কেন? ওরা তো জোরগলায় স্পষ্ট করে বলে না। সবটা আমার উপর পড়ে—ধীরে-ধীবে ক্ষয়ে যাওয়ার মত নয়, তাহলে তো টেবই পাওয়া যেত না—হঠাৎ ভারি হযে আসে, মর্মান্তিক স্বরে চিরে দেয ভেতবটা, আরও চেপে বসে, চেপে বসে ..."

"যাই হোক, আমাব মনে হয় এসব আমার না জানাই ভালো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।"

আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলাম। আমরা তখন একে অপরেব এত কাছাকাছি যে, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কে কাঁপছে—আমি, না ও। যদিও আগুনের শিখার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম, দেখলাম এতক্ষণে। উষ্ণতা আমাদের চারপাশে জাল বুনে

দিয়েছে—শিখাগুলো এঁকেবেঁকে যাচ্ছে অদ্ভুত চুনিখচিত নৃত্যে। দেখতে-দেখতে ফিরে তাকালাম, যখন টের পেলাম যে বুড়ি অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, যা শেষমেশ বললও না। শুধু বলল, "বাবা।"

ওর আঙ্গুলগুলো রুক্ষ খসখসে বটে, কিন্তু ওর ঘন গাঢ় ভেলভেট-আলিঙ্গন নরম উষ্ণ, যা থেকে প্রসারিত হয় আমার সেই বলিষ্ঠ পবিত্র বিশ্বাসের বছরগুলোর সুবাস।

অনুবাদ : ঈপ্সিতা চন্দ

গোচারণভূমির নিয়মকানুন ☐ সিপ্রিয়ান এক্‌ওয়েন্‌সি

সাভান্নার যাযাবর রাখালদের এটাই হ'লো নিযম। যে কেউ তার পছন্দ করা মেযেকে নিয়ে ভেগে পড়তে পারে, তা সে কুমারী অথবা সোমথ, বৌ অথবা অবিবাহিতা, যা-ই হন না কেন। কিন্তু পালাবাব সময়ে ধরা পড়লে তাব হেনস্তাব আর শেষ নেই। তবে ধবা না পড়ে প্রেমিকাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে তুলতে পারলে জয়জয়কাব।

আমাদের গল্পের শুরুর দিন সন্ধেবেলায় দুই ভাই-বোনে ঝগড়া হচ্ছিলো। ভাইটি, যার নাম মোদিও, তক্ষুণি তাব বোনকে সজোবে ধাক্কা দিলো।

'কাই!' আমিনা একটু পিছিযে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'হাত ওঠা।' তার ঠোঁট দ'ুটি ফাঁক করা, তবে হাসিতে নয; আর সে রাগে এমন ফুঁসছিলো যে তার বুকের ওঠানামায মনে হচ্ছিলো যে তাব রুপো এবং ফুলের তৈবি গলার হার যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমিনা কোনো বকমে কুঁড়েঘবেব দেযাল আঁকড়ে নিজেকে সামলে নিলো, 'খববদার, আমাকে আব ছুঁবি না।'

আল্লাব কিরে!' মোদিও তেড়ে বললো, 'তোকে কিছু উচিত শিক্ষা দেবো।'

মেয়েটি তার দিকে তাকালো। ছেলেটি তার সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে— বাজপাখির মতো, হাত দুটো বাঁকানো, আঘাত করতে উদ্যত। মাংসপেশিগুলো টানটান, 'তুই কোথাও যাবি না।'

'ওরে মিথ্যেবাদী।' মেয়েটি চেঁচিয়ে বললো, 'আজ রাতে আমি ইয়াল্লার কাছে যাবো। ওকেই আমি বর হিসেবে পছন্দ করেছি।'

'তাহলে যামা-র কী হবে, বাবা যাকে তোর বর হিসেবে ঠিক করেছে? যে গাই-বলদের পাল সে কন্যাপণ রূপে দিয়েছে, তারই বা কী হবে?'

'সে তোদের ব্যাপার।' মেয়েটি জবাব দিলো, 'তোরা কি— ওঃ আমাকে ছেড়ে দে, শয়তান। তুই কি পাগল হলি?'

ভাইয়ের রুক্ষ কড়া হাতের চাপড় এসে পড়লো মেয়েটির গালে। মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে সে তাকে নিয়ে চললো নিজের কুঁড়ের দিকে, মেয়েটি নিজকে ছাড়াবার জন্য হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। ছেলেটি খালি পায়ে লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেললো। ধুলোর ঝড় উঠলো। মেয়েটিকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। সে ধুলোর মধ্যে উপুড়

হয়ে পড়ে রইলো। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। আমিনা তরুণী, ভরা যৌবন তার। পিঠের ওপর ছড়ানো তার লম্বা এলোচুল, সে ধুলোয় চাপা পড়ে রইলো। গালে যে লাল ক্রিম মেখেছিলো, চোখের জলে তা মিশে গেল।

'ওরে হতাচ্ছাড়ী!' দরজার বাইরে থেকে সে ভাইয়ের গলা শুনলো। দরজাটা সে আটকে দিচ্ছিলো। তারপর তাকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে দ্রুত চলে যাবার শব্দ মেয়েটি শুনলো।

হাপুস নয়নে কাঁদছিলো সে, যেন এই চোখের জল তার হৃদয়ের ব্যথা সারিয়ে দিতে পারে, যেন মনের মানুষকে পাবাব ইচ্ছেটা দূর করে দিতে পাবে। কিন্তু নিশ্চয় কোনো আশা আছে, সে ভাবলো। কেউই তাকে, কোনো কিছুই তাকে ইয়াল্লাব কাছ থেকে দূরে সরিয়ে বাখতে পারবে না। সে তার কাছে যাবেই, সে যাবেই।

বুকের মধ্যে তাব ঘৃণা জমছিল। যামা-কে ভালো না বাসতে পারলে সেটা কি তাব অপবাধ? গাই-বলদগুলো তো বাবা আগেই নিয়েছিলো, তারপরে তাকে জানানো হয়। লোকটার হাঁটুর জোর নেই, মেয়েলি স্বভাবের। লোকটা মাদুব বুনতে জানে না, গোরুর পাল মাঠে চরাতেও জানে না। তাকে যখন চাবকানো হচ্ছিলো, তখন সে ভীতুর মতো কাঁদছিলো আর অনেক অনুনয়-বিনয করছিলো। এটা ঠিকই যে সে চাবকানি সহ্য করেছে, কিন্তু মরদোচিতভাবে নয। তাকে বিয়ে করাটা খুব অপমানজনক হবে। তার বাবা যামা-র সঙ্গে তার বিয়ে দিতেই পাবে, কিন্তু সে কখনোই অন্য মেয়েদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শোনার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকবে না। 'তোব বরের কী খবর রে? যে সূর্য ওঠা পর্যন্ত বিছানায় গড়ায়, বৃষ্টিতে আবার যেন ধুয়েমুছে না যায়।' হ্যাঁ হ্যাঁ বরই বটে।

ভুলটা ইয়াল্লার। সে ব্যবস্থামতো কাজ করে নি। ব্যবস্থাটা ছিলো খুব সহজ। কন্যাপণের শেষ কিস্তি হিসেবে গাই-বলদগুলো আনবার আগেই সে আব ইয়াল্লা আস্তানা ছেড়ে পালাবে। মেয়ে বাজপাখি মোরগ চুরি করতে এসে যেমন আওয়াজ করে, তেমনি সে করবে। আর তখনই সে জানতে পারবে যে ইয়াল্লা দরোয়া গাছের নিচে অপেক্ষা করছে।

সে ইয়াল্লাব সঙ্কেতের আশায় ছিলো। সন্ধ্যার শুরুতে হায়েনার দল যখন পাহাড় ছেড়ে পালাচ্ছিলো, সে ভাবছিলো ইয়াল্লার কথা। লম্বা, চওড়া কাঁধ, বাঁধা চুলে তামার বেড়ি— এই মানুষটি পারে অবাধ্য ষাঁড়কে বশ করতে অথবা বাবার আস্তাবলের সবচেয়ে বুনো ঘোড়াকে ঠাণ্ডা করতে। কিন্তু সে যখন তার হাত ধরে তখন তাকে এতো শান্ত আর মিষ্টি দেখায়। তার চওড়া কাঁধে মাথা রাখতে ভালো লাগে তার, ভালো লাগে বাদামী চোখের গভীরে তাকিয়ে থাকতে। ছেলেটি তার দু'কান নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে— মাঝে মাঝে তাকে এমন বিরক্ত করতো যে সে ভয় দেখাতো যে সে যামা-র কাছে চলে যাবে। যামা'র সঙ্গে ইয়াল্লার কী তফাৎ! ভীতু যামা। যামা কি পারবে যখন গাই চরাবার মাঠে তেড়ে ঝড় ওঠে, তখন কি-সে পারবে ঘরদোর সামলাতে। যখন বুনো কুকুর আর হায়েনা, চিতাবাঘ আর সিংহ, গোরুর পালে হানা দেয়, তখন কি সে পারবে তাদের খেদাতে?

বরের মতো বর বটে! সেই কবে থেকে সে নিজেকে তার বৌ ভাবে। পাঁচশো গাই-

বলদ পণ হিসেবে ভালোই, কিন্তু সে তো আর কেনাবেচার বস্তু নয়।

সন্ধের শুরুতে ইয়াল্লা মেয়েটির বাবার আস্তানায় এলো। দরোয়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে শিস্ দিচ্ছিলো। খুবই উত্তেজিত ছিলো মেয়েটি। চিরকালের মতো ঘর ছেড়ে যাচ্ছে সে। কোনো বিদায় সম্ভাষণ নেই, কোনো চোখের জল নেই। এমন একটা লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে ও, যাকে পেলে খুশি মনেই মেরে ফেলবে ওরা। এবড়ো-খেবড়ো নেড়া মাঠটা জুড়ে স্তব্ধতা। আমিনা খুব সাবধানে উঁকি মারলো। তার সামনে ঝোপঝাড়হীন মাঠ। এসবই তার এবং ইয়াল্লার হতে পারে, যদি তারা সাহস করে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় নুয়ে পড়া গাছগুলো, বহমান ঝরনা, পাহাড়তলি, কাঁটাভরা জঙ্গল। তারা সবাই তাকে এবং ইয়াল্লাকে ডাকছে, ডাকছে তাদের জয় করবার জন্য। তারা যেন নিজেদের আস্তানা গড়তে পারে, তাতে থাকবে তাদের নিজস্ব গাই-বলদ। ইয়াল্লা আবার অধীরভাবে শিস্ দিলো এবং এইবার তা সত্যি সত্যিই মেয়ে বাজপাখির হাঁকের মতো শোনালো। সে আর ইতস্তত করলো না।

সে দৌড় দিলো। সঙ্গে কিছুই নিলো না, এমন কি দুধ ঘোঁটবার জন্য তার মা তাকে যে কাঠেব কাঁটাটি দিয়েছিলেন, সেটাও না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার দাদা তাকে বাধা দিলো। তার সঙ্গে ছিলো এক পাল গোরুখেগো বুনো কুকুর এবং সেগুলো সে ইয়াল্লার কাছে ছেড়ে দিলো। আমিনাকে সে বেঁধে ফেলেছিলো এবং তার শাসানি, আঁচড়ানো-কামড়ানো এবং শাপ-শাপান্ত করাকে সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলো। কেননা ইয়াল্লা ও আমিনা গোচারণভূমির নিযম লঙ্ঘন করেছে।

এখন সে কুঁড়েতে বন্দী। তা সত্ত্বেও ইয়াল্লা কোনোদিন তার হবে না, একথা ভাবা তাব পক্ষে অসম্ভব। এখনও নিশ্চয় সুযোগ আছে। যদি যামা-ব কন্যাপণ পাঁচশো গাই-বলদ এখানে পৌছানোর আগেই, যদি গাই-বলদ আসার আগেই যদি সে এই বন্দিশালা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে তার কুঁড়েতে চলে যেতে পারতো! ইয়াল্লার ক্ষমতার জোবে আমিনা তখন তার হ'তো। গোচারণভূমির নিযমকানুন কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সব রাখালেরা এটা জানে এবং মান্য করে। কিন্তু ইয়াল্লা কী ক'রে জানবে যে আমিনা এখন কোথায় অথবা যামা-ই বা কখন আসবে। সব শেষ হয়ে গেল—আবার চোখের জলে ভাসলো আমিনা।

'ও ইয়াল্লা, আমাব ইয়াল্লা, এখানে এসে আমাকে উদ্ধার করো, ইয়াল্লা। আমি তোমার, তুমহ আমার মনেব মানুষ।'

সে দরজা ধাক্কাতে লাগলো, চেঁচাতে লাগলো, শাসাতে লাগলো, যতোক্ষণ না তার দাদা আবার ধমক দিলো চুপ করতে।

ইতিমধ্যেই সে শুনছিলো ঘোড়ার জিন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। তার অন্য ভাইয়েরা মাঠ থেকে ফিরেছে। ওদের একজন বললো ও পরবে কালো ওড়না, আরেকজন বললো শাদা ওড়নাই হলো রীতি। কীসব তুচ্ছ ব্যাপার! দাদা বললো যে সে কনের পেছন-পেছন যাবে। মোদিও-র সঙ্গে যে কাণ্ড ও করেছে, তার পরে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করা চলে না। আর এসবই পাঁচশো গাই-বলদের জন্য।

হঠাৎই সে লক্ষ করলো সবকিছু নিশ্চুপ, নীরব হয়ে গেছে। জটলা বন্ধ হয়েছে, সেই

সঙ্গে কুরুচিকর রসিকতা। ভয়াবহ ছেদ পড়েছে ঐ মাঠে। সে কাশতে শুরু করলো। ঘরের মধ্যে বাতাস ভারি এবং গুমোটে ভরা। তারপর তার দাদার রূঢ় গলার স্বর শোনা গেল :

'আগুন!' সে চেঁচালো, 'আগুন... হ্যাঁ... কে? জল... আগুন!'

আমিনার দিশেহারা অবস্থা। ভারি আগুনের হল্‌কায় ভরে গেল তার ছোটো কয়েদখানা। সে কাশতে শুরু করলো, তার দম বন্ধ হয়ে ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছিলো নিশ্বাস নিতে। মরিয়া হওয়ায় তার দেহে দশজনের বল এলো। সে নিজেকে নিয়ে গেল দরজার কাছে। কুঁড়েঘরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আগুনের কণা এসে পড়ছে। বাইরে ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে, হৈচৈ করছে, গোরুগুলো যাতে ভয় না পায়—সেগুলো সামলাচ্ছে। তাদের চেঁচামেচি তার কানে পৌঁছুচ্ছে না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাদের কি তাব কথা মনে নেই? তারা এমন নিষ্ঠুর হতে পারলো? তাদের গোরুগুলো কি তার জীবনের চেয়েও দামী?

একটা কড়া হাতেব ধাক্কায় তার দরজাটা খুলে গেল। একজন চাপা ভারি গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো। আমি ইয়াল্লা।'

তার মন খুশিতে ভরে গেল। কিন্তু চাপা ঠোঁট থেকে কোনো আওয়াজ বেরলো না। লোকটি তার কোমব জড়িয়ে ধরলো, পা থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো। কুঁড়েতে তার চুল জড়িয়ে গিয়েছিলো, সে কোমল হাতে তা ছাড়িয়ে দিলো। আমিনা নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে। তার মনে হচ্ছে যেন গলার ভেতরে সব হাওয়া ঢুকে গেছে। সে দেখলো হলদে আগুনের শিখা উজ্জ্বল আভায় সাবিবদ্ধভাবে আকাশের দিকে উঠছে। আর আগুনের হল্‌কা থেকে বাঁচানোব জন্য চোখে হাত দিয়ে আড়াল করতে গিয়ে দেখলো তাব ভাইয়েরা এখানে-ওখানে ছোটাছুটি কবছে— শোবার মাদুর, টাকার থলি, দুধের বাটি সামলাচ্ছে। এটা আর স্বপ্ন নয়। সেই কণ্ঠস্বর—এটা বাস্তব।

'ঐ তো ও ওখানে ... ভাইয়েরা ঐ তো আমাদের বোন। ধবো ওকে ... '

'ইয়াল্লা', আমিনা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বললো, 'আমরা এখন কী করবো? ঐ ওরা আসছে।'

'ওরা চেষ্টা করুক না। আমার কুঁড়ে এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। ভালো দৌড় প্রতিযোগিতা হবে।'

আমিনার মনে হলো যেন সে তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। তাকে ঘোড়ায় চাপানো হ'লো।

'এখন তাহ'লে চললাম।' ইয়াল্লা চেঁচিয়ে বললো, 'চলে যাচ্ছি।'

ঘোড়ার প্রতিটি লাফে আমিনার হাড়গুলো যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলো। চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছিলো। পেছন পেছন আসছিলো তার ভাইয়েরা। নিষ্ঠুব অন্যদিকে দক্ষ অশ্বারোহী তারা রেগে আগুন হয়ে আছে। চলন্ত ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি শব্দেই আমিনা সেটা বুঝতে পারছিলো। হা আল্লা, সে কী করবে?

টোয়াং।

একটা তীর এসে পড়লো। এখন হার মানাই ভালো।

'ও ইয়াল্লা, আমরা নেমে পড়ি, ঘরে ফিরে যাই। এভাবে ছোটা বৃথা।' মানুষটার প্রচণ্ড

অট্টহাসিতে আমিনা বোকা বনে গেলো। সে কি ঐ বিষাক্ত তীরটাকে বিদ্রূপ করছে যেটা তাকে কাশতে কাশতে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারে? কী স্নায়ুর জোর! তাদের মিলিত ভাবে ঘোড়াটা এখন হাঁপাতে শুরু করেছে। তারা এখন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। গাছ খুবই কম, ছোটো ছোটো পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এরকম জায়গাতেই ঘোড়া চালানোর বাহাদুরি বোঝা যায়। এরকম পবিস্থিতিতেই চোর হয় মেয়েটিকে পাবে, নয়তো হারাবে। আমিনা দম বন্ধ কবে রইলো। হাজার রকম যন্ত্রণায় তার শরীর কাতর, কিন্তু সে জানে তার পুবস্কার আসন্ন। সেটাই তাকে ভরসা দিলো।

ঘোড়াটার কষ্ট হচ্ছিলো। এমন কি ইয়াল্লার মতো মানুষও যন্ত্রণায এবং ক্লান্তিতে কাতর হযে ঘোড়াটাকে চাবুক মাবছিলো তাড়াতাড়ি ছোটাব জন্যে।

'ইয়ি-দু!' সে চিৎকাব করে বললো। তার মুখ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিলো আমিনাব চোখে 'ইযি-দু।'

আমিনাই প্রথম দেখলো দূবে আলো।

'আমার কুঁড়ে।' ইয়াল্লা বললো, 'আমার নির্জন কুঁড়ে।'

'আমাদের কুঁড়ে বলো।'

সে আবার হাসলো।

টোয়াং! ইযাল্লা কাতবালো, 'ওবা আমায় বাণ মেবেছে! আমার পিঠ-আল্লা আমায় রক্ষা করো, আমি ম'বে যাচ্ছি...।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই ইয়াল্লা পা-দানি থেকে ঝুঁকে পড়লো, কেননা তীরের বিষ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আব যাবা তাকে ধাওয়া কবছে, তাদের সঙ্গে ব্যবধান যতোই কমে আসছে, ততোই আরো তীব এসে পড়তে লাগলো।

'আমি ম'বে গেলে তুমি এগিযে যেও। একবার তুমি আমাব কুঁড়েতে পৌঁছে গেলে ওরা তোমাকে ছুঁতে পারবে না। এটা হলো... হলো...'

ভয়, আতঙ্ক! আমিনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো তার বড়ো ভাইয়েব ছায়া অন্ধকাবে দেখা যাচ্ছে। ইয়াল্লাব এখন শুধু হামাগুড়ি দিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা আছে। আমিনা তাকে টেনেহিঁচড়ে নিযে চললো। সেও এই গাছপালাহীন রুক্ষ ভূমির মেযে—সেবকমই শক্তপোক্ত এবং সাহসী। আব ছেলেটি দ্রুত অবসন্ন হযে পড়ছিলো। তার ওপব অন্ধকারে দিশেহারা গাই-বলদগুলো তাদের পথের মাঝখানে এসে পড়ছিলো। ভেড়াগুলো কাতরভাবে ভ্যা ভ্যা কবছিলো। একটা মোবগ ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আরো ডাক কানে তালা ধবিয়ে দিলো। তারা এখন ইয়াল্লার ভিটেতে পৌঁছে গেছে, তবে কুঁড়ের মধ্যে নয়।

১এই বেটা চোর!'

পোলটির উঠোন ছাড়িয়ে বাড়িব বাগানের কিছু দূরে আমিনা ঝুঁকে পড়লো। সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে ইয়াল্লাকে ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। তারপর ঢুকলো নিজে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ছেলেটি।

'আমার বৌ', কাতরাতে কাতরাতে সে বললো। 'শেষ পর্যন্ত আমার ... কিন্তু এই বাণ। তুমি এখনও পারো বাঁচাতে ... টোট্‌কা ...

'বেটা চোর!' তারা ফুঁসতে ফুঁসতে বললো, 'আমাদের বোনকে ফিরিয়ে দে।'

'চোরই বটে।' তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে সে জবাব দিলো, 'চোর তো তোরাই। পণের গোরুর পাল তোরা চুবি করিস্ নি?'

'যামা-র দেওয়া গাই-বলদগুলোর ক্ষতিপূরণ না পেলে আমাদের বাপ তোদেব দেখে নেবে।'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে।' ইয়াল্লা বললো। আমিনাব দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললো, 'ওঃ আমাব পিঠটা! সেই টোট্‌কা ... '

ভাইযেরা ঘোড়াগুলোর মুখ ঘুরিযে নিলো এবং আস্তে আস্তে নিজেদের শিবিরে ফিরে গেল। ওদেব একজন বললো, 'ঐ ইযাল্লা ছোঁড়াটা সত্যিকাবেব মবদ। আমাদেব ঘবদোবে আগুন দিলো, আমাদেব বোনকে চুবি কবে নিযে পালালো, তাবপব আমাদেবই ঘোড়া ফিবিযে নিয়ে যাবার জন্য (অবশ্য যেটা অন্য পাত্রের জন্য ঠিক কবা হয়েছিলো) উল্টে আমাদেরই চোব বলে গাল দিলো। গোচাবণ ভূমিব নিযমকানুন! ও জিতেছে।

অনুবাদ : সুবীব রায চৌধুবী

বি চি ত্র

যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়, যেন এর কোনোই অর্থ নেই যে, ফোলাসাদে শুধু মারা যায় নি; সে তার চলে যাওয়ার জন্যে বেছে নিয়েছিলো তার প্রথম জন্মদিনটিকেই।

ইথিওপীয় রাজকীয় ঘটনাপঞ্জী

আহমেদ তাব বাহিনীর উদ্দেশে বললেন : 'যদি কোন ক্রীশ্চানেব সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়, তাহলে কেবলমাত্র তার ভাষাতেই কথা বলবে; এবং কাউকে বলো না যে, তোমরা মুসলিম। কাবও সঙ্গে দেখা হলে বলবে, 'আমবা দেগালহান বাহিনীর লোক ; আমবা যাচ্ছি বাজাব খোঁজে।'

তারা দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলো এবং বেশি দূব অগ্রসব হবাব আগেই, কিছুটা দূরত্বে পর্বতচূড়ায় সাদা একটা কিছু দেখতে পেলো। এটাই ছিলো বাজার শিবির এবং এর আকৃতির জন্যই দু'দিনেব পথ বাকি এমন দূবত্ব থেকে তা দেখা গিয়েছিলো। লম্বায় এক-শ'ফুট এবং উচ্চতায় আশি ফুটেবও বেশি। আবিসিনিযাব রাজাদেব ব্যাপাব-স্যাপারই ছিলো এবকম। যখন মুসলিমরা বুঝতে পারলো যে তাবা যা দেখতে পেয়েছে সেটাই রাজকীয় শিবিব, তাবা আব আগেব গতিতে এগোতে পাবলো না, তারা ধীবে এমনভাবে পথ চলতে লাগলো যেন তাদেব অনুসাবীবা তাদেব সঙ্গে যোগ দেবে ; তারা পরেছিলো ক্রীশ্চানদের পোশাক এবং ইমাম তাদেব বললেন, 'আল্লার কসম করো, ইয়েজু ছাড়া অন্য কোনো ভাষায তাদেব সঙ্গে কথা বলবে না।' অতঃপর তাবা ক্রীশ্চানদের সঙ্গে একত্রে পথ চলছিলো আর ক্রীশ্চানরা নিজেদের বিষয় নিয়েই মেতেছিলো এবং অন্যেরা যে মুসলিম হতে পারে সে সন্দেহ তারা কবে নি।

যাত্রাব মধ্যপথেই একজন ক্রীশ্চান মহিলা এসে ইমামকে আবেদন জানালো— সে ভেবেছিলো ইমাম একজন অভিজাত দেগালহান। মহিলা তার কাছে এগিযে এলো; ইমামও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন এবং তিনি মুসলিমদের ভাষায় এইভাবে কথা বললেন: 'যা তার, তা তাকে দিয়ে দাও।' মহিলা কথাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, পিছিয়ে এসে বসে পড়লেন, বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'এরা হলো মুসলমান!' তার এই কথা কেউ খেয়াল করলো না। এভাবে আমাদের লোকজন যাত্রা অব্যাহত রাখলো এবং ক্রীশ্চানরাও তাদের নিজেদের কাজেই ব্যস্ত হয়ে রইলো। তারা যেসব কাজে ব্যস্ত ছিলো, তা হলো— নিজেদের জামাকাপড় কাচা, পর্বতে রাজার কাছে ময়দা বয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা তার কাছে আবেদন জানানোর জন্য পর্বত অতিক্রম করা। তারা কেউ-ই মুসলিমদের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবগত ছিলো না। ... ক্রীশ্চানরা এ বিষয়ে কিছুই জানতো না এবং দেগালহান থেকে প্রেবিত একটি

বার্তা পেয়ে তারা আনন্দে ও ফুর্তিতে হয়ে উঠেছিলো ভরপুর। বার্তায় বলা হয়েছিলো : 'আমি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি, তারা ফতেগারের দিকে নেমে চলে গেছে।'

পথপ্রদর্শক অনন্য ইমামের খোঁজে গেল এবং তাঁকে বললো, 'এই-ই সেই জায়গা; আমরা এসে গেছি। 'পরামর্শ দাও আমাকে।' আহমেদ বললেন, 'তোমার মতামতটা কি?' অন্যজন উত্তর দিলো, 'আমার প্রস্তাব হলো : আপনার সমগ্র বাহিনী সম্মিলিত হবার আগে পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করি; আমরা এখানে রাত কাটাব এবং সকালবেলায় আমাদেব কাছে যে কামান আছে তা তাদের দিকে লক্ষ্য করে স্থাপন করবো ; পেছনেব সারিব অন্যান্য বাহিনী আমাদের সাথে মিলিত হবে, অশ্বারোহীদের আগে থাকবে আমাদের পদাতিক বাহিনী, আমরা পর্বতে আরোহণ করবো এবং আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবে।' উত্তরে ইমাম বললেন, 'ক্রীশ্চানদের বুঝিয়ে দাও যে আমরা মুসলিম অথবা তারা কি বিশ্বাস কবে যে, আমবা দেগালহানের বাহিনী ?' পথপ্রদর্শক প্রত্যুত্তরে বলল, 'বহু-ঈশ্বরে-বিশ্বাসীরা জানে না যে আমবা মুসলিম; তারা আপনাদের অন্য যা কিছুই ভাবুক, দেগালহান বাহিনীর লোক ভাববে না।' 'যেহেতু আমাদেবকে তারা চিনতে পারে নি', আহমেদ বললো, 'তাহলে আর দেবি কেন ? এক্ষুণি আমরা পাহাড়ে আরোহণ করি।' অনন্য উত্তবে বললো, 'অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, যারা আমাদের অনুসরণ করছিলো, তারা কোথায় গেল ? আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করবো না কেন ?' ইমাম আবার বললেন, 'আমাদের অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র ত্রিশজন এবং পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা হবে পঞ্চাশের মতো, অশ্বারোহীবৃন্দ পদাতিক বাহিনীর আগে থাকুক, আর আল্লার ওপর ভবসা রেখে আমরা পর্বত আরোহণ কবি; আরোহনের পর পশ্চাৎবাহিনী আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। যদি আমরা এখানে রাত কাটাই, তাহলে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে এবং নিজেরা অবস্থান নিয়ে আমাদের রাস্তা প্রতিরোধ কবে দাঁড়াবে। যদি একজন লোকও একটা পাথর গড়িয়ে দেয় আমাদের দিকে, তা তুমি যে কামানের কথা বলছিলে তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে। অতএব চলো, এক্ষুণি পাহাড়ে উঠি!' যখন পথপ্রদর্শক বুঝলো, আক্রমণ করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে বললো, 'আমার আর কোনো পরামর্শ নেই; আপনিই এখন আদেশ দিতে পারেন।'

আরও বিস্তৃত আলোচনার পর ঠিক হলো যে, গ্র্যান এবং তার অনুসারীরা এক্ষুণি অভিযানে অংশ নেবে। কিন্তু তারা সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখবে। যাত্রার প্রথম পর্বে সবকিছু ঠিকঠাক চললো, তারপর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো।

যখন ইমাম ও তাঁর সাথীরা পাহাড়ের অর্দ্ধেকটা আরোহণ করেছে এবং একটা বাকোয়াজ সৈন্য সেই সেখানে একটা গির্জা দেখতে পেল, সেটাতেই আগুন ধরিয়ে দিলো। বহু-ঈশ্বরে-বিশ্বাসীরা পাহাড়ের চুড়ো থেকে সেই আগুন দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। মুসলিমরা আগুনের দিকে এগিয়ে গেল এবং আহমেদ চিৎকার করে উঠলো—'যে লোক এ কাজ করেছে, আল্লা যেন তার থেকে কৃপা প্রত্যাহার করে নেন।' তারপর তিনি সাথীদের উদ্দেশে বললেন, 'ঘোড়াদের চাবুক লাগাও এবং আরও উপরে উঠতে থাকো, কারণ, শত্রুরা আগুন দেখতে পেয়েছে।' ক্রীশ্চানরা অনেকেই তাদের ঘোড়ায় জিন পরাচ্ছিলো, আবার অনেকে ঢাল পরে নিচ্ছিলো।

ছল বা প্রতারণার সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলে মুসলিম অশ্বারোহীবৃন্দ যুদ্ধের কায়দায় আক্রমণ করলো, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলো,— 'আল্লা ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর পয়গম্বর।

তারা একক ব্যক্তির মতো আক্রমণ করলো, বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের আক্রমণ কবার উদগ্র ইচ্ছায় নিজেদের মধ্যে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। তাবা প্রতিপক্ষব মাঝখানে এগিয়ে গেল। যুদ্ধেব সময় তারা তাদের মধ্যের শ্রেণীবিভক্তি অমান্য করলো। একঘন্টা সময়ও পাব হযেছে কি হয় নি, আল্লা অবিশ্বাসীদেব মনেব ভেতর আশঙ্কা প্রবিষ্ট করিয়ে দিলো, তাবা অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালো, মুসলিমবা তাদের পশ্চাদধাবন করলো এবং তাবা হাগা নামক একটা উঁচু পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল। বহু-দেবতায-বিশ্বাসীবা সেখানে পৌছালে মুসলিমরা দৃঢ়চিত্তে তাদের মুখোমুখি হলো। তাদের মধ্যে একজন, আউ আবু বকব ফকিব, রাজার প্রিযভাজন এক অবিশ্বাসীকে আক্রমণ করলো। তাকে ঘোড়াব জিন থেকে ফেলে দিয়ে জিগ্যেস করলো, 'তুমি কি আবিসিনিয়াব বাজা ?' 'না, না, আমি না, আমাকে হত্যা কোব না।' উত্তবে একথা বলতে বলতে সে আঙুল দিয়ে দেখালো, 'রাজা আছেন ওই খানে।' আবু বকর প্রত্যুত্তবে বললো, 'তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছো।' দু'জনের মধ্যে এধরনেব কথোপকথন যখন চলছে এবং যখন সৈন্যবা দেখলো তাঁদেব মনিবকে একজন মুসলিম অপহরণ করছে, তাবা সবাই ওই মুসলিমেব ওপব ঝাঁপিযে পড়লো। কযেকজন তাব ঘোড়া ছিনিযে নিলো এবং অন্যেরা তাকে শাবীবিকভাবে আক্রমণ কবলো। যখন ইমাম সেখানে হাজিব হলেন তখন সে বন্দী। তিনি তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় তাকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ কবে তাকে মুক্ত করলেন। বাম হাতে তববাবিসহ (কারণ তিনি ছিলেন বাঁ-হাতি) আহমেদকে দেখে আবিসিনিয়াব বাজা চিৎকার কবে সাথীদেব বললেন, 'দেখ, শয়তান সশবীরে হাজিব।'

উপরিউক্ত সম্মুখযুদ্ধ, যাতে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন, সংঘটিত হযেছিলো ১৫৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলাফল নিষ্পত্তিমূলক হয় নি, কারণ সম্রাট লেবনা দেংগেল অক্ষতভাবে পলায়ন করতে সমর্থ হন। তিনি আরও ন' বছর দেশ শাসন করেন। কিন্তু সেই সবটা সময় প্রায পলাতক হিসেবেই। এই সময়ে গ্র্যান-এর বাহিনী ইথিওপিযার সর্বত্র পরিভ্রমণ করে। এর মধ্যে একটি স্থান হলো আম্বা গেশেন,—সেই উঁচু পাহাড় যেখানে রাজকীয় পরিবারের সন্তানদের আটকে রাখা হযেছিলো, যাতে তারা সিংহাসনের জন্য চক্রান্ত করতে না পারে। মুসলিম সৈন্যদের অগ্রযাত্রা সম্বন্ধে বিবরণদাতা বলছেন :

তারা অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে পাহাড় নদী পেবিয়ে এসে পৌছুল সেই নির্দিষ্ট আম্বায় (অর্থাৎ সমানচুড়ো পর্বতে)। তাবা বুঝতে পারলো এ এমন এক উঁচু ও খাড়াই পর্বত যা শুধু সিঁড়ির সাহায্যেই আরোহণ করা সম্ভব। পাহাড়ের চূড়ায় এক হাজারের বেশি বাড়ি রয়েছে। সেগুলোতে রাজার সন্তানরা বাস করে। সেখানে যেমন বাড়ি আছে, তেমনই আছে বেশ কিছু নদী। কোনো পুত্রসন্তান জন্মালে রাজা তাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিতেন, যাতে সেই সন্তান রাজ্যে কোন সংঘাত বাধাতে না পারে। রাজা মারা যাবার পব একজন

রাজপুত্রকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনা হয় এবং রাজা হিসেবে তাকে অভিষিক্ত করা হয়। আম্বায় মোট ২৩০০ রাজপুত্র ও রাজকুমারী ছিলেন; রাজা তাদের খাদ্য ও কাপড়জামা সরবরাহ করতেন।

গ্র্যান যখন বুঝলো এই পর্বত দখল করা যাবে না তখন তিনি ওই জায়গা ছেড়ে লেক হেযাক এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন। অবিরত লুণ্ঠন চলতে লাগলো, বিশেষত চার্চের। বিবরণদাতা চার্চের পাশে সংঘটিত এরকম একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন :

আমাদের লোক এগিয়ে গিয়ে চার্চের ওপর উঠে পড়লো, তার ভেতরে প্রবেশ করলো: সেখানে তারা সব বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পেলো। চার্চের গায়ে জড়ানো সোনা জ্বলজ্বল করছে ... সৈন্যরা চার্চে প্রবেশ করলো এবং কে কোন্‌টা নেবে এ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো : কেউ কেউ তরবারি দিয়ে, কেউ কেউ ভোজালির সাহায্যে সোনার পাত ছিন্নভিন্ন করলো; চার্চের ছাদ ও ভেতরের অংশ মোড়া ছিলো যে সোনার পাত দিয়ে, তার কিছুটা করে অংশ প্রত্যেক সৈন্যই নিয়ে গেল ... মুসলিমরা সবই নিয়ে গেল এবং তারপর পর্বতের পাদদেশে ইমামের কাছে গেল তারা।

হারারের মুসলিম নেতা হিসেবে গ্র্যানের কাছে লেক হায়াক ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে ষোল বছর আগে ক্রীশ্চানরা বন্দি করে নিয়ে যায় এবং এই দ্বীপে আটকে রাখে। দ্বীপের পুরোহিতরা তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলে গ্র্যান তাদের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনীর সকল আরবীয়দের ডেকে বললেন :

'আমরা শুধু পাহাড় ও স্থলভূমির বিষয়েই অবগত; জলপথ তোমাদের বিষয়, তোমরা এটা বোঝো। আমাদের প্রতি তোমাদের কি উপদেশ? তোমরা কি করবে?' তারা উত্তরে বললো, 'আমাদের বড়ো বড়ো কড়িকাঠ দরকার এবং তারপর আপনারা দেখুন, আমরা কি করি।' ইমাম তাঁর সৈন্যদের আদেশ করলেন—যত কড়িকাঠ পাওয়া যায় তা নিয়ে আসতে। তারা অনেক কড়িকাঠ নিয়ে এলো এবং হ্রদের ধারে জড়ো করে রাখলো। তারপর তারা বললো, আমাদের জন্য কিছু আংটা নিয়ে এসো। ইমাম প্রচুর সংখ্যায় এইসব আনার আদেশ দিলেন। একঘন্টার মধ্যে দশ হাজারের বেশি আংটা আনা হলো। আহমেদ তাদের বললো, 'এবার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করো; আমরা তোমাদের কাঠের গুঁড়ি ও আংটা এনে দিয়েছি।' আরবরা একত্রিত হয়ে ইমামকে বললো, 'ঠিক আছে, আপনারা যা আদেশ করেছেন তাই আমরা করবো, তবে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য আমাদের তিন/চারদিন সময় দিন।' ইমাম বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হোক!'

তারপর তারা তিনটি বিশাল ও দু'টি ছোট ভেলা বানানোর কাজে প্রবৃত্ত হলো। সহজেই তাদের কাজ সম্পন্ন হলো। ... ইমাম তাদের বললেন : আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, অতএব একটা ভেলা হ্রদে ভাসানো হোক।' তারা একটা ছোট ভেলা নিয়ে গেল হ্রদের মাঝখানে। আহমেদ দেখলেন, ভেলাটা স্বচ্ছন্দে জলে ভেসে বেড়াতে পারছে না। তিনি তাদের বললেন, 'এটা চ'ড়ে ক্রীশ্চানদের কাছে যাবার আগেই তারা পাথর আর বর্শা ছুঁড়ে তোমাদের শেষ করে দেবে।'

যখন সেনাবাহিনীর লোকেরা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে, একজন তরুণ সৈন্য উঠে

দাঁড়িয়ে বললো :

'আমার একটা পবিকল্পনা আছে।' ইমাম বললেন, 'খুলে বল।' 'একটা গরু জবাই করতে হবে। তার চামড়া ছাড়িয়ে তা দিয়ে বস্তা তৈরি করে সেটা ফুলিয়ে তুলুন। আমার নির্দেশ অনুযায়ী অনেকগুলো বস্তা তৈরি করে কাজ করতে হবে। আমি দেখিযে দেবো আমাদের ঠিক কি করতে হবে। সেইভাবে বস্তা তৈরি করা হলো, তারপর সে প্রত্যেক ভেলাব সঙ্গে বস্তাগুলো বেঁধে দিতে বললো। তারা প্রত্যেক ভেলাব সঙ্গে ন'টা করে বস্তা বাঁধলো। তিনটি সামনে, তিনটি পেছনে এবং তিনটি মাঝখানে। তারপর ইমাম বললেন, 'হ্রদে ভাসিযে একটা ভেলা পরীক্ষা কবো।' একটা ভেলা ভাসানো হলো, লোকজন তাব ওপব উঠলো এবং ভেলাটা তীবেব মতো ছুটতে লাগলো। তা দেখে ইমাম খুব খুশি হলেন এবং বললেন, ঠিক এটাই আমি চাইছিলাম।

দ্বীপবাসীরা এই জলযানগুলো দেখে একেবারে বিমর্ষ ও নিস্তেজ হযে পড়ে।

দ্বীপে যেসব ক্রীশ্চান বাস কবতো তাবা যখন দেখলো, পরীক্ষা কবার সময ভেলাটা পাখিব মতো ভেসে বেড়াচ্ছে তাবা ভীষণ ভীত অনুভব করলো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো : মুসলিমবা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহাবেব জন্য এমন একটা জিনিস বানিযেছে, যা আমরা আগে কখনও দেখি নি। ওটা আরবদেব কাজ; তাদের কামান আছে। যদি আমবা তাদেব প্রতিবোধ কবি, তাবা আমাদেব হত্যা করবে এবং আমাদের চার্চ জ্বালিযে দেবে, আমবা তাদেব বিরুদ্ধে কিছুই কবতে পাববো না।

তাবপব তারা তাদের বন্দীকে ফেরত দিতে এবং গ্র্যানকে তার ধনসম্পদ প্রত্যর্পণ করতে রাজি হলো এই শর্তে যে, জীবনের ওপব হামলা করা হবে না এবং চার্চ জ্বালিয়ে দেয়া হবে না। এভাবে শান্তি স্থাপিত হবার পব মুসলিমদের মধ্যে একজন প্রতিশ্রুত ধনসম্পত্তি আনার জন্য ভেলায ভেসে ওই দ্বীপে গেল। দেখা গেল, ধনসম্পদের মূল্য তাদের প্রত্যাশিত পরিমাণের চেযে অনেক বেশি।

অনুবাদ : শফি আহমেদ

নষ্ট অতিথি আজন্তলা ☐ এমস্ টুটুওলা

অনেককাল আগে একগ্রামে একজন শিকাবী বাস কবত। সংসারে তাব বউ ছিল কেবল। বউটি পোয়াতী হলে গ্রামেব বুড়োরা শিকাবীকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তোমার এখন বনেব প্রাণী শিকার কবা উচিত নয। প্রসবেব আগে পর্যন্ত যদি তুমি শিকাব বন্ধ না রাখ তাহলে তুমি গর্ভেব শিশুটিকে হত্যা কববে। তোমাব স্ত্রী একটি ভয়াবহ প্রাণী প্রসব কববে।

বুড়োবা বাড়ি ফিবে গেলে শিকাবী ওদেব কথা উড়িয়ে দিযে বলল, যত্তসব কুসংস্কাব।

গ্রামেব অন্য শিকাবীরা তাদের স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় শিকাব সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এই সময় শিকার কবা মানে গর্ভেব শিশুটিকে হত্যা করা। তাহলে শিশুটি বন্যপ্রাণীতে রূপান্তবিত হবে এবং জন্মের পব জঙ্গলে চলে যাবে।

যাহোক, নির্ধাবিত সমযে শিকারীব বউ একটি পুত্রসন্তানেব জন্ম দেয়।

মাতৃ-জঠব থেকে বেবিযেই শিশুটি অবাক বিস্মযে চাবদিকে তাকায, হাঃ হাঃ পৃথিবীটা এই রকম! আমি কি কবতে এখানে এসেছি! স্বর্গে বাস কবাব সময আমাব ধাবণা ছিল পৃথিবীও স্বর্গেব মতো সুন্দব। চাবদিকেব সবকিছু কি জঘন্য নোংরা। অবশ্য স্বর্গে ফিবে যাওযার আগে আমি এখানে বেশিদিন থাকবো না।

নিজে নিজে এইসব কথা বলে ছেলেটি বক্তেব মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ায। টলমল পায়ে ওব মায়েব ঘবের চাবদিকে ঘুবে বেড়ায।

বাইবে অপেক্ষমাণ লোকগুলো একই সঙ্গে বিস্মিত এবং বিব্রত হয। বলাবলি কবে, কি সর্বনাশ, দেখ দেখ ছেলেটি জন্মেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং হাঁটছে।

মায়ের কণ্ঠে গভীর আর্তনাদ ধ্বনিত হয, হায় বিধাতা, কোন মহিলা এমন ভযানক শিশু জন্ম দিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

ছেলেটি ন্যাকড়া ও সাবান দিযে নিজের শরীরের রক্ত পবিষ্কাব ক'বে ওর মায়ের এক টুকবো কাপড় গাযে জড়িয়ে নেয়। তারপর উঁচু একটি টুলের ওপর বসে উপস্থিত সবার দিকে তাকায। ওর দৃষ্টিতে কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না।

ওহ্, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। এখন আমি কি খেতে পারি!

কথাটি বলে ও বড় করে শ্বাস টেনে সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ নেয়। ওর মায়েব পাশের ঘরটিতে খাবার রাখা ছিল।

চমৎকার! আমি খুব আনন্দিত। আমি তো ঐ ঘর থেকে মজাদার খাবারগুলো খেয়ে নিতে পাবি। ওখানেই যাওয়া যাক।

বিস্ময়ে উপস্থিত লোকজনের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে যায়। ছেলেটি একটুও ভয় পায় না। বরং সবার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ও পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে। কুড়িজন কিংবা তারও বেশি লোকের জন্য যে খাবার তৈরি করা হয়েছিল ছেলেটি এক নিমেষে তা সাবাড় করে। এরপর ও লাথি দিয়ে সমস্ত বাসন–কোসন টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। এত কিছু করে ও ঘর থেকে বের হয় এবং উপস্থিত লোকজনের মাঝখানে এসে বসে। প্রত্যেকে তাদের বিশুষ্ক ঠোঁট এবং নিষ্ক্রিয় হাত নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুভ সন্ধ্যা, নবজাতকের মা। বিধাতার অসীম করুণা যে আপনি নিরাপদে সন্তান প্রসব করেছেন। আমরা আশা করি, শিশুটির জন্মের পর আপনার কোন সমস্যা হয় নি?

ঘন্টাখানেক আগে ছেলেটির জন্মের খবর শুনে গ্রামের লোকেরা এসেছে মা'কে অভিনন্দন জানাতে এবং নবজাতককে দেখতে।

অসুখী মা ওদেরকে জানায়, প্রসবের সময় আমার কোন সমস্যা হয় নি। বিধাতার করুণায় আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ...।

গ্রামেব লোকেবা বাড়ি ফিরতে–ফিরতে বলাবলি করে, সন্দেহ নেই যে বাচ্চাটি সত্যিকার শিশু নয়। ওর বাবা যেসব পশু হত্যা করেছে এই শিশুটি তাব কোন একটির প্রেতাত্মা হবে।

জন্মের সাতদিন পর ছেলেটির নামকরণ অনুষ্ঠান করাব জন্য গ্রামের কয়েকজন লোক ওব বাবার বাড়িব আঙিনায় জড়ো হয়। যদিও ও একটি ভয়াবহ শিশু তবু নাম তো একটি রাখা চাই।

লোকেরা যখন প্রার্থনা করছিল, 'শিশুটি দীর্ঘজীবী হোক। এবং . . . ।' ঠিক তখনি ছেলেটি ওদের মাঝখানে এসে বসে এবং প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকায়। যে মুহূর্তে শিকাবী বাবা চাচ্ছিল যে গ্রামের বয়স্ক মানুষটি তার ছেলের নাম ঘোষণা করুক তখনি ছেলেটি নিজেই চিৎকার করে বলে, আমাব নাম আজন্তলা। আমার অন্য নাম রাখার কোন প্রযোজন নেই। লোকেরা প্রথমে আতঙ্কিত হয়। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং বিপন্নবোধে অসাড় হয়ে যায়। নামকরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা ধরনের খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। কোলা, মধু, প্রচুব মরিচ সহকারে গিরগিটির মাংস, নানারকমের পানীয় এবং একগাদা তেতো কোলা অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছে।

সবাই যখন খাওয়া শুরু করতে যাবে তখন আজন্তলা অপ্রত্যাশিতভাবে লোকদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজনের শরীরে ধারালো লোহার দণ্ড ঢুকিয়ে দেয়। যখন সে আর একজনকে আক্রমণ করার জন্য ঘুবে দাঁড়ায় তখন অন্যরা পড়িমরি করে ছুটে বেরিয়ে আসে এবং দ্রুতবেগে পালাতে থাকে। আজন্তলা ওদের পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু বেশিদূর যায় না। খানিকটুকু গিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

গ্রামে রটে যায় যে, শিশুটি কোন ভয়াবহ বন্যপ্রাণীর প্রেতাত্মা। বুড়োরা রেগে গিয়ে

বলে, আমরা ওর বাবাকে পশু হত্যা না করার জন্য সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাদেব কথা শোনে নি। এখন ওর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

ওহ্ খুব ভাল, এটি একটি মোটা লাঠি, এই বলে আজন্তলা উঠোন থেকে লাঠিটা নিয়ে ঝনাৎ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ওর বাপসহ পরিবারের অন্যদের ঐ লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। ভয়ানক পিটুনি খেয়ে সবাই দিশেহাবা হয়ে পড়ে। কোনরকমে দরজা খুলে দৌড়ে পালিযে বাঁচে। অবশ্য আজন্তলা ওর মা'কে কিছুই বলে নি।

আব কি কবাব আছে। হাঁ, আরো অনেক কিছু করাব আছে।

এক মুহূর্ত ভেবে নেয যে কি করবে। তাবপর একটা কুড়োল নিযে ঘবেব দেয়াল কাটতে শুরু কবে।

ওর মা চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে থাম, থাম।

বাধা দিচ্ছ আমাকে? তাহলে তো মনে হচ্ছে তোমাবও কোন আক্কেল নেই। ঠিক আছে, দাঁড়াও, অন্যদেব মতো আমি তোমাকেও কঠিন শিক্ষা দিচ্ছি।

এই বলে অজন্তলা ওব মা'র গালে সাতটা চড় মারে।

বাইবে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। সে বিস্মিত হয়ে বলে, ওহ্ আজন্তলা, তুমি তো দেখছি একটা নিষ্ঠুব ছেলে। তুমি তোমাব মা'কে চড় মাবতে পারলে?

কথাটা শেষ কবতে না করতেই আজন্তলা মা'কে ছেড়ে দিয়ে বাবান্দা থেকে লোকটার ওপব ঝাঁপিযে পড়ে। তাকেও সাতটা চড় মারে।

কাছে দাঁড়ান আর একজন লোক ওকে বাধা দেয, এ কি কবছ আজন্তলা? থাম।

কথা শেষ করতে না করতেই সবাব চোখেব সামনে আজন্তলা লোকটির ঘাড় কেটে ফেলে।

ও এত ভযাবহ হযে উঠেছে যে গ্রামেব লোকজন ওদের বাড়িব ছাযা মাড়ান বন্ধ করে দিযেছে। সারাক্ষণ ছেলের উৎপাতে ওর মা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাব মরাব উপক্রম হয।

শেষমেষ, একদিন ভোববেলা ওর মা ওকে নিয়ে দূবের বনে যায। ওকে প্রচুর মিষ্টি ফল খেতে দিযে বলে, তুমি এই গাছেব নিচে বসে থাক। আমি ফিবে না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না। আমি এলে তোমাকে বাড়ি নিযে যাব। এখন ঘরের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে আমাকে যেতে হচ্ছে।

এই বলে ওর মা কৌশলে ওকে বনে ফেলে রেখে গ্রামে ফিরে আসে।

ওর বাবা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আজন্তলা কোথায় ?

শয়তান ছেলেটিকে বনে ফেলে রেখে এসেছি।

ওব বাবা তো অবাক, ও ওখানে থাকতে বাজি হলো ?

ওর মা মাথা নেড়ে বলে, কৌশলে রেখে এসেছি।

খুব ভাল করেছ। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব! জান, এখন বুঝি যে কখনো-কখনো বড়দের সতর্কবাণী শুনতে হয়।

ওর বউ শান্ত স্বরে বলে, এসব বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছ গো ?

আর কি বোঝাব? এর অর্থ সোজা। তোমার গর্ভাবস্থায় কয়েকজন প্রবীণ লোক

আমাকে পশুহত্যা করতে নিষেধ করেছিল। আজন্তলা ঐ সতর্কবাণীর ফল। আমাব বিশ্বাস ঐ সময আমি যে পশুগুলো হত্যা করেছিলাম আজন্তলা তার একটি। এতে কোন সন্দেহ নেই।

ওহ্, না। আমি আর অবাক হচ্ছি না। এখন বুঝতে পারছি যে আজন্তলা কেন এমন আচরণ কবে। আমারও বিশ্বাস যে ও মানুষ নয়।

এদিকে আজন্তলা বনের মধ্যে অপেক্ষা করতেই থাকে, কবতেই থাকে, কিন্তু ওব মা আব ফিরে আসে না। ও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায আব মাকে খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে ও বেশ ভেতবে চলে আসে। ওখানে একটি ছোট বাড়ি দেখতে পায়। বাড়িটির চারদিকে শস্যের খামাব। তিন ভাই ওখানে বাস করে। ওদেব নাম ছাগল, সিংহ ও ভেড়া। ভেড়া ছিল সবার বড়। সেকালে তাবা মানুষ ছিল এবং ঐ বাড়িতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত।

একদিন তিন ভাইযে কাজেব অবসবে গল্পগুজবে মেতে আছে তখন আজন্তলা গুটিগুটি পাযে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

শুভদিন, মহোদয়রা।

ও সবাইকে অভিবাদন জানায়।

শুভদিন, হে বালক।

ভেড়া অভিবাদনের জবাব দেয়। ও কেন এসেছে তা জানার জন্য অন্যবা ওব দিকে তাকিযে থাকে।

নিজেকে একজন ভাল ছেলে ধরে নিযে ও খুব বিনযেব সঙ্গে বলে, দেখুন মহাশয, আমি একজন পথিক। আজ আমি আমাব গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারব না। সম্ভবত আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেও পাবব না। আমি খুব কৃতজ্ঞ হব আপনাবা যদি কযেকদিন আমাকে আপনাদের অতিথি হিসেবে থাকতে দেন। তারপর আমি আবার আমাব যাত্রা শুরু করব।

অন্য ভাইদেব পক্ষ হয়ে ভেড়া বলে, আসলে তুমি তো ছোট। তবু যখন আমাদের কাছে কযেকদিন থাকতে চাচ্ছ, ঠিক আছে, থাক। আমরা তোমাকে এইটুকু দয়া করব।

আজন্তলা আভূমি নত হয়ে বলে, ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। বিধাতাব অসীম কৃপা।

থাকাব অনুমতি হয়ে গেল। আজন্তলা ওদের সঙ্গে খায়-দায এবং কাজকর্ম করে।

এমন বিলাসী জীবনযাপন কবার পর আজন্তলা বলে, স্যাব, আমি আব এখান থেকে কোথাও যেতে চাই না। আমি আপনাদের চাকর হয়ে থাকব। যা হুকুম করবেন তাই শুনব।

তিন ভাই ওর কথায় রাজি হয়।

পরদিন সকালে খাবার সংগ্রহ করার জন্য আজন্তলা ছাগলেব সঙ্গে খামারে যায়। প্রচুর ফল সংগ্রহ করে ঝুড়ি বোঝাই করে ওরা। বাড়ি ফিরতে হবে। ছাগল বলে, ঝুড়িটা মাথায় তুলে নে আজন্তলা।

এ আপনি কি বললেন, জনাব ছাগল?

আজন্তলার প্রশ্নে ছাগলের মনে হয়, কি করতে হবে ও তা বুঝতে পাবে নি। তাই সে আজন্তলাকে ঝুড়িটা বহন করার কথা আবার বলে।

ইস, বললেই হলো? আমাকে ঝুড়ি টানতে বলছেন? আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা! এমন শিক্ষা দেব না?

এমন পুঁচকে ছেলে ওর আবার কি ক্ষতি করবে?

ছাগল সন্দেহের চোখে আজন্তলার দিকে তাকায়।

আজন্তলা কাঁকড়ার মতো থপ্থপ্ শব্দে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে। ওর হাতে একমুঠো ধুলো। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছাগলের চোখে ধুলো ছুঁড়ে মাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় ছাগল বিমূঢ়। ও টলমল পাযে সাহায্যের জন্য এদিক-ওদিক করে। তখন আজন্তলা পাথবের ভারি টুকরো দিয়ে ছাগলেব কপালে আঘাত করে। ছাগল পড়ে যায়, কপাল থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর আজন্তলা ছাগলকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে এবং ওর মাথার ওপর ফলেব ঝুড়িটা উঠিয়ে দেয।

বাড়ি ফেরাব পথে ছাগলকে সাবধান কবে দিয়ে বলে, জনাব ছাগল, খামারে যা ঘটল তা কিছুই আপনি অন্যদেব বলতে পারবেন না।

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায হোক—ছাগল ওর কথায রাজি হয়। নাহলে আজন্তলা ওকে আরো বেশি পিটুনি দিতে পারে।

ওদেবকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে অন্যরা ভয়ে চোখ বড় করে তাকায়, ব্যাপার কি? খামাবে কি ঘটল? তোমার চোখে আব মাথায় আঘাত পেলে কিভাবে?

ছাগল হাত দিয়ে বক্ত মুছতে মুছতে বলে, একটা বড় পাথর মাথাব ওপর পড়েছিল।

পরদিন ভেড়ার পালা। খামার থেকে খাবাব সংগ্রহ করতে হবে। আজন্তলা সঙ্গে যায় এবং ছাগলের সঙ্গে যেই আচরণ করেছে সেই একই আচরণ ভেড়াব সঙ্গেও করে। তার পবদিন সিংহ খামারে গেলে আজন্তলা একই আচরণ করে।

আজন্তলাকে নিয়ে তিন ভাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এভাবে চলা যায় না। ও ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ ও শক্তিশালী।

একদিন রাতে আজন্তলা শুতে গেল। ওরা বুঝতে পারে নি যে আজন্তলা কখনো ঘুমোয় না। প্রথমে ভেড়া বলে, আমার খুব ভয় করছে। আজন্তলা একটা অনিষ্টকারী অতিথি। আমাদের একটা পথ বের করতে হবে। যদি আমরা এখান থেকে পালাতে না পারি তবে একদিন ও আমাদেবকে মেরে ফেলবে। ছাগল ভেড়াকে সমর্থন কবে, ঠিক বলেছ। একদিন ও আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।

সিংহ শান্তস্বরে পরামর্শ দেয়, আমার মনে হয় জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে কাল খুব ভোরে আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত যে ও জেগে ওঠার আগে আমরা এমন জায়গায় চলে যেতে পারব যে ও আর আমাদের খুঁজে পাবে না।

অন্য দু'জন সঙ্গেসঙ্গে বলে, তোমার কথাই ঠিক, সিংহ। সবচেয়ে ভাল হয়-আমাদের জিনিসপত্র এবং খাবার-দাবার যদি ঝুড়িতে ভরে রাখি, তাহলে ভোর পাঁচটায় আমরা রওনা দিতে পারব।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা জিনিসপত্র একটি ঝুড়িতে ভরে ফেলে। পথে খাবার জন্য প্রচুর

খাবার-দাবারও সঙ্গে নেয়।

সবকিছু গুছিয়ে রেখে তিন ভাই ঘুমুতে যায়।

কিন্তু আজন্তলা তো ঘুমোয় নি। ও ওদের সব কথা শুনেছে। ও পা টিপেটিপে উঠে পড়ে। তারপর বড় বড় শুকনো পাতা দিয়ে নিজেকে মুড়ে ঝুড়ির একদম নিচে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

ভোর পাঁচটায় তিন ভাই রওনা করে। ছাগল তার মাথায় ঝুড়িটা উঠিয়ে নেয়। ওরা ভাবে যে, ওরা আজন্তলার হাত থেকে বেঁচে গেল। এদিকে আজন্তলা তো ওদের ঝুড়ির মধ্যে।

চার মাইল হাঁটার পর ওরা একটি গাছের কাছে আসে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্য গাছের নিচে বসে।

ওহ্, আমরা আমাদের চমৎকার বাড়িটি ফেলে এলাম। এখন আজন্তলা ওটার সবকিছু দখল করবে। সিংহ বেদনার্ত স্বরে বলে।

ভেড়া বলে, তুমিই কি সেই ব্যক্তি নও যে আজন্তলাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দেয়ার ব্যাপারে রাজি হয়েছিলে। ছাগল ভেড়াকে সমর্থন করে, হ্যাঁ, আমিও জানি, তুমিই রাজি হয়েছিলে।

সিংহ সঙ্গেসঙ্গে অস্বীকার করে, না, কিছুতেই আমি না। ছাগল রাজি হয়েছিল।

অসম্ভব, হতেই পারে না। তুমি রাজি হয়েছিলে। ছাগল চেঁচিয়ে বলে।

সিংহ গর্জন করে ওঠে, খবরদার ছাগল! আমি নিশ্চিত যে তুমিই রাজি হয়েছিলে।

ওহ্, না। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বোল না, সিংহ।

সিংহ আবার গর্জন করে ওঠে, আমি বলছি চুপ কর। এখনো যদি তুমি স্বীকার না কর যে তুমিই সেই ব্যক্তি যে আজন্তলাকে থাকতে দিয়েছিলে, তাহলে আমি এই মুহূর্তে তোমাকে খেয়ে ফেলব। হ্যাঁ, এখুনি খাব, কারণ আমি খুব ক্ষুধার্ত।

ঠিক আছে, আজন্তলার অনুরোধ রাখার ব্যাপারে আমিই যদি সেই ব্যক্তি হই তাহলে যে মাটির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা ফাঁক হয়ে যাক এবং মাটি আমাকে গ্রাস করুক। আর যদি তা না হয় তাহলে এমন কোন শক্তি আজন্তলাকে এখানে নিয়ে আসুক, যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

ছাগল এমন অভিশপ্ত কথা উচ্চারণ করতে না করতেই আজন্তলা ঝুড়ি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে ওকে দেখামাত্র ভয়ে তিনজন তিনদিকে দৌড়াতে থাকে।

সিংহ বনের দিকে এবং ছাগল আর ভেড়া গ্রামের দিকে পালায়। তারপর দু'জনে গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত হয়। সিংহের সঙ্গে শত্রুতা শুরু হয়। এ কারণেই সিংহ ছাগল বা ভেড়াকে দেখলেই হত্যা করে। কারণ, অতীতে তারা সিংহের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল।

এভাবেই আজন্তলা তিন ভাইকে আলাদা করে দেয়।

অনুবাদ : সেলিনা হোসেন

আকে—শৈশবের দিনগুলো ▢ ওলে শোয়িঙ্কা

পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী কবা ছিলো অসম্ভব। একটা হৈবৈ, একটা মেজাজ বাড়িতে জাঁকিয়ে বসতো; অতিথি, আত্মীয়স্বজন, আকস্মিক অভ্যাগত দবিদ্র আত্মীয়, তুতো ভাই, ভবঘুরে—সকলেই একটা বোধগম্য অনুভূতিব কাঠামোয টেব পেতো এবং তাবপব এটা ঘটতো। একটা ছোট্ট ঘটনা কিংবা আবো প্রাযশ কিছুই ঘটতো না—এমন কিছু যা আমি লক্ষ্য কবতে পারি, বুঝে ওঠা তো দূবস্থান, কিন্তু হঠাৎ সব কিছু পাল্টে যেতো। পরিচিত মুখগুলোই ভিন্ন বকম দেখাতো এবং ক্রিয়া কবতো। যেখানে তা ছিলো না, সেখানে চেহারা-বৈশিষ্ট্য দেখা দিতো, আবার যেখানে তাবা ছিলো আমাদেব অস্তিত্বেব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, সেখানে সেগুলো উবে যেতো। প্রতিটি মনুষ্যশ্রেণীব প্রাণী, যাদের সংস্পর্শে আমি এবং তিনু এসেছিলাম, পাল্টে যেতো। এমনকি তিনুও পাল্টাতো এবং আমি বিস্ময়-ভাবনা শুরু কবলাম—আমি পাল্টে গেছি কি না, অজ্ঞাতসাবে, অন্য প্রতিটি মানুষের মতন।

"আমি যদি পাল্টাই, তুই আমাকে বলবি, না কি?"

সে বললো, "তুই কোন্ বিষয়ে বলছিস?"

"তুই লক্ষ্য করিস নি? জোসেফ, লওযানলে, নুবি, প্রত্যেকে পাল্টে যাচ্ছে। বাবা, মা পাল্টে গেছে। এমনকি মিঃ আভেলুও পাল্টেছেন।

মিঃ আডেলু ছিলেন আমাদেব সর্বাধিক যাতাযাতকাবী অভ্যাগত। অন্যদের তুলনায় তার মধ্যে লক্ষণীয় কিছু ছিলো না। এতে কবে মিঃ আডেলুর পরিবর্তনটা আবো বেশি খারাপ হযেছিলো। বইবিক্রেতার কাছ থেকেও আমি এব চেযে ভালো কিছু আশা কবি নি।

কিন্তু মাঝে মাঝে উপলক্ষ ভেদে, আমি কাবণটা চিহ্নিত কবেছিলাম। দিপোর জন্য ঐরকম একটা পবিবর্তন ঘটিযেছিলো, প্রকৃতপক্ষে তা শুরু হয়েছিলো তার আগমনেব বহু পূর্বে। ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ান সম্পর্কে লক্ষ্য করার কোনো কিছুই ছিলো না, যে তখন আর যাই হোক ওয়াইল্ড ছিলো না, শুধু শুরু করেছিলো সে ফুলতে। আমি তখন বলতে পাবতাম না যে সে প্রচুর খেতো কি না। কিন্তু এটা স্বাভাবিক মনে হয়েছিলো যে প্রাপ্তবয়স্করা তাদের সুবিধামাফিক যে কোনো দিকে বাড়বে। নিজে আমি আশা কবতাম একদিন বাবার উচ্চতাব দিকে বাড়বো, কিন্তু এ নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো আমার ছিলো না। যেটা মজার ব্যাপার ছিলো সে হচ্ছে ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ান অপেক্ষা আচাবে-অভ্যাসে এসে (Essay)

অনেকখানি বদলে গিয়েছিলেন, ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ান শুধু ফুলছিলো আর ফুলছিলো। তা সত্ত্বেও, সেই পবিবর্তনেব শেষে একটা গর্জনকারী এবং অতি প্রচুব শক্তিধর ভাই এসে হাজিব হয়েছিলো এবং সেটাই কোনোক্রমে তৎপূর্বেকার সবকিছুকে ব্যাখ্যা করেছে। এসেব উদ্বিগ্ন দৃষ্টি চলে গিয়ে দেখা দিয়েছিলো অফুরন্ত হাসি এবং চাপা হাসি। সর্বভাবেই বাড়িটা ঝুলে পড়ছিলো বলে মনে হতো। স্রোতের মতন অভ্যাগতরা আসছিলো এবং গণ্ডগোলপূর্ণ পরিবর্তনেব হাত থেকে রক্ষা পেতে আমি আবো বেশি-বেশি আশ্রয় খুঁজছিলাম জোনাব।

পরিবর্তনগুলো কখনো-কখনো ছিলো পার্থিব, ঘরোয়া চবিত্রের। বৈঠকখানার আসবাবপত্র হঠাৎ ওযাইল্ড ক্রিশ্চিযানকে এল কোনোভাবে পেযে বসতো এবং তখন এগুলো উধাও হযে যেতো, হাজির হতো আবাব অন্যভাবে সাজানো অবস্থায়। মাঝখানের সময়টা পাব হতো ছাবপোকা-শিকাবে, যাবা বৈঠকখানার গদিগুলোতে বাসা বেঁধেছে। গদির খোলেব জোড়গুলো পবীক্ষা কবে দেখা হতো, একটা প্রদীপেব ওপব একটা সূচ গবম কবা হতো এবং তাবপব একটা হিস্‌হিস্ শব্দ, একটা ছারপোকাব প্রাণাবসান। এবপবে ওদেব ডিমগুলো খুঁজতে শিখাটা ওদেব ওপব আল্‌তো বুলিযে যাও, এবং ছোট ছোট পট্‌পট্ আওযাজ শোনো, নিবেশ বিস্ফোবণ—যা শেষ হতো একটি দগ্ধ জাযগায। যখন হাতলওযালা চেযার এবং পানীয় বাখাব টুলগুলো আগেব জায়গায় ফিরে যেতো, একটা পবিবর্তন ঘটে গেছে। কতগুলো কখনোই ফিবে যেতো না, পেছনেব উঠোনেব শেষ দিককার গুদোমঘবে পদাবনতি পেতো, কিংবা যেতো সামনেব ঘরে, অভ্যাগতবা যেখানে প্রথমে বসতো এবং এসেকে খবব দেয়া হতো। এমনকি সেলাই-করা, বাঁধানো এবং চক্‌চকে প্রলেপযুক্ত, পবিবর্তনাতীত ধর্মোপদেশসমূহও পবস্পর স্থান বিনিময কবতো। আমি হয়তো REMEMBER NOW THY CREATOR IN THE DAYS OF THY YOUTH দেখার জন্যে চোখ তুলে তাকাতাম, দেখতে পেতাম EBENEZER : HITHERTO HATH THE LORD HELPED US

যে পেরেকটি থেকে ধর্মোপদেশটি ঝুলনো ছিলো, কখনো-কখনো সামনেব ঘব থেকে সেটিকে এক কি দু'ফুট আগে-পিছে সরিযে দেযা হতো। ফলাফল ছিলো মারাত্মক। এব অর্থ ছিলো বাড়িতে পৌছে যাওযার অনেকক্ষণ আগে থেকে এসের প্রতিবিম্ব আব দেখা যেতো না, প্রাথমিক বিদ্যালযেব দবজা দিয়ে যে চওড়া বাস্তা প্রায সোজা যাজক ভবনেব ফটকে পৌছে যেতো, তাতে তাঁব পা ফেলাব মুহূর্ত থেকে। পথের দুই-তৃতীয়াংশ আগে থেকেই তিনি দৃশ্যমান হতেন, যখন তাকে তুলে নিত HONOUR THY FATHER AND THY MOTHER—এটাই ছিল সকল দুষ্টুমি বন্ধ করার মুহূর্ত। বাড়ির ভেতরে শোয়ার ঘর থেকে আদ্যিকালেব পর্দা ঝাপটিয়ে বেরুনো মাত্র তাঁব প্রতিবিম্বকে তুলে নিত REMEMBER NOW THY CREATOR। খাওয়ার সময়ে খাবার ঘরে যা কিছু অপকীর্তি আমরা করতাম, এই সঙ্গে তাব অবসান হতো। কখনো কখনো আমরা লেখাপড়া করতাম সামনের ঘরে বসে, যেখানে যে বস্তুটিতে থাকতো আমাদের প্রকৃত আগ্রহ, তাকে ডেস্কের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতাম যে মুহূর্তে পেছনের উঠোনে বাগানের পরিচর্যা-শেষে এসে

আবির্ভূত হতেন THE LORD IS MY SHEPHERD-এ, যুৎসইভাবে যা আগলানো ছিলো খাবার ঘরের জানালাব মাত্র বাইবে ঝাপানো জযপাল গাছেব মধ্যে। ফ্রেম-বাঁধানো ধর্মোপদেশগুলো ছিলো প্রাণরক্ষক, এবং আমরা সেগুলোকে গোয়েন্দা-কর্তব্যে পুনর্বহাল করতে কঠোব পরিশ্রম করতাম। ফ্রেমটাকে ঝুঁকিযে দিয়ে, একদিকের রশিকে খাটো করে দিযে কিংবা ঘর-বোলতার বাসা দিয়ে ফ্রেমেব পেছনে বাড়তি ঠেক্‌না বসিয়ে। ধরা পড়লেও শুকনো মাটির টুকরোতে তো কোনো বিস্ময় তৈরি হবে না, কারণ বোল্‌তারা তো সিলিংয়ে বাসা বানাতোই এবং সেখানে সেগুলো থেকেও যেতো, যতোক্ষণ না কেউ তাদেরকে জোবপূর্বক ভেঙে ফেলতো।

ঘুমনোব ব্যবস্থায় পবিবর্তন হতো। শুধু আমার বেলায নয। হঠাৎ ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ানের শোবার ঘব থেকে সকলে বিতাড়িত হতো। বৈঠকখানাটি হতো নতুন শোবাব ঘর, চেযাবগুলো সবিয়ে নেয়া হতো, সেন্টার টেবিলটিকে রাখা হতো এক কোণে। মাদুব বিছানো হতো, আর যাবা যেভাবে ব্যবহার করবে, তাদেব জন্যে সেই বিন্যাসে বালিশ। বাতে জল যেতে খেতে ছড়ানো-ছিটানো শবীবগুলোর মধ্য দিয়ে এসে-কে পথ খুঁজে নিতে হতো। ওটা ছিলো এক সুখকর পরিবর্তন। বৈঠকখানায় জাযগা ছিলো অনেক বেশি এবং তখন আর কেউ ঘুম ভেঙে দেখতো না, নাক তার চাপা-কালো চোখ কড়াইশুটির একটা বস্তায়।

কখনো কখনো পরিবর্তন আসতো প্রতিবেদন থেকে। আড়িপাতার চেষ্টা না করেও বাড়িব যেকোনো অংশেব আলাপ-আলোচনা না শুনতে পাওযাটা ছিলো প্রায অসম্ভব। অভ্যাগতবা আসতেন, কথা বলতেন, তর্ক করতেন কিংবা তোষামোদ, এসেব কাছ থেকে কিছু পেতে কিংবা তাকে কিছু দিতে চাইতেন, সাধাবণত এসে, কিন্তু মাঝে মধ্যে ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ানের বেলায় এসব হতো। কেউ কেউ ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাবা হেডমাস্টারেব চৌহদ্দিতে একবার আসতো এবং চিবতরে উধাও হয়ে যেতো। তবে তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতো হেডমাস্টারের বাড়ির চার দেযালের মধ্যে আমাদেরকে যা নিরাপদ রাখতো, সেই নির্ভরতার গতি, অভ্যস্ত অঙ্গভঙ্গি, সঙ্কেত এবং বিশ্বাসের একটা অংশকে। প্রথমে অনুভব-অযোগ্য, পবে আমরা দেখতাম আমাদেব কাবো ওপব থেকে মনোযোগ তুলে নেয়া হয়েছে কিংবা তা তখন তাদের ওপর পরখ করা হচ্ছে। একটা নতুন ভাষা শিখতে হচ্ছে, মানুষ এবং বস্তুতে একটা নতুন বাস্তব সম্পর্ক। দু'একবাব আমার মনে হয়েছে গোটা সংসারটি একটি সফবেব জন্যে প্রস্তুত হবে-হবে করছে, আকে থেকে তা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। তথাপি কেউ আমাকে বলতে পারে নি—কোথায়, কিভাবে কিংবা কেন, এবং আমরা কখনোই উঠে যাই নি।

তথাপি, এমনকি পরিবর্তনও প্রায়ই এলোমেলো কাজ করতো। ফোলাসাদের জন্মের আগে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করতাম যে, পরিবর্তন ছিল এমন কিছু—বাড়ির একজন কি দু'জন তাতে আক্রান্ত হতেন, তারপর সেবে উঠতেন জ্বরের মতন। ফোলাসাদেটা ছিলো স্থায়ী। সে এসেছিলো দিপোর পরে, দিপোর তুলনায় অন্যরকম সে ছিলো একটি শান্ত শিশু। এবং তারপর, ভোর থেকে রাত অবধি সে কাঁদলো, তার খাটে ওলটপালট করলো এবং

গোটা বাড়িকে জাগিয়ে রাখলো। খাবার সে দুমপাল্ট ফিরিয়ে দিল না, কিন্তু খেলো খুব কষ্টে। তার সে চেষ্টাকে আমবা দেখলাম তার চোখে, মাত্র দশ মাস বয়সী চোখ। খাটের বেলিং গলিয়ে আমরা যখন তাব হাত ধরতে চাইতাম, বাড়িয়ে-দেয়া আঙুলকে সে সর্বশক্তিতে আঁকড়ে ধরতো, ধরে থাকতো। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিতো, তার চোখ পাল্টে যেতো, যখন ব্যথা সে চোখকে ধুইয়ে দিয়ে যেতো, আবাব সে কান্না জুড়ে দিতো।

আমাদের মা-বাবা এসের শোবার ঘবে ঘন্টাব পর ঘন্টা কাটাতেন, তাঁরা কথা বলছেন আমবা শুনতে পেতাম, কিন্তু কোনো কথাই বুঝতাম না। তাবা খুব নিচু স্বরে কথা বলতেন। পরিচাবিকাকে ডেকে পাঠানো হলো, জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তাব কণ্ঠ ছিল যথেষ্ট পবিষ্কাব, যা-ই জিজ্ঞাসা কবা হলো, সে অস্বীকার করলো। সে ছিল তখন প্রচণ্ড, ঈশ্বরকে সাক্ষী মানলো। বাববার বলতে লাগলো— 'কিছুই ঘটে নি, কিছুই ঘটে নি, স্যাব।' শোবাব ঘর থেকে বেবিযে এলো সে, তাব মুখ স্থির-স্থাপিত, মিথ্যে সন্দেহ কিংবা অভিযোগে রুষ্ট।

ফোলাসাদকে হাসপাতালে নিযে যাওযা হলো। সে গেল ভোরে এবং সেই শেষ বিকেলেব আগে ফিবলো না। তাব দেহখানি বগল থেকে পাছা পর্যন্ত প্লাস্টাবে মোড়ানো। ওয়াইন্ড ক্রিশ্চিযান তাকে কোলে নিযেছিলো, পিঠে নয, বাহু-আশ্রয়ে—একটি শাল দিযে জড়িয়ে।

তখনও সে ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছিলো। কিন্তু অনেক রাত সে শুধুই জেগে শুয়েছিলো। আমি মাদুব থেকে উঠে পড়তাম, খাটেব পাশে হাঁটু গেড়ে বসতাম এবং তাব চোখেব নীবব সাযবে তাকিযে থাকতাম। সে আমাকে সাড়া দিচ্ছে বলে মনে হতো না। দিনেব পর দিন ফোলাসাদে চিত হযে শুযে বইলো, খাওযানোর জন্য তাকে বাইবে আনা হতো, কাপড় পাল্টে দেযা হতো। তাবপব ফেব শুইযে দেয়া হতো তার খাটে কিংবা বেশি বেশি করে তাব মা'ব বিছানায, দু'দিকেই বালিশে ঠেসান দিযে। সে কিন্তু এতোই স্থির যে, বালিশগুলোকে মনে হতো অতিবিক্ত। ফোলাসাদে কেবল স্থির শুযে থাকতো এবং সিলিংযেব দিকে তাকাতো।

একদিন আমি পরিচারিকাকে একা-একা বসে কাঁদতে দেখতে পেলাম। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছি, সে বেশি বেশি একা থাকতো। অন্যরা তার সঙ্গে কথা বলতো না। তার পাশে এক থালা খাবার বাখা, সে ছোঁয় নি। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে তীব্রতর কান্নায় ভেঙে পড়ে সে আমাকে ভয পাইযে দিল, যার ফলে সে যে ফোঁপানো কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু বলছে, সেটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে গেল।

"আমি কিরা কেটে বলছি ওকে আমি ফেলে দিই নি। ঈশ্বরের নামে দিব্যি, কখনোও আমি ওকে ফেলে দিই নি। আমি ওর দেখাশোনা করেছি। আমার হাত থেকে কখনোই ও পড়ে যায় নি, দিব্যি।"

পেছন-উঠোনের উপরভাগে ভাড়ার ঘরে যাওয়ার সিঁড়িতে সে বসেছিলো, মা'র শোবাব ঘরের একটি জানালা থেকে জায়গাটা চোখে পড়ে। সেই জানালাটা তখন খোলা হচ্ছে শুনতে পেলাম। তাকাতেই ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ানের মুখ আমার চোখে পড়লো, তার

আগে কিংবা তখন থেকে কখনোই এক সঙ্গে শোক এবং ক্রোধেব এমন ঘনীভবন আর আমি দেখি নি, ক্রন্দনবত পবিচাবিকাব দিকে মা যখন সবাসরি তাকালো। জানালাটা ঝপাং কবে খুলে ফেলা হয়েছে, এ ব্যাপাবে চোবাচুপি কিছু ছিলো না। আমি তখন দেখলাম যে মা নির্ঘাত মেযেটির কথা শুনেছে, তাব ওপর চোখ বেখেছে। যা মাকে ঠিক তখনই তাব মুখোমুখি কবে দিযেছে, এমনকি নীববে, সে হচ্ছে আমাব কণ্ঠস্বব। পবিচাবিকাটি চোখ তুলে তাকালো এবং তাকে দেখলো। তৎক্ষণাৎ তার চোখেব জল শুকিয়ে গেল।

পবে সেদিন সন্ধ্যায পবিচাবিকাকে আবার ডেকে পাঠানো হলো। এবাবেব জেবাতে ঘন্টাব পব ঘন্টা লেগে গেল। জেবা শেষ না হতেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল না হতেই পবিচাবিকাটি চলে গেল, সে এবং তাব পোট্‌লাপুট্‌লি।

চলে গেল এসে এবং ওযাইল্ড ক্রিশ্চিযান এবং ফোলাসাদেও। শেষ পর্যন্ত মেযেটিব কাছ থেকে তাবা যা বেব কবতে পেবেছিলো, তা তাদেবকে সবাসবি ইতা পাদিব ক্যাথলিক হাসপাতালে ফেবত পাঠিযে দিযেছে। তাদের অনুপস্থিতিকালে বাড়িতে এতোটুকু আনন্দ নেই, শুধুই উদ্বেগ। পবিচাবিকাটির চলে যাওযা এবং শিশুটিকে নিযে মা-বাবা দু'জনাবই—বড় কোনো ঘটনা-গতিব জানান দিল, কিন্তু আমবা জানছিলাম না, সেটা কি। জোসেফ প্রকাশ করলো যে, কাজেব মেযেটি সে বাতে তাব জিনিসপত্র গুছিযে নেযাব পরে সে-ই তাকে বাড়ির বাইরে এগিযে দিযেছে, এসে'র নির্দেশ মোতাবেক। শিশুটিকে নিযে ওরা কোথায গিযেছে, জোসেফ সেটা জানতো না। তবে তাবা যে পাঁচিলেব নিচ দিযে পার হযেছে, তাব ওপব দিযে সে তাকিযে দেখেছে এবং দিক্‌নিশানা ধাবণা দিযেছে ইতা পাদিব হাসপাতালে যাওযাব।

যখন তাবা ফিবে এলো, তখনও ফোলাসাদেব চেহাবায কোনো পবিবর্তন নেই, খাটে শুইযে দিলে পব তাব গতিবিধিতেও নেই কোনো পবিবর্তন। এসে স্কুলে থাকাকালেও ওযাইল্ড ক্রিশ্চিযান আবো বেশি বেশি সময তাঁব ঘবে কাটালো। সে শুধু বিছানায় শুযে থাকতো কিংবা হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতো। সে অনেক প্রার্থনা করলো।

এক ভোরবেলা তাব গতিবিধি মনে হলো একটু বেশি উদ্দেশ্যপূর্ণ। আমাদের গির্জা-সংলগ্ন দেয়াল বরাবব রাস্তাব মোড়ে এক ছুতোর মিস্ত্রিব দোকানঘব। সে লোকটিকে আমরা জানতাম শুধু ছুতোব মিস্ত্রি হিসেবে—তো, সে বাড়িতে এলো একটি ছোট্ট চৌকো কাঠেব বাক্স নিযে। আমাব বাবা এটিকে ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিযানের ঘবে নিয়ে গেল।

দবজার ফাঁক দিয়ে তাঁকে বলতে শুনলাম," আমার মনে হয, ছোটরা ওকে প্রথমে দেখুক, নাকি, তুমি কি বলো ?'

সংক্ষেপে অস্পষ্ট কিছু আলোচনা হলো, তাবপব আমাদেবকে ডাকা হলো।

একটি দীর্ঘ সাদা পোশাকে ফোলাসাদেকে শুইযে রাখা হযেছে, তাতে ওর প্লাস্টার ঢেকে গিয়েছিল, পায়ের ওপর দিয়ে তা বিছানো। ওর চোখগুলো বোজা এবং গত কযেক সপ্তাহ যাবৎ যেমন, তেমনি স্থিরও। তিনু ওখানে অসাড়ভাবে দাঁড়িয়ে, আমি তার দিকে তাকালাম। পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ান, মুখে করুণ মিষ্টি হাসি; সে মুখ যা বলছিলো, আমি বুঝতে পারছিলাম না, শুধু যে, কোনো ব্যাপারেই আমাদেব দুঃখ বোধ করার নেই,

কারণ, ফোলাসাদে এখন যন্ত্রণামুক্ত। 'তোমরা দেখছো, ও আর এখন কষ্ট পাচ্ছে না।'

আমি আবাবও তিনুব দিকে তাকালাম। আশা করছিলাম, সে কিছু করবে কিংবা বলবে, বেশির ভাগ আশা—কিছু করবে, যা-ই হোক—সে-ই তো বড়। কিন্তু তিনু দেহটির ওপর চোখ রাখলো, ধীরে ধীরে একবার মা-বাবার দিকে তাকালো, তারপর আবার শুরু করলো আমাদের বোন সম্পর্কে তার বোবা, অসাড় অধ্যয়ন।

হঠাৎ, আমাব মধ্যে সবকিছু ভেঙে পড়লো। কোথেকে আসা একটা শক্তি বিছানায় থুবড়ে ফেললো আমাকে এবং আমি আর্তনাদ কবতে লাগলাম। আমাকে যখন তুলে নেয়া হলো, বাবাব শান্ত-কবা কণ্ঠের বিরুদ্ধে আমি দাপাচ্ছি, অশ্রুময়। হারানোব এমন একটি জাযগায আমাকে চুষে ফেলা হচ্ছিল, যাব কাবণ বা সংজ্ঞা কিন্তু এক ছলনাই থেকে গেল। আমি তখনও কিছু বুঝতে 'পারি নি, এবং এমনকি এই অশ্রুবাশির মধ্য দিযেও দেখতে পাচ্ছিলাম ওযাইল্ড ক্রিশ্চিযানেব বিস্মিত মুখ এবং শুনতে পেলাম তা বলছে, 'কিন্তু সে এর কি বোঝে ? কি বোঝে ?'

ফোলাসাদে বিদায নেযার পব আর কোনো পবিবর্তন নেই, কোনোরকম কোনো পরিবর্তন। প্রতিদিন আমি আশা কবতাম অচিন্ত্যনীয আকৃতির একটা মহাপ্লাবন। কিন্তু কখনোই তা ঘটলো না। বাড়িটা যদি নিজেকে শেকড় ধবে টেনে তুলতো এবং আকাশপানে ভেসে যেতো, আমি কোনো বিস্ময় প্রকাশ করতাম না, কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এই স্বাভাবিকত্বটা ছিলো প্রায-উদ্ধত ধরনেব এবং আমি সন্দেহ করতে শুরু করলাম যে, আমাদের মা-বাবাব মধ্যে কোনো চক্রান্ত হয়েছে এটা নিশ্চিত করতে যে এবারে, পবিবর্তন যখন যুক্তিসঙ্গত, এমনকি প্রয়োজনীয়, তখন এটা ঘটবে না।

যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয, যেন এর কোনোই অর্থ নেই যে, ফোলাসাদে শুধু মরে যায নি, সে তার চলে যাওয়াব জন্য বেছে নিয়েছিলো তার প্রথম জন্মদিনটিকেই।

* * * * *

ইসারা-য আমবাই একটা বাড়ি দখল করে বসতাম। আমরা মানে ওয়াইল্ড ক্রিশ্চিয়ান আর তাব বাচ্চাকাচ্চারা। এসে (বাবা) ঘুমোতেন দাদুর ঘরে। ইসারা-য় পৌছুনোর মুহূর্তটি থেকে এসে আর কার্যত আকে পরিবাবের অংশ থাকতেন না, মিঃ এবং মিসেস শেষ হয়ে যেত এবং তিনি ঢুকে পড়তেন ইসরা-খোলসে, তাঁর জন্ম শহরের দায়দায়িত্বের মধ্যে। অবিবাম আলোচনা-পরামর্শ, শহর-সভা, পারিবারিক বৈঠক, গির্জা পরিষদের অধিবেশন, ওবাগিরি সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার ... শতটা কর্তব্য যা একটা গোটা বছর, কিংবা তার কিছু কম সময়, তাঁব জন্যে অপেক্ষা করছিলো। অনেকটা সময় বাবা কাটাতেন ওডেমোর সঙ্গে, কিন্তু শুধু কর্তব্যই তাঁকে সেখানে ধরে রাখতো না। ওডেমো, এবং আরো দু'একজন, যেমন আমার হবু স্ত্রীর বর আমার ধর্মবাপ, পরিষ্কারই ইসারা-য় এসের আলাপ-আলোচনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে কাটিয়ে তুলতেন। আমি প্রায়ই ভাবতাম, ওডেমোও এসে-র মতন সঙ্গীর জডন্য সমান মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করতেন কি না।

কোনো কড়াকড়ি বন্দোবস্তের ব্যাপার ছিল না, প্রায়ই আমরা একজন কিংবা আরো

বেশি সংখ্যায় দাদুর ঘরে শুয়ে যেতাম, ঘুমিয়ে পড়তাম। বাসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো যেটি, সর্বদাই সেখানে কতগুলো মাদুর থাকতো, আর গোবর-লেপা মেঝেতে ঢালাও জায়গা। ওয়াইলবড ক্রিশ্চিয়ানের দূত-পাঠানো সত্ত্বেও ইসারা-য় রাতগুলোর অর্দ্ধেক আমি কাটাতাম দাদুর ঘরে; এবারেই প্রথম আমি সরাসরি আদেশ পেলাম সেখানে ঘুমনোর। শুতে যাওয়ার সময় সে কী তীব্র কৌতূহল আমার—কিন্তু রাত বেশ গভীর হওয়ার আগে সেই ঘুমই কিন্তু এলো না।

ভোরে-ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখি একটি কেরোসিনেব কুপিবাতি হাতে দাদু আমার ওপর ঝুঁকে। তখনও দিনের আলো ফোটে নি, কিন্তু ঘবের মধ্যে তখনই আরো দুটো মূর্তি। ঘবেব এক কোণে তাদের চেহারা দেখতে পেলাম, একজন পবিষ্কার এক বয়স্ক ব্যক্তি, অন্যজন একটি তরুণ বালক, আমার চেয়ে একটু বেশি লম্বা। সহজ প্রবৃত্তিবশে আমি ঘুরে দেখলাম আশপাশে বাবা বযেছেন কি না, কিন্তু না, তিনি নেই। আমি ধরে নিলাম যে, তিনি ভেতরের ঘরে গভীব ঘুমে।

আমাব মনে তখনও একটা পরিকল্পিত বেড়াতে-যাওযা; তাই প্রশ্ন করলাম, 'আমবা কোথায় যাচ্ছি?'

'তুমি পুরোপুরি জেগে গেছ?'

আমি মাথা নাড়লাম। 'যাও, স্নান কবে এসো। উঠোনে আমি এক বালতি জল রেখেছি।'

সে আজ্ঞা মেনে নিই আমি। মূর্তি দুটোব পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময লক্ষ্য করলাম তাদেব দু'জনার মধ্যিখানে মেঝেতে একটি মাটিব বাসন, এক বোতল পামঅযেল, অধিকাংশ কালো রঙের পাউডারে পূর্ণ অনেকগুলো টিনের কৌটো। চ্যাপ্টা একটি থালায় ছিলো কিছু ধাতব যন্ত্রপাতি এবং একটা খোলকেব-টুকরো-সদৃশ বস্তু। হতবুদ্ধি অবস্থায়ই স্নান কবে নিলাম। ভোবের ঠাণ্ডায় এবং শঙ্কাব এক বোধ থেকে কাঁপতে-কাঁপতে।

ফিবে এসে লক্ষ্য করলাম, চৌকি, চেয়াব সব নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। তালগাছেব খাড়া দণ্ডটি দেয়ালের গা থেকে সবিযে রাখা হযেছে ঘরের প্রায় মধ্যিখানে। একটি নিচু টুল, অর্থাৎ একটি ইপেকু রাখা হযেছে এর সামনে এবং এর ওপর বয়স্ক আগন্তুক নিজের আসন ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলেন। বালকটি তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বোতল, কলসি, ট্রে এবং রকমারি অদ্ভুত যন্ত্রপাতি সব ফের সাজিযে রাখছিলো। তালদণ্ডের চেয়ারটির দিকে দেখিয়ে দাদু আদেশ করলেন, 'এখানে এসে বসো।' আমি মান্য করলাম।

দরজা থেকে সরে এসে তিনি আমার মুখোমুখি হলেন। 'গতকাল যা আলাপ করেছিলাম, তোমার মনে আছে?'

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

'বেশ। এখন খুব মন দিয়ে শোনো। এখন তোমার যা ঘটতে যাচ্ছে, তুমি ব্যথা পাবে, কিন্তু ... আমার দিকে তাকাও!'

অশুভ ট্রে-টি থেকে আমি আমার চোখ কেড়ে সরিয়ে নিলাম এবং তার জ্বলন্ত চোখে তাকালাম। 'হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। যন্ত্রণার উৎস থেকে তোমার মনকে সবসময় সরিয়ে

রাখবে। আর, এই যে বালকটি, সে তোমারই বয়সী। তার সামনে কান্নাকাটি করে তুমি নিজেকে লজ্জা দেবে কি না, সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।' তিনি থামলেন, কিন্তু চোখ দিয়ে আমার মধ্যে ছিদ্র করে চললেন। যেহেতু একটি উত্তর চাচ্ছেন বলে মনে হলো, আমি বললাম,

'না, আমি কাঁদবো না!'

'আমি জানি, তুমি কাঁদবে না। আমি শুধু চেয়েছি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, যদি তুমি ভুলে যাও। অবশ্যই এতে তুমি ব্যথা পাবে, তুমি তো আর কাঠ নও, সুতরাং ব্যথা তুমি পাবেই। কিন্তু তোমার কাঁদলে চলবে না।'

ভয়ে আমি সম্পূর্ণ অসাড় হযে যাই নি, কিন্তু আমাব হৃদ্‌যন্ত্রের ছুটতো তাতে থামে নি। সবচেয়ে খারাপের জন্যই অপেক্ষা কবলাম। কি ঘটতে যাচ্ছে—সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তখনো ছিলো না, শুধু যে, যতোই যন্ত্রণাদাযক হোক, আমাব কাঁদলে চলবে না। আব, তখন একটা ব্যাপার আমাব মনে পড়লো।

'ফোলাসাদে মাবা গেলে আমি কেঁদেছিলাম।'

দাদু তাঁর কাজেব মাঝখানে থেমে গেলেন। আগন্তুকও থামলো, দিশেহাবাব মতন দাদুর দিকে তাকালো। আমি দেখলাম, দাদু হতচকিত, এব অর্থ কি কববেন, বুঝতে পাবছেন না। শেষ পর্যন্ত বললেন,

'ফোলাসাদে? আহ্ হ্যাঁ হুম্।' এবং হাবিযে গেলেন এক একান্ত ভাবাবেশে। 'ঐ শিশুটি ছিলো *আবামি*। আযোকে আমি তখন বলেছিলাম, *আবামি গিদি*। *ঐভাবে চলে যাওযা, তাব জন্মেব দিনটিতেই, হুম্। যাই হোক, সেটা ছিলো ভিন্ন ব্যাপার। মানুষ তার আত্মার সঙ্গে বিবাদ করতে পাবে না। *ইবানুজে, কো মৃ' ওমোদে, কো মৃ আগবা।'***

হুট কবে তিনি আগন্তুকেব দিকে মাথা নাড়লেন। আর অকস্মাৎ আমি আমাব ডান পাযেব গাঁটকে বোধ করলাম একটা পাপের কজায়, গোড়ালি মাটিতে *ঠেসে*–ধরা। সমান দ্রুততায় হাতটি ঘুবে গেল আমাব পাযের বলে, নিচেব দিকে চাপছে এবং মাটিব দিকে গোড়ালির চাপটা ধবে রাখছে। ছোট ছেলেটি কোনো কিছুতে ভেজানো একটি দলা দিযে গোড়ালিটা মুছে নিলো, পরমুহূর্তে বয়স্ক লোকটি আঁকড়ে ধরলো ধাতব বস্তুসমূহের মধ্যকার সর্বাধিক ছুবি সদৃশটি, মাটির বাসনে সেটিকে ডোবালো এবং একটি তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলো আমার পাযেব গোড়ালিব গাঁটে এবং শরীর ধেয়ে উঠে গেল মস্তকে। আমি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলাম। সেই বাম হাতটি আমাব পা–টিকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে সেঁটে বেখেছে। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার শরীরকে মোচড়াতামও। কিন্তু এখন তো দুটো শক্ত হাত, দাদুব, চেয়ারেব হেলানের সঙ্গে আমার কাঁধকে চেপে রেখেছে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে আমি নিচে তাকালাম এবং দেখলাম সেই একই ছুবি বাসনের মধ্যে ঝল্‌সিয়ে ডুবছে এবং বেরিয়ে আসছে, যতোক্ষণ না মাংসের মধ্যকার যন্ত্রণায় আমার মুহূর্তের সংজ্ঞাগুলো হারিয়ে গেল। ছুরির কামড় একে অন্যের মধ্যে হারিয়ে গেল এবং আমি

* অপার্থিব শিশু। নিশ্চিতই অপার্থিব।

* * দুঃখ শিশু, বৃদ্ধ–কাউকেই চেনে না।

মুগ্ধ হযে চেরাগুলোব বৃত্তচাপেব দিকে তাকিযে বইলাম, ঝরা-রক্তের নূপুরেব দিকে, রক্ত ঝবে চলছিলো গাঁটেব চারদিকে। প্রথম তীব্র চীৎকারেব পর থেকে আমার শরীর নৈঃশব্দের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছে। কিন্তু সে মুহূর্তে যে অশ্রু বেরিয়ে এসেছিলো তা অব্যাহত রইলো, আমি দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম এবং বলপূর্বক ফেরত পাঠালাম প্রতিটি শব্দকে। প্রতিটি চেবাব সঙ্গে সঙ্গে আমাব শবীব কুঁচকে গেলে দাদুব আঙ্গুলগুলো আমার কাঁধে কেটে বসলো। আমি আব নিচে তাকাতে পাবছিলাম না। চোখ বুজলাম, দাঁতে দাঁত এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম অগ্নিপবীক্ষা-শেষের। চোখেব জল বইতে লাগলো, অঝোরে।

একটা প্রশান্তিপ্রদ ব্যাণ্ডে গোড়ালিটা মুড়ে দেযা হলো। যখন নিচে তাকালাম, লক্ষ্য করলাম বাসনের মিকশ্চাবে একটা চওড়া পট্টি। এখন ঐ মিকশ্চারে ভেজানো কাপড়েব ফালিটি দিয়েই আমাব গোড়ালির গাঁট বাঁধা হলো। ছেলেটি ছিলো যথেষ্ট ভদ্র। কিন্তু যন্ত্রণা-থামাব বিলাসিতায যখন আমি ডুবলাম, ছুবিটা আমাব অন্য গোড়ালিতে কেটে বসেছে। কিন্তু ধাক্কাটা চলে গেছে এবং সঙ্গে কবে নিযে গেছে ব্যথাব বিস্ময়। গোড়ালিব পব দুটো কব্জিবও জুটলো একই বকম চেবাই। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায কুঁকড়ে গিযেছি। কিন্তু আমাব চোযাল অন্তত ছিলো আলগা। প্রতিটি নড়াচড়া আমি লক্ষ্য করেছি, এবং এমনকি ছুবিচালকেব পরিচ্ছন্ন, লক্ষ্যভেদী দক্ষতার প্রশংসাও কবতে শুরু করেছিলাম।

শেষ হযে গেলে, গোটা ব্যাপাবটায যে এ্যাতো কম সময লেগেছে—তা আমি বিশ্বাসই কবতে চাই নি। বাইবে দোরগোড়ায তখন সূর্য ছাযা ফেলতে শুরু কবেছে। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঘবেব কোণে নিচু স্ববে কথা বলছিলেন, আব দাদু সম্মতিতে ঘাড় নাড়ছিলেন, আব ঘোত্‌ঘোত্‌ করছিলেন। তখন বযস্ক লোকটি ফিবে এলো এবং তার যন্ত্রপাতি গোছাতে লাগলো। ছেলেটি ঘবেব একটু বাইবে বাসন ধুচ্ছিল; আর বয়স্ক ব্যক্তি তার ছুবি পরিষ্কাব করলো, অবশিষ্ট গুঁড়োগুলো ছোট ছোট কলসিতে ভবলো এবং সেগুলোকে রাখলো দবজার কাছে ঝুলনো একটি তলাবিহীন থলেতে। দাদু তাদের বিদায় দিলেন এবং তারপব দরজা বন্ধ কবলেন।

তিনি আমার দিকে এগোলেন, শূন্য টুলটিব ওপব বসলেন এবং বললেন, 'ওলে, তুমি কবেছো বটে—নও জওযান। একজন যথার্থ আকিনেব মতন কবেছো। এখন আমাব কথা শোনো। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, এবং যেই যা বলুক—এ কথাগুলো মনে রাখবে। কেউ যদি বলে... যদি তারা বিপবীত কথা বলে, তাদেরকে বলবে একথা আমি বলেছি... ।'

ধীরে ধীবে, যেন নস্যি নেযাই জগতে সর্বাধিক বিপজ্জনক কাজ—এমনভাবে সময নিযে নিয়ে, একটি ছোট টেবিলেব নিচের তাকেব দিকে তিনি হাত বাড়ালেন, তাঁর নস্যিব কৌটো নিলেন, কৌটো খুললেন, একটুখানি তার বাম হাতে নিলেন, ঢাক্‌নাটা ফের আঁটলেন—নস্যির ছড়িয়ে পড়ে যাওযা রুখতে বাম হাতখানা মুঠো করে রাখতে সযত্ন, তাকের মধ্যে নস্যিব কৌটো ফিরিয়ে রাখলেন, তারপর হাতের তালু থেকে এক টিপ নিয়ে দুই নাসারন্ধ্রেই সমান নস্যি পুরে দিলেন। কোনো কাবণে, সম্ভবত যে অপ্রস্তুত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি মাত্র অতিক্রম করেছি, সেজন্য আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় ছিল ব্যথায় অনুরণিত

এবং দাদুব চলাফেবার ক্ষীণতম টুকরোও একটা নিজস্ব জীবন পেয়ে যাচ্ছিলো, যে কারণে আমার মনে হচ্ছিলো তাকে আমি প্রথম দেখছি।

আমাব শ্রবণেন্দ্রিয ও পেযে গিযেছিলো এক এলোমেলো সুর। দাদু হাঁচতেই আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিযে উঠলাম এবং তিনি কথা বলাকালীনও আমার মাথার মধ্যে ঐ শব্দেব প্রতিধ্বনি ঘটে চললো।

'তোমাকে কেউ খাদ্য দিলে, সেটা নিও। খেও। ভয় পেও না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাব হৃদয বলবে, খাও। আব যদি তোমার মনে সংশয় শুরু হয, এক মুহূর্তের জন্যেও তাহলে সেটা খেও না এবং ঐ বাড়িতে আব কখনো যেও না। আমি এইমাত্র যা বলেছি, তুমি বুঝতে পাবছো ?

আমি বোবার মতন শুধু মাথা নাড়তে পাবলাম।

'আমি বলেছি, কেউ তোমাকে খাবাব কিংবা পানীয দিযেছে, যদি তোমার মনে দ্বিধা না দেখা দেয, তাহলে এগিযে যাবে, খেযে নেবে। আমি একথা বলছি। কিন্তু যদি এক মুহূর্তেব জন্যেও দ্বিধা দেখা দেয, সেখান থেকে চলে এসো এবং আর কখনও সেখানে যেও না। দ্বিতীযত, কোনো যুদ্ধ থেকেই পেছন ফিবে এসো না। আমি জানি নে, আগামী বছর কিংবা তাব পবেব বছব, কোথায তুমি যাচ্ছো। আমি যতোটুকু জানি, ঐ স্কুলে যাওয়াব আগে ওবা আব তোমাকে এখানে নাও ফিবতে দিতে পাবে, কিন্তু তাতে কিচ্ছু যায-আসে না। যেখানেই থাকো, কোনো যুদ্ধ থেকে পেছন ফিরে এসো না। তোমাব প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো তোমার চেযে বড় হবে, প্রথমবাব সে তোমাকে পবাস্ত করবে। ফেব তার সামনে যাও, তাকে মোকাবেলা কবো। আবাবও হযতো সে তোমাকে পবাস্ত কববে। তৃতীয়বার, আমি নিশ্চযতা দিচ্ছি, হয তুমি তাকে পবাস্ত করবে, কিংবা সে পালিযে যাবে। আমি তোমাকে যা বলছি, মন দিযে শুনছো তো?'

'হ্যাঁ, দাদু।'

'প্রথমবাব, দ্বিতীযবাব সে তোমাকে পরাস্ত কবলে কিচ্ছু ঘাবড়াবে না। ফিবে যেতে থাকো। শেষে তুমি তাকে অপদস্ত করবে— হয় তাকে আচ্ছাসে পরাস্ত করবে, নচেৎ সে পালিযে যাবে?'

দাদু উঠলেন। 'আমি তোমাব মা-বাবা এবং অন্য শিশুদেরকে সাগামু পাঠিয়ে দিযেছি। এতোক্ষণে তাদেব চলে যাওযা উচিত, ওখানে অনেক লোক, যাদেব সাথে এদেব দেখা হয নি। সুতবাং এখন এখানে শুধু আমরাই।'

আমি ঘবটার দিকে ঘুবলাম। 'আমি ভেবেছিলাম বাবা ওখানটাতে।'

তিনি মুচ্‌কি হাসলেন এবং মাথা নাড়লেন। 'উঁহু, না-না, এটা শুধু তোমার আমার দু'জনাব মধ্যকাব ব্যাপাব। আমি এখন একটা সভায় যাবো। কেউ একজন তোমাকে তোমাব ভোরেব খাবার এনে দেবে। অন্য আর কিছু খেও না। আজ এবং আগামীকাল আমি যা পাঠাই, তার বাইরে কিছু খেও না। বুঝেছো?'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে, বুঝেছি। আমি শুষ্ক বোধ করছিলাম, আমার মাথা ঘুবছিলো, আর আমার কব্জি এবং গোড়ালি দপদপ করছিলো। আমার হাতের সঙ্গে অদ্ভুত

এক দূরত্ব, যেন তারা আর আমার নয়।

তারপর শুনলাম আমি জিজ্ঞাসা করছি, 'বাবার গোড়ালিও কি কাটা হয়েছিলো? অর্থাৎ, তিনি যখন আমার মতন ছিলেন।'

দাদু চোখ ছাদের বরগায় তুললেন। 'তারা এটা বলেছিলো, আয়োঁ আমাকে সতর্ক করেছিলো, এনিযোলাও। যখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমাকে আমার কাছে রেখে যেতে, তারা শাসিয়েছিলো। সাবধান। সে কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করে শেষ করবে।'

তিনি তার ঘরে গেলেন। কাপড় পাল্টাতে-পাল্টাতে তিনি যে আপন মনে মুখ টিপে হাসছিলেন তা আমি তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম, সরু, দীর্ঘ মজার এক শব্দ করে চলছিলেন, যার শেষে-শেষে যত্নে নিয়ন্ত্রিত এক চিক্কন স্বর। দীর্ঘক্ষণ আমি ঠায় বসে রইলাম স্থির, ভাবার চেষ্টা করছিলাম—আমার গোড়ালি দুটো আমার ভার সইবে তো, নাকি আমি পা তোলার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে ধসে যাবে। যেন আমার জিজ্ঞাসাটা নিজেই ঘরের মধ্যে দাদুর কাছে পৌঁছে গেছে। কারণ তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ঠ ঝঙ্কারে বাজলো :

'তোমার পায়ের বাইরের কিনারায় হাঁটার চেষ্টা করো, তারপর ভেতরের দিকে। যদি কোনোটাতেই কাজ না হয়, তাহলে সচরাচর যেমন হাঁটো, সেভাবে হাঁটার চেষ্টা করে দেখো, দু'পায়ের ওপর সমানভাবে, শুধু একটু বেশি আলতোভাবে। তাতেই সাধারণত সবচেয়ে ভালো কাজ হয়।'

আর তারপর, যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি হাসছি দেখতে পেলাম, কারণ, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে দাদু আশা করেন নি যে আমি বুঝবো।

অনুবাদ : কাজল বন্দ্যোপাধ্যায

গিকুইউ সমাজ □ জোমো কেনিয়াট্টা

('ফেসিং মাউন্ট কেনিয়া' বই থেকে)

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গিকুইউ সমাজ বিধৃত, তাদের অভাবে সংহতি নষ্ট হতে বাধ্য। প্রতিটি গিকুইউর ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার এই তিনটি আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমটি হল পরিবাব (মৃবাবি বা নিযোম্বা), যার মধ্যে অন্তর্গত রক্ত সম্পর্কে অন্বিত সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ একটি পুরুষ, তার স্ত্রী বা স্ত্রীরা, এবং তার পুত্রকন্যা এবং পৌত্রপৌত্রী ও প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী। দ্বিতীয়টি হল গোত্র (মোহেরেগা), অর্থাৎ কয়েকটি পবিবারের সমষ্টি, যারা একই মোহেরেগা নামের অধিকারী এবং সুদূর অতীতে একটি পরিবার থেকে তাদের সকলের উদ্ভব হয়েছিল বলে বিশ্বাস করে। বলাবাহুল্য, বহু বিবাহপ্রথা চালু থাকার দরুন পরিবারের সদস্যসংখ্যা বিপুল হতে পারে, এক এক প্রজন্মে এক মৃবারিতে একশ' বা ততোধিক সদস্য থাকতে পারে। কয়েক প্রজন্ম মিললে, তা হাজার খানেক হতে পারে, এবং সে অবস্থায় বাবা, মা, বোন, ভাই, খুড়ো, খুড়ি, দাদু, ঠাকুমা ইত্যাদি সম্পর্ক ধরে একত্রে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সে অবস্থায় মৃবারি ছাপিয়ে মোহেরেগা-পরিচয় বড় হয়ে দাঁড়ায়। দূর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও মোহেরেগা-বন্ধন অনুযায়ী পরস্পরের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভাব বজায় থাকে। এই মনোভাব থেকেই বিবাহ বা বয়ঃপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান উপলক্ষে মোহেরেগার প্রতিনিধিরা সাধাবণত একত্র হয়। এইসব অনুষ্ঠানে সাধারণ প্রতিনিধিরা তাদের স্ব-স্ব মৃবারি থেকে একজন করে যুবক সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আসে। সেখানে বিভিন্ন মৃবারি যুবক সদস্যরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে মোহেরেগা-বোধকে দৃঢ়তর করে। এতে করে তারা বয়স্ক হলে তাদের মধ্যে মোহেরেগার মঙ্গল-সাধনা বিষয়ক দায়িত্ববোধ জন্মে।

তৃতীয়টি হল গিকুইউ সমাজে প্রচলিত বয়সভিত্তিক রুকা সংস্থা। এখানে সব মৃবারি বা মোহেরেগা থেকেই সমান বয়সের সদস্যরা একত্র হয়, ফলে গোটা গিকুইউ সমাজের সংহতিবোধ দৃঢ়তর হয়। প্রায় প্রতিবছরই এক বয়সের কিছু ছেলের শিশ্নবর্মচ্ছেদ ও মেয়েদের অনুরূপ অনুষ্ঠানের পর তারা বয়সভিত্তিক রুকার সদস্য গণ্য হয়, তা সে তারা যে পরিবার, গোত্র বা অঞ্চল থেকেই আসুক। এতে সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে একটি দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ বা ভগিনীসংহতি গড়ে ওঠে। ফলে, প্রতি প্রজন্মেই এই বয়সভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে নামান্তরে যে সংহতি গড়ে ওঠে, তা-ই গিকুইউদের

রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখে।

সমাজে স্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গিকুইউদের প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতগুলো নিয়ম পালন অবশ্যকর্তব্য। এই ব্যবহারবিধিকে বলা হয় 'মেটুগো ইয়া ন্‌গানিউতি'। তবে অবশ্য, সমাজ পিতৃ-অনুসারী না মাতৃ-অনুসারী, সমাজে শ্রম ও দায়িত্বের ব্যাপারে নরনারীর মধ্যে বন্টনপ্রথার ওপর সে-বিধি বেশকিছুটা নির্ভর করে।

গিকুইউ সমাজ পিতৃ-অনুসারী। পরিবারের কর্তা হলেন পিতা, তাকে বলা হয় 'বাবা' (আমাব বা আমাদের বাবা), ইথে (ওর বাবা), থোগুও (তোমার বাবা)। বাড়ির সর্বোচ্চ শাসক হলেন পিতা। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মালিক, বা বলা যেতে পাবে পরিবাবেব সকল সম্মতির তিনি অছি। পরিবাবের সকল সদস্যের তাকে শ্রদ্ধা ও মান্য করা কর্তব্য। সমাজে তার স্থান নির্ভর করে তার নিজের পরিবারের প্রকৃতির ওপর এবং নিজগৃহের ওপর তার নিয়ন্ত্রণের সার্থকতার ওপর, তা থেকেই পাওয়া যায় গোটা সমাজ পরিচালনায় তার দক্ষতার পরিমাপ।

সন্তানদের পিতার সঙ্গে শান্ত ও নম্রভাবে কথা বলাই প্রথা, এবং একমাত্র স্বভাব শোধ্‌রানোর উদ্দেশ্যে কড়া কথা বলা ছাড়া, অন্য ব্যাপারে সেই নম্রতার পরিবর্তে পিতারও নম্র আচরণ বিধেয়।

মাতা সম্বোধিত হন মাইতো (আমার মা বা আমাদের মা), নিইয়া (তার বা তাদের মা) বা নিইওকোয়া (তোর বা তোদের মা) বলে। 'মাতৃ' সম্বোধন গিকুইউ সমাজে প্রতিটি নারীর পক্ষে বিশেষ সম্মানসূচক। মাতৃত্বে উপনীত হলে সমাজে প্রতিটি নারী শুধু তার নিজের সন্তানই নয়, সকলের কাছে সম্মানের পাত্রী পরিগণিত হন। তাঁরও সম্মানরক্ষার্থে অতিথিবৎসল হওয়া এবং আপদেবিপদে প্রতিবেশীর সহায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সতীনদের মধ্যে সম্পর্ক স্বামীকে সহ-অধিকারের ভিত্তিতে সর্বরকমের সহযোগিতা বা অংশীদারিত্ব। সে সম্পর্কের সঙ্গে প্রতিটি স্ত্রীর নিজস্ব কুটির ও শস্যভাগেব মালিকানার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা পরস্পরকে 'মোইরু ওয়াকোয়া' (অংশীদার বা সপত্নী) বলে সম্বোধন করে। জাগতিক দিক থেকে তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রধানা পত্নীর অন্যদের ওপর কোনো কর্তৃত্বাধিকার নেই। তিনি শুধু তার বয়সোচিত আচরণের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তার প্রধান কর্তব্য বা দায়িত্ব হল পরিবারের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরিচালনা। সংসারের কাজের ভার সকলেরই সমান।

ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যকর্তন ব্যাপারে সহযোগিতা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে স্বামী এবং স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ওপর।

দেবরদের নামকরণ করা হয় সৌহার্দ্যের চিহ্নস্বরূপ। সেই নামকরণ উপলক্ষে উপহার দিতে হয়। দেবরও বৌদিদের নামকরণ করে এবং উপহার দেয়। শ্যালিকাকে 'মারামু' সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ 'আইনত-ভগিনী'। স্ত্রীর অন্য আত্মীয়রা সকলেই 'আথোনি আকোয়া' বা আইনত-আত্মীয়।

স্ত্রীরা শ্বশুর-শাশুড়িকে 'বাবা' বা 'মা'-ই বলে। তারা পরিবর্তে তাদেরকে ''অমুকের মেয়ে' বলে সম্বোধন করেন। এতে তাদের প্রতি স্নেহ এবং তাদের মা-বাবার প্রতি সম্মান

প্রকাশ পায়।

পুত্রসন্তানবিহীন অবস্থায় পিতার মৃত্যু হলে সেখানেই তার পরিবারেব ইতি। গিকুইউ সমাজ এটাকে দারুণ ভয় করে, এবং এটা বহুবিবাহপ্রথার একটি কারণ বলা যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বংশকে ভবিষ্যতের পথে চালন গিকুইউ-বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা, নির্বংশ হওয়া অর্থ পিতৃপুরুষদের আত্মার পৃথিবীতে বেড়াতে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া, কারণ, সেখানে তাদের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম ত কেউ থাকবে না।

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

লাল লঙ্কার চেয়েও ঝাল

(একটি টিভ্ আত্মজীবনী থেকে)

অনেক বছর আগে, যখন আমি আমার বাবা সাইয়ের সান্নিধ্যে বাস করতাম, আমার দলের সকলে বলত আমি ট্‌সাভ, কিন্তু তা সত্য ছিল না। আমার ট্‌সাভ-খ্যাতি এভাবে ছড়িয়েছিল। আমি যখন শিশু, মা তখন আমাকে ছেড়ে চলে যান, তাই আমার জীবন খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার বাবা আমাকে খুব যত্ন করতেন, আর যে-কোনো উপায়ে আমার জন্য খাবার ব্যবস্থা করতেন। এ জন্য তিনি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী, তুরান-কন্যা এলের খেতে ফসলের আকোম্বো-পুজো করতেন। আকোম্বোটা ছিল খেতে, একটা শিয়া গাছের গোড়ায়, চারপাশে পোঁতা ছিল ইয়ানদেমের বেড়া। এই পুজোর দিন এলে, বাবা আমায় মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে দিতেন, আলো ফোটার আগেই একটা মোরগ ধরে সেটা দিতেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিলেকানের হাতে, আমার হাতে থাকত এক কালাবাশ জল, আর নিজে নিতেন আগুনটা। তারপর আমরা যেতাম খেতে। বাবা আকোম্বোপুজো সারলে, আমরা মোরগটা কেটে খেতাম, তারপর ভোরেই গ্রামে ফিরে আসতাম। এই দেখে লোকে বলত, "হিলেকান আর আকিগার ভীষণ ট্‌সাভ। এ তল্লাটে ওদের কোনো জুড়ি নেই। ওরা ওদের বাবার সঙ্গে নরমাংস খায়।" কিন্তু আমি নিজে তো জানতাম, ব্যাপারটা তা নয়। বাবা শুধুই আমার জন্য খাবার যোগাড় করার সুযোগ খুঁজছিলেন। তাও, যখন টের পেলাম যে লোকে ব্যাপারটার এই অর্থ করছে, তাদের মনে হচ্ছে এসব মৃবাট্‌সাভের কাণ্ড, আমি আর তাদের ভুল শোধরানোর কোনও চেষ্টা করলাম না, বরং এই খ্যাতি ভাঙিয়ে যা যা সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, সেগুলো নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে লোকে আমায় আরও ভয় পায় বা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আর একটা ঘটনা ছিল। ইবির জন হোল্‌ট কোম্পানির এক বাবু আমার বাবাকে একটা লোহার বাক্স দিয়েছিল। এটা খুবই মূল্যবান বস্তু ছিল; কারণ, সে যুগে টিভ্‌দেশে এরকম বাক্স ছিল দুর্লভ। তার চাবি থাকত হিলেকানের কাছে—সে ছাড়া আর কেউ এ বাক্স খুলতো না, হাতও দিত না। সেই সময় বাবার প্রধান স্ত্রীদের মধ্যে একজনের মেয়ে বুরিয়াকে বিবাহিত অবস্থায় বাড়িতে আনা হয়েছিল। বিবাহ-অনুষ্ঠানের নাচ হচ্ছিল। আমি আডামুর মেয়ের ঘরে গেলাম; কারণ, কনেকেও সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লোহার বাক্সটা ঐখানেই থাকত। খাটের ওপর অন্য অনেক বাক্সের মধ্যে লোহার বাক্সটাও রাখা ছিলো।

খেলার ছলে আমি বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, খেলতে-খেলতে লক্ষ্য করলাম, যে লোহার পাত থেকে তালাটা ঝোলে, সেটা ওপর দিকে ওঠানো, তাই বুঝতে পারলাম যে বাক্সটা খোলা। আমি বাইরে গিয়ে বাবাকে বললাম যে হিলেকান বাক্সটা খুলে আবার বন্ধ করতে ভুলে গেছে। বাবা জানতে চাইলেন এ ব্যাপারটা আমি কী করে বুঝলাম। আমি বললাম যে লোহার পাতটা ওপরে ওঠানো ছিল, সেটা দেখেই আমি বুঝেছি। তিনি তখন হিলেকানকে ডেকে জেরা করলেন। হিলেকান উত্তরে বলল যে সে বাক্সটা বেশ এঁটেই বন্ধ করে তালা লাগিয়েছিল। আর আমি নাকি ট্সাভের শক্তি দিয়ে বাক্সটা খুলে ফেলেছি।

এই শুনে বাবা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর কোমরের বন্ধনি খুলে আমায় মারতে আরম্ভ করলেন। যে-ই তাঁকে থামাতে আসে, তাকেই তিনি বলেন, "না না, বাধা দিও না। আকিগার ট্সাভ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই দেখ, ও ট্সাভ দিয়ে আমার লোহার বাক্সটা খুলেছে, ভেতরের ইম্বোরিভুঙ্গুটা দেখবে বলে।"

একথা যে-ই শোনে, সে-ই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলে, "ওকে মারাই উচিত। যদি এইটুকু ছেলের মধ্যে এতখানি ট্সাভ থাকে, তাহলে বড় হয়ে ও কী না করবে?"

সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়া পর্যন্ত বাবা মারতে থাকলেন। শেষে আমি ওঁর হাত থেকে নিজেকে কোনরকমে ছাড়িয়ে নিলাম, আর পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু তিনি আমায় এতই ভালবাসতেন যে খুঁজতে বেরোলেন, আর যখন আড্জাণ্ডের মেয়ের ঘরে আমায় খুঁজে পেলেন, তখন আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

পরদিন সকাল নাগাদ কথাটা পাঁচ-কান হয়ে গেল। সকলে আমার ট্সাভের কথা আলোচনা করতে আরম্ভ করেছে, আর গল্পটাতে নিজেদের মত করে মালমশলা মিশিয়ে বলছে। কেউ বলল, গতকাল আমি বাক্সটা খুলে মাথা থেকে কাঁধ অবধি তাতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, আর আমার দেহ থেকে নাকি ঘাম ঝরছিলো। অন্য কেউ বলল, আমি নাকি ইম্বোরিভুঙ্গুটা খুঁজে পেতে বের করে সেটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, এমন সময় হিলেকান আমায় দেখে ফেলে সাইকে নালিশ করে—সাই এসে আমায় হাতেনাতে ধরে ফেলে বেদম পেটায়। লোকে বলাবলি করতে লাগল, "এই ধরনের ট্সাভ থাকলে তো আকিগা বড় হলে হিলেকানকেও ছাড়িয়ে যাবে।" আমি যখন বুঝতে পারলাম সে ট্সাভের জোরেই আমার ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে, পরিতুষ্টির সঙ্গে মৃবাট্সাভ সম্পর্কে ঝুড়িঝুড়ি মনগড়া কথা বলতে লাগলাম। কেউ কিন্তু আমার বিরোধিতা করল না—সকলের ধারণা, আমার ট্সাভ এত শক্তিশালী যে মৃবাট্সাভ সংক্রান্ত আমার যেকোনো মন্তব্যই বিশ্বাসযোগ্য। এই না শুনে আমি আরও উল্লসিত হয়ে ট্সাভশক্তিকে আমার ধ্যানজ্ঞান করে ফেললাম—এতটাই যে লোকে আমায় দেখতে আসত, আশ্চর্য হোত। তখন কিন্তু আমি খুবই ছোট।

আমায় যে লোকে ট্সাভ বলত, তার আরও একটা কারণ ছিল। সেই ছোটবেলায় আমি সবসময়েই বাবাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতাম। দিনে বা রাতে কখনও তাঁর কাছ-ছাড়া হতাম না। শুধু যখন তিনি অন্য কোথাও সফরে যেতেন, তখনই আমরা দূরে থাকতাম। তাই, সবসময় তাঁর কাছে থাকার দরুণ, আমি অনেক কিছু শুনে বা জেনে ফেলেছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি, দলের প্রধান। তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল, আর তিনি

তাদের কারো ঘরে যখন রাত কাটাতেন, আমিও তখন সেখানেই থাকতাম। আর রাতে বাইরে যাবার দরকার হলে নির্ভয়ে চলে যেতাম—অন্য বাচ্চাদের মত আমি অন্ধকারকে ভয় করতাম না, এটা অবশ্য বাধ্য হয়েই করতে হোত—যদি ঘর নোংরা করি বা ভিজিয়ে ফেলি, তাহলে যে স্ত্রীর ঘরে বাবা তখন আছেন, সে তো পরদিন বাবাকেই হেনস্তা করবে, আর রান্না হলে আমায় খেতে দেবে না।

একদিন রাতে আমি অভ্যেসমত বাইরে গেছি, দেখি দুটো কালো শুয়োরছানা দৌড়ে পালিয়ে গেল, দু'জন দুদিকে। আমাদের গ্রামে দু'জন মাত্র শুয়োর পোষে—আমার পিসি আকুরে, আর বাবার এক স্ত্রী গাটা। আর যেহেতু তাদের শুয়োরগুলো কিছু দিন আগেই প্রসব করেছে, আমি বুঝলাম যে এই ছানাগুলো তাদেরই।

বাড়ির ভেতর যখন ফিরে গেলাম, বাবা তখনও জেগেছিলেন, তাই আমি ঘটনাটা তাঁকে বললাম—"আমি এক্ষুণি বাইরে দুটো কালো শুয়োরছানা দেখলাম। কে জানে কাদের শুয়োরছানা ওভাবে ছাড়া আছে, যাতে হায়েনা টেনে নিয়ে যেতে পারে।" বাবা আমায় শুধোলেন, দুটোই কি কালো ছিল, নাকি একটা কালো একটা সাদা, আর উত্তরে আমি বললাম যে অন্ধকারে তো দুটোকেই কালো মনে হলো। পরদিন সকালে তিনি হিলেকানকে কথাটা বললেন। হিলেকান আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করল, রাতে বেরিয়ে আমি কি দেখেছি, আর আমি উত্তর দিলাম যে দুটো শুয়োরছানা দেখেছি। চটে গিয়ে হিলেকান আমায় সাবধান করল, আমি যেন মিথ্যে কথা না বলে, ঠিকঠাক যা দেখেছি তা ওকে বলে দিই, তা না হলে ও আমায় পেটাবে। আমি তাও বুঝতে পারলাম না, ও ঠিক কী শুনতে চাইছে। তাই ও যখন আবার প্রশ্ন করল, আমি ঐ একই উত্তর দিলাম। ও তৎক্ষণাৎ একটা লাঠি তুলে নিয়ে আমায় মারতে লাগল। আমি তো ধাঁধায় পড়ে গেলাম, কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না—তখনই হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হোল—আমি তো সত্যিই বলেছি, কিন্তু হিলেকান খুশি হয় নি। এবার মিথ্যে বলে দেখি, ও বিশ্বাস করে কি না। এবার আমি গল্পটা এমন করে ঘুরিয়ে বললাম, যাতে মনে হয় এটা মৃবাট্‌সাভের কীর্তি :

"তোমায় তাহলে আসল কথাটা বলছি। কাল রাতে আমি যা দেখেছি তা হোল মৃবাট্‌সাভের প্যাঁচা। দু'খানা প্যাঁচা ছিল, গায়ে গাঢ় নীল কাপড় জড়ানো। যখন আমি বেরোলাম, তারা ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে ছুটে পালালো।"

হিলেকান বলল, "যাক, এতক্ষণে তুমি সত্যি কথাটা বলেছ।" এই গল্প চাউর হতে আমার ট্‌সাভ্‌খ্যাতি দ্বিগুণ হয়ে গেল। লোকে বলতে লাগল, "কাল রাতে সাইয়ের গ্রামে মৃবাট্‌সাভ হানা দিয়েছিল—আকিগা বেরিয়ে এসে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।"

অনেকদিন এটাই চর্চার প্রধান বিষয় ছিল। কোহো, আমার বাবার আত্মীয়, আমার নাম রাখলো ঈপেঙ্কে। এটা মৃবাট্‌সাভ সম্বন্ধিত নাম, যার মানে সেই লঙ্কা যা অন্য সব লঙ্কার থেকে আলাদা। অর্থাৎ, মৃবাট্‌সাভের তেজ লাল লঙ্কার মত; কিন্তু আমি আরও ঝাঁজালো আরও তেজী, কারণ, আমি তাদের তাড়াতে পেরেছিলাম। আমার বাড়ির লোকেরা এখনও এই নামটা মনে রেখেছে। যদিও আমার আর এই ডাকে সাড়া দিতে ভাল লাগে না।

অনুবাদ : ঈপ্সিতা চন্দ

ফটোগ্রাফার □ বেন ওক্‌রি

সেদিন বিকেলে কম্পাউণ্ড বেশ চুপচাপ ছিলো। সবকিছুর ওপর সূর্যের আলো সোজা পড়েছে, শব্দের বিচরণকে করেছে কঠিন, বাতাস হয়েছে তন্দ্রালু। সামনের উঠোনে ঘরের কাজ সেরে মেয়েরা সব ক্লান্ত হয়ে সিমেন্ট বাঁধাইয়ের ওপর ঝিমুচ্ছে। (ভোটক্রেতাদের দিয়ে যাওয়া) স্তূপাকৃতি গুঁড়ো দুধ বৃষ্টির জলে ভিজে বিষাক্ত সফেদ ধারায় পথের পাশে বয়ে যাচ্ছে। এক চোখ বুজে কুকুরগুলো ঘুমোচ্ছে, তাদের লেজগুলোতে মাছির তাড়না চলছে। বালির ওপর বসে বাচ্চারা আপন মনে খেলে চলেছে। একটু বড়ো যারা, তারা ইস্কুল থেকে ফিরে ইউনিফর্ম বদলেছে, তাদের মুখ রোদে-ধুলোয় কালো ঝামা, মাঝে মাঝে ঘামের স্রোতে একটু ফিকে। তারা তাদের মায়েদের ফরমাশ খাটতে ছুটছে এদিক-ওদিক। রোদের আলোয় শরবিদ্ধ হয়ে আমি (বালক নায়ক) দূরাগত রেডিওর সঙ্গীত ও আজানের শব্দ শুনছিলাম।

রাস্তার ওপারে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিত্তাকর্ষক বিষয়ের খোঁজে, ঘুমপাড়ানি রোদে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কখনও কখনও তাঁর স্টুডিও'র বাইরের গ্লাস কেসে ওয়াশ করে সে তার ছবিগুলো ঝুলিয়ে রাখতো। আমরা প্রায়ই যেতাম আমাদের সব অপরিচিত লোকদের বিবাহোৎসবের ছবিগুলো দেখতে। তাদের ঘরে-ফেরা উৎসবের (নায়ক প্রাযই পালিয়ে যেত) ছবিও দেখতাম তার মধ্যে ঝুলছে। তার পাশে ঝুলছে এসব পচা দুধ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা যখন এসেছিলো তখনকার সেই তুলকালাম কাণ্ডের ছবিগুলো, যেদিন ধূসর দারিদ্র্যের পটভূমিকায় অপমানহত জনতা সাদা দুধগুলো ঢেলে দিয়েছিলো সেদিনের ছবি। ছবিগুলো নিয়ে ফটোগ্রাফারের গর্বের সীমা ছিলো না, আমরা ক্যাবিনেটটার কাছে যেতেই সে তেড়ে এসে বলতো, 'এই হাত লাগাস না ক্যাবিনেটে, ফটোগুলো নষ্ট করবি !'

যতই সে তাড়া করত, তত আমরা আরো ঘিরে ধরতাম। স্টুডিওর বাইরের ক্যাবিনেটটা হলো আমাদের প্রথম পাবলিক গ্যালারি। প্রতিদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর আমরা যেতাম নতুন কি কি ব্যাপারের ছবি তুলেছে দেখতে, কোথায় সদ্য কাকে গোড় দেয়া হলো, নতুন কুচকাওয়াজ হলো কোথায়, বাজারে মেয়ে দোকানীদের কীভাবে গুণ্ডারা নাজেহাল করলো, নতুন কোন্ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীতে আগমন বার্তা জানালো তারস্বরে,

সেইসব ছবি। লোকটা আমাদের প্রথম স্থানীয় সংবাদপত্রও ছিলো বটে।

ছোটরাই প্রথম তার ফটোগ্রাফে আগ্রহ দেখায়। ক্রমে বড়রাও সকালে কাজে যাবার পথে একবার দেখে যেত, নতুন কী ফটোগ্রাফ ঝুলছে। সন্ধ্যায় ফেরার পথেও একবার দাঁড়িয়ে যেত তারা ক্যাবিনেটটার সামনে। আমাদের জন্য সবসময় তার চমক দেবার রসদ মজুত থাকতো, শেষে সে আমাদের আশার যোগান দেবার জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকতে শুরু করলো। তাকে কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলেই আমরা ছোটরা তাকে ঘিরে হৈচৈ করতাম। হেসে আমাদের দিকে ক্যামেরা তাক করে ছবি তোলার ভান করে সে তার স্টুডিওর গোপন কুঠুরিতে অদৃশ্য হতো। কিছুদিন পর আমরা তার আসল নাম ভুলে গেলাম। সে আমাদের সকলের কাছেই হয়ে দাঁড়াল– 'ফটোগ্রাফার'।

বিকেলবেলাগুলোতে তার কাঁচের ক্যাবিনেট থেকে তাড়া খেয়ে আমি গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করতাম। গোটা দুনিয়াটাই ছিলো আমাদের খেলার মাঠ। গলিঘুঁজি থেকে বড় রাস্তা, বাড়ির আনাচে-কানাচে, অর্ধসমাপ্ত বাড়ির অন্দর আর জঙ্গল— সর্বত্র আমাদের অবাধ গতি। হয়রান হয়ে খিদে পেলে আমি ফটোগ্রাফারের কাছে ফিরে যেতাম। মাঝে মাঝে সে বলতো— বিরক্ত করিস না আমাকে, কিন্তু প্রায়ই রুটির টুকরো হাতে দিয়ে বলতো, 'তোর বাপ কিন্তু ফটো তোলার দাম এখনও দেয় নি।"

অন্য একদিন চক্‌চকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্র করার ভাব নিয়ে বললো: 'আমার হয়ে বাপকে চাপ দে। যদি টাকা উসুল করতে পারিস, তো এনে দিলে তা থেকে তোকে এক শিলিং বকশিশ দেব, বুঝলি !"

প্রায়ই সে ধরে জিজ্ঞাসা করতো, বাবাকে তাগাদা দিয়েছি কিনা। শেষে শাসাল— টাকা এনে না দিলে খেতে দেবে না, কথাও কইবে না। একদিন দেখি তাকে খিদের জ্বালায় শুকনো-মুখ হতচ্ছাড়ার মতো দেখাচ্ছে, কাছে গিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই 'কোনো ব্যাটা ফটো তোলার পয়সা দেয় না' বলে ক্যামেরা বসানো তেপায়াটা নিয়ে আমাকে তাড়া করে এলো রাস্তায়। সেদিন সত্যিই সে হিংস্র হয়ে উঠেছিলো। ক্ষুধা ও তিক্ততা তাকে কুৎসিত করে তুলেছিলো। দিন কয়েক তাকে এড়িয়ে চললাম।

খিদের জ্বালা তার বাড়তে লাগলো। সকালে কাচের ক্যাবিনেটের ফটো পালটে দিতে সে ভুলে গেল। আমাদের নতুন চমক দেবারও আর কোনো উৎসাহ তার নেই। পুরোনো ছবিগুলো ফ্যাকাসে হয়ে বাদামী রং ধরলো, তারপর রোদের তাপে গেল দুমড়ে। রাতে দূর থেকে শুনতাম সে চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে। গাল পাড়ছে সবাইকে—তাকে পয়সা না-দেবার জন্য, চেঁচিয়ে বলছে— আমাদের মতো লোকেরাই মানুষকে সৎ থাকতে দেয় না, দুর্নীতির পথে, অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। জামাকাপড়ের দশা হতশ্রী হলো। দাড়ি জট পাকিয়ে কেমন বাদামী রং ধরলো। তবু সে খিদেতে দমবার পাত্র নয়— খিট্‌খিটে মেজাজ আর ঘোলাটে চোখ নিয়ে সে দিনের বেলা ঘুরেফিরে ফটো তুলেই চললো।

তার কাঁচের ক্যাবিনেটের চারপাশে ছোটদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা নতুন নতুন খেলা খুঁজে বের করলাম, তারপর ফুটবল খেলতে শুরু করলাম। একদিন বিকেলে অনির্দিষ্ট গোলের দিকে বলটাকে এমন বেগে লাথি কষানো হলো যে, সেটা গিয়ে কাঁচের

ক্যাবিনেটকে চুরমার করে দিল। একটা গাঁইতি নাচাতে নাচাতে বেরিয়ে এলো সে। চোখের দৃষ্টি উন্মত্ত, গতি উদ্ভ্রান্ত, জিবের ওপর পুরু সাদা আস্তর। চড়া রোদে রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে সে কাঁপতে লাগলো। ক্যাবিনেটটার কাছে এসে আমাদের ধ্বংসলীলার দিকে তাকিয়ে বললো— 'ওটা ছুঁবি না ! ছুঁলে খুন করে ফেলবো।'

বিবর্ণ ফটোগ্রাফ-লাগানো ভাঙা কাঁচের ঘেরাটোপের ভেতরে বলটা রয়েই গেল। বড়রা আসা-যাওয়ার পথে ঐ অপরূপ ফটো মন্টাজের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেত। অঝোর ঝরে বৃষ্টি নামবার পরেও ফুটবলটা ওর ভেতরেই রয়ে গেল। জলে ছবিগুলো ঝাপসা হয়ে গেল। ক্যাবিনেটের ভেতরটা হলো পোকামাকড়ের বাসা। অদ্ভুত আকৃতির চিনি আর ব্যাঙের ছাতা গজালো তার পরিশ্রমের ফসল ঐ নিরপরাধ ছবিগুলোর গায়ে। নিজের কাজে তার উৎসাহ সম্পূর্ণ লোপ পেল দেখে আমাদের মনটাও খারাপই হয়ে গেল। নিজের ছোট কুঠুরিতে বসে জ্বরে পুরতে লাগলো সে— ক্ষয়ে যেতে লাগলো এইভাবে, কখনও যখনও বাইরে এলে দেখা যেত—সমস্ত শরীরটা একটা নোংরা কালো কাপড়ে ঢাকা।

ওর ফটোগুলোর কথা ভেবে আমার এমন কষ্ট হলো যে, শেষ পর্যন্ত সাহস করে বাবাকে কথাটা বলেই ফেললাম। তিনি তো সে কথা তুললেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন। তাই শেষে মাকে ধরলাম। কিন্তু যতো তাকে বলি, তিনিও দেখি কাঠ হয়ে যান ততো। শেষে হাল ছেড়ে দিলাম। ওকে নিয়ে মন খারাপের ভাবটাও গেল ঘুচে। বিকেলে আর ম্যাডাম কোতোর মদের দোকানে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে দিয়েছিলো বলে সময় কাটাবার জন্য কী করি, পায়ের তলা যথারীতি চুলকোতে লাগলো, যথারীতি আমার স্বভাব অনুযায়ী দুনিয়ার পথে পথে ঘুরতে শুরু করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় বদ রাজনীতির ভ্যানটা ফিরে এলো। ছেলে বুড়ো মেয়ে শিশু এসে জড়ো হলো—সবাই ভাবছে একটা দারুণ কিছু হতে চলেছে। আমি রাস্তার ওপারে ফটোগ্রাফারের স্টুডিওর সামনে দাঁড়িয়ে ভ্যানটাকে দেখতে লাগলাম— এটাতেই সেদিন ভোটপ্রার্থীরা এসে আমাদের বিষাক্ত দুধ বিলি করে গিয়েছিলো। লাউড স্পীকারে তাদের ভাব-গদগদ বক্তৃতা শোনা গেল। আমরা পচা দুধের রাজনীতির কারবারীদের কথা চুপ করে শুনতে লাগলাম। শুনলাম, তারা পচা দুধ বিলি করার জন্য অন্য দলকে দুষছে। বলছে, বিরুদ্ধবাদী "দরিদ্র দল"-এর লোকজনরাই নাকি তাদের নাম করে গুঁড়ো দুধ বিলি করে গেছেন।

"দুধের কেলেঙ্কারির জন্য ওরাই দায়ী, আমরা নই। ওরা আমাদের বদনাম হয় যাতে তার কারসাজি করেছে—' লাউড স্পীকারে শোনা গেল।

শুনে খটকা লাগলো আমাদের। লোকগুলো তো একই দেখি ! সব ক'টাকে চিনতে পারলাম। এবার এনেছে ছাতুর ব্যাগ, সঙ্গে এনেছে দ্বিগুণসংখ্যক গুণ্ডা। ডাণ্ডা ও চাবুকও আছে মজুত, অর্থাৎ তারা দয়া ও যুদ্ধ দুই কর্মের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। 'আমরা আপনাদের মিত্র, আমরা এনে দেব বিদ্যুৎ, বাজে রাস্তা, ভাল দুধ নয়— নানা, থুড়ি, ভাল রাস্তা, বাজে দুধ নয়' — রাজনৈতিক নেতারা সজোরে ঘোষণা করলেন।

অগণিত লোক জড়ো হয়েছে। তার মাঝখান দিয়ে পথ করে ক্যামেরা কাঁধে এগিয়ে এলো ফটোগ্রাফার। ছবি তুলছিলো না সে, কিন্তু তার জ্বর, তার খিদের জ্বালা কোথায় উবে গেছে ! গুণ্ডাগুলো ছাতুমাখা বিলি করার জন্য পাত্রগুলো এগিয়ে ধরলো, কিন্তু কেউ তা স্পর্শও করলো না। নিঃশব্দে জনতা ভ্যানটাকে ঘিরে ধরলো। ভেতরে ভেতরে যেন কোনো গোপন বার্তা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের নৈঃশব্দে আসন্ন বিপদের ইশারা।

"আমাদের বিশ্বাস করো ! আমাদের মহান নেতাদের ওপর আস্থা রাখো। আমাদের দেয়া খাদ্যে আস্থা রাখো ! আমাদের পার্টি জাতীয় খাদ্যের বন্টনে বিশ্বাসী ... "

'মিথ্যা কথা।'—জনতার মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো।

'চোবেব দল।' আরেকজন বলে উঠলো।

'বিষের কারবারী !'

'খুনীর দল।'

চারজনের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর লাউডস্পীকারের কণ্ঠরোধ করলো। যে নেতারা বাঁধাধরা প্রতিশ্রুতিগুলো আউড়ে যাচ্ছিলো, তারা বেসামাল হয়ে তোত্‌লাতে শুরু করলো। লাউড-স্পীকারে চড়া পর্দায় ধাতব আওয়াজ বেরোলো। ভ্যানের চারপাশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার তাদের মধ্যে জমাট-বাঁধা নীরবতা। ভ্যানটা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলে নীরবেই তারা তার পিছু নিলো, মেয়েদের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে চাপা রাগ, পুরুষদের ভ্রূকুটিতে বজ্রবিদ্যুতের ইঙ্গিত। গুণ্ডার দল ভ্যানের পেছন থেকে লাফিয়ে নামলো।

'কারা আমাদের চোর বললো ?'

কেউ উত্তর দিল না। গুন্ডাদের চোখে পড়লো বেচারা ফটোগ্রাফার। কাঁধের ক্যামেরা তাকে সকলের থেকে আলাদা করেছে। গুণ্ডার দল তার দিকে এগিয়ে গেল, লাউডস্পীকারে তখন নেতা চেঁচিয়ে চলেছেন— 'আমরা আপনাদের বন্ধু।'

লোকের ভাবপ্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে নেতা বলে চললেন তার জনদরদের কথা। এদিকে, একই সময় গুণ্ডারা ঘুষি মেরে ফটোগ্রাফারের নাক দিয়ে রক্ত বের করে দিল। দ্বিতীয়বার ঘুষি তুলতেই, গোত্তা মেরে ফটোগ্রাফার আঘাত এড়িয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে দিল ছুট। ছাতুর মণ্ড বিলি আর জনদরদী বক্তৃতা চলতে লাগলো, হঠাৎ কে যেন ঢিল মেরে ভ্যানের জানালাটি চূর্ণ করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে জনতার ক্রোধের বাঁধ গেল ভেঙে। অগণিত হাত ভ্যানের দিকে উদ্যত, কে একজন নেতার মাথায় মারলো এক গাট্টা, তিনি লাউডস্পীকারে চেঁচিয়ে উঠলেন। ড্রাইভার ভ্যানটা চালিয়ে দিল; প্রবল ঝাঁকুনিসহ এগুতে গিয়ে গাড়িটা একটি মেয়েকে চাপা দিল। ফটোগ্রাফারের ক্যামেরাতে তা ধরা পড়ে গেল। মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো, জনতা ভ্যানের উদ্দেশে ঢিলবর্ষণ করতে লাগলো। উইণ্ডস্ক্রীন, পাশের জানালা সবক'টি ভেঙে গেল। জনতা এবার গাড়ির সামনে পড়ে তাকে আর এগোতে দিল না। গুণ্ডারা লাফিয়ে নেমে জনতার গায়ে এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে লাগলো, পাগলের মতো সবকিছুর ছবি তুলতে লাগলো ফটোগ্রাফার। জনতা ঢিল ছুঁড়তেই থাকলো। গাড়ির দফা শেষ করে তারা এবার ছাতু-বিলিকারীদের তাক করে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। তারা চেঁচিয়ে গগন ফাটালো, মুখের ওপর দরদর করে রক্ত ঝরছে।

নেতা মহাশয় বললেন, 'আপনারা শান্ত হোন' ; ভিড়ের মধ্যে একজন বললো, 'পাথর ছুঁড়ে সাবাড় করো ওদের।' অন্য কে বললো : 'ভ্যানটাতে আগুন ধরিয়ে দে।'

এদিকে গুণ্ডারা চাবুক চালিয়েই যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত জনতা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মেয়েরা বিশেষভাবে বদলা নেবার তাগিদে তাদের মাথায় চ্যালা কাঠ আর তক্তা ভাঙতে লাগলো। একজন ছোটোখাটো মহিলা, যার তিনটি শিশু তখনও পচা দুধ খেয়ে ভুগে-ভুগে সারা, হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, হাতে গামলা ভরা ফুটন্ত জল। 'সরে যাও সব ! আমি এই জল ওদের গায়ে ঢেলে দেব!' জনতা তাকে পথ করে দিল। গুণ্ডারা লুকিয়ে ছিলো ভ্যানের পেছনে। তাদের গায়ের ওপর সে ফুটন্ত জল দিল ঢেলে। গগনভেদী চিৎকার তুলে তাবা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়লো, ছাতুর ব্যাগে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, তখন জনতা তাদেরই আনা চাবুক ও লাঠি তাদের ওপর প্রয়োগ করতে লাগলো। যারা ছুটে পালাতে গেল, তাদের তাড়া করলো পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে। 'বাঁচাও বাঁচাও, আর না, আর না' বলতে বলতে তারা দিগ্বিদিক ভুলে ছুটলো। ঢিলবর্ষণ ও রক্তঝরা অব্যাহত রইলো। পালিয়ে তারা কেউ কেউ খানা-ডোবার দিকে ছুটলো। একদল তাদের সেখানেও তাড়া করলো। কোমরসমান পচা জল ভেঙে মরিয়া হয়ে গুণ্ডারা দূরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হলো। যারা তাড়া করেছিলো ফিরে এলো তারা, রাগ তখওে একটুও পড়ে নি।

ভ্যানে শুধু চালক একা বসে। উন্মাদ ক্রোধ আর বাধা মানে না, আমরা এবার ভ্যানটাকেই লাঠি মারতে লাগলাম, ঢিল মেরে টোল খাইয়ে দিলাম। জ্বালানি কাঠ আর লোহার ডাণ্ডা মেরে ওটার টিনের আর এলুমিনিয়ামের খোলটার বারটা বাজিয়ে দিলাম। শাস্তি পেয়েও ভ্যানটা তো চেঁচালে না ! তাই আমরা পরম উৎসাহে ওটাকে উলটে কাত করে দিলাম। আরশোলার স্বাভাবিক চলৎশক্তি প্রয়োগ করে ড্রাইভারটা ওটা থেকে হাতপা ছুঁড়ে কোনোক্রমে বেরিয়ে এলো, একমাত্র ওটাই মারধোর না খেয়ে সোজা ছুট দিল ম্যাডাম কোটোর পানশালার দিকে, আশ্রয় পেল সেখানে।

ভ্যানটা কাত হয়ে পড়ে রইলো। সারা রাত ধরে ওটার ওপরেই সবাই গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগলো। ট্রাকভর্তি পুলিশ আসছে শুনেও কারো ভ্রূক্ষেপ নেই, ভ্যান নিধন চলতে লাগলো। পুলিশরা এসে পৌছুতে-পৌছুতে ইতোমধ্যে নিষ্ফল ক্রোধ চরমে উঠেছে। পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ এসে যখন হৈহৈ করে হুকুমদারি করতে করতে আর হুইসেল বাজাতে বাজাতে ট্রাক থেকে নামছে, ততোক্ষণে রাতের আকাশে হলুদবর্ণ আগুন বিস্ফোরণ সৃষ্টি করছে। নিরুপায় পুলিশবাহিনী দূর থেকে অগ্নিদেবের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করলো— বজ্রগর্জনে ভ্যানটা অসংখ্য লেলিহান অগ্নিশিখায় ফেটে পড়লো। পুলিশরা লোকদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললো, তারা তো কিছু জানে না, সবাই ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ আওয়াজ শুনে বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছে। পুলিশ কেবল পাঁচজনকে সন্দেহ করে পাকড়াও করলো। ভ্যানটার বিষয়ে তাদের কিছুই করার ছিলো না। সেটা শেষবারের মতো ফেটে পড়ে গগন বিদীর্ণ করলো। সারারাত ধরে আগুন জ্বলতেই থাকলো—দমকল বাহিনী এলো না তা নেবাতে। পুলিশরা যখন জেরা করার জন্য ঐ লোক-ক'টাকে টেনে ট্রাকে তুলছে, তখনই আমি তাদের মুখ প্রথম দেখতে পেলাম।

তাদের একজন ছিলো আমাদের ফটোগ্রাফার। কোনো মতে সে তার ক্যামেরাটা আগেই সরাতে পেরেছে, তাই ঘটনার সাক্ষীগুলো গেল বেঁচে। তার চোখের দৃষ্টিতে অকম্পিত সাহস দেখেছিলাম। আমাদের দিকে হাত নাড়ালো সে, তারপর তাকে তারা টেনে নিয়ে গেল।

দগ্ধ ভ্যানটা অনেক কাল ওখানে পড়ে রইলো। রাতে ছায়ার মতো কারা এসে ইঞ্জিন থেকে কলকব্জা খসিয়ে নিয়ে যেত। একদিন সকালে দেখি ওটাকে আবার চারপায়ে দাঁড় করানো হয়েছে। যেন রাত্রিদেবী ওটাকে রথ হিসেবে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাচ্চাদের পক্ষে ওটা একটা নতুন খেলার জায়গা বলে প্রতিপন্ন হলো। আমরা স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসে ওটাকে আমাদের অলীক কল্পনার রাজ্যে দীর্ঘযাত্রার বাহন করে তুললাম। দগ্ধ ভ্যানটির গায়ে অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়লো, রোদে ধুলোয় রঙ গেল জ্বলে, দিন কয়েক বাদে গায়ে লেখা পার্টির নামটাও ঘুচে গেল। ওটাকে শনাক্ত করার মতো আর কোনো চিহ্ন বাকি রইলো না, ওটাকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে ভাসিয়ে রাখার কোনো উপায় বাকি রইলো না। ক্রমে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো, শারীরিক অর্থে নয়, আমাদের দৃষ্টি থেকে।

তিনদিন বাদে ফটোগ্রাফার খালাস হলো। সে বললো, গারদে তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। গলার স্বর তার এখন চড়া পর্দায়, ভয়-ভয় ভাবটা গেছে ঘুচে। জেলখানা তাকে বদলে দিয়েছে মনে হলো। কেমন একটা রহস্য-ভাব মেখে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যেন স্বল্পকালের অনুপস্থিতিকালে সে কোনো বীর চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করার সঙ্কল্প নিয়েছে। এলো যখন, তখন তার বাহিনীর সামনে অনেকে জড়ো হয়ে তাকে বীরোচিত স্বাগত জানিয়েছিলো। সে আমাদের তার বন্দীদশার নানা গল্প বলতো। কেমন করে তার কাছ থেকে হাঙ্গামার নেতাদের নামধাম আদায় করার জন্য অত্যাচার চালায়, আর সে কী করে সেসব এড়ায়, কেমন করে তাকে রাজার সরকারের (উপন্যাসটির কাল ঠিক ১৯৬০ সাল, নাইজেরিয়া স্বাধীনতা পাবার ঠিক আগে-অনুবাদক) এবং দেশের যারা শত্রু তাদের শনাক্ত করতে বলে— এইসব গল্প। তার গল্প শুনতে শুনতে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকতো। লোকেরা শেষে তাকে খাবার যুগিয়ে যেত, সঙ্গে তাড়ি, কোলা বাদাম, চাইলে সে এখন পাঁচ পাঁচ বউও যোগাড় করতে পারতো; কিন্তু তার নতুন রহস্যময় ভূমিকা তাকে সেদিক থেকে বিরত করেছিলো। আমি ওর ঘরের বাইরে ঘুরঘুর করে রাতে বড়দের কথা শুনলাম। মদ খেতে খেতে তারা ফটোগ্রাফারের গুণগান করতো গম্ভীর গলায়। এমনকি বাবাও একদিন তার বাড়িতে নিজে থেকে এসে ভদ্রতা করে গেল।

পরদিন ঘুম ভাঙলো মহা উত্তেজনার মধ্যে। চারধারে সবাই খুব উচ্চকিত হয়ে কথা কইছে। এতকাল খবরাখবর আসা-যাওয়া করতো মুখের কথায়, গুজবে। এবার খবরের কাগজের পাতায় আমরা স্থান পেয়েছি। অক্ষরগুলো রাতারাতি আমাদের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাই আমাদের নাটকের নায়ক সবাই। অগণিত নারী, শিশু, জোয়ান, বৃদ্ধের ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিতে আমাদের ক্ষোভের, রাগের, নেতাকে নাস্তানাবুদ করার, গুণ্ডাদের দমন করার, মিথ্যাকে ভস্মীভূত করার সাক্ষ্য। আমাদেরই ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি খবরের কাগজে বিশেষ জায়গা পেয়েছে, এমনকি নিউজপ্রিন্টের দানাদানা পটেও

আমাদের অনাহারক্লিষ্ট মুখগুলো চেনা যাচ্ছে। পচা দুধ বিলির খবরও ফলাও করে ছাপা হয়েছে। আমরা অবাক হলাম দেখে যে পৃথিবীর এক নগণ্য কোথায় আমাদের এই অপরিকল্পিত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের কাহিনী হঠাৎ এতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলো। আমাদের অনেকেই সারা বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম ছবির জঙ্গলের মধ্যে নিজদের মুখগুলো চিনে নিতে ও চিনিয়ে দিতে।

অগণিত মুখের মাঝখানে মায়ের মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কোটির ওপর লোক এই মুখটা দেখতে পাবে, মুখের মালিককে জীবনে দেখবে না। মায়ের মাথায় একটা পচা দুধের ভাণ্ড। খবরের কাগজের কল্যাণে তার মুখের লাবণ্য উঠে গেছে, তাকে কেমন হতশ্রী দেখাচ্ছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মা হাট থেকে জিনিস বেচে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরে তাকে ঘিরে জটলা হলো, সবাই তার খ্যাতির কথা বলাবলি করতে লাগলো। বললো, এরপর বাজারে মায়ের দোকানে বিক্রি বাড়বে। তারপর চললো গুন্ডাদের প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প, আর বস্তিমালিকের রাগ নিয়ে আলোচনা। মালিক রেগেছেন তার ভাড়াটেরা তারই পার্টির লোকজনকে হামলা করেছে বলে।

জাতীয় সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় আমাদের ছবি দেখে আমরা বেশির ভাগই উল্লসিত হয়েছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম আলাদা করে ফটোগ্রাফারের নিজের ছবি ছাপা হতে দেখে, তলায় আবার তার নামও লেখা। নামের তলায় আঙুল বুলিয়ে আমরা বারবার পড়লাম, তারপর তার ঘরে গেলাম তাকে অভিনন্দন জানাতে। সে সেদিন ভারিক্কি চালে কলার উঁচিয়ে জাতীয় রাজনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর কথা বলতে লাগলো। আমাদের আঙিনাতে এসে সব ঘরে ঢুকে ঢুকে সে খানাপিনা করে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলো। কিন্তু খ্যাতি বা মদ্যপান দুটোর কোনোটাই তাকে তার আগেকার ফটো তুলে দেবার পারিশ্রমিকের জন্য তাগাদা দেবার ব্যাপারে আটকালো না।

বাবা কাজ থেকে ফিরে কাগজে মায়ের ছবি ছাপার খবর পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও ঈর্ষান্বিত হলো। মুখে বললো মাকে দেখাচ্ছে নিখাকী মেয়ে ওঝার মতো। কিন্তু সেই সঙ্গে সেটা কেটে বাবা দেয়ালে সেঁটেও রাখলো দেখলাম। তারপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো— 'তোদের মা তো বিখ্যাত হয়ে গেল দেখছি।'

শেষ পর্যন্ত ফটোগ্রাফার আমাদের ঘরেও ঢুকলো। বাবা আমাকে কয়েকটা বোতল কিনতে পাঠালো। ফিরে দেখি ইতোমধ্যেই ফটোগ্রাফার মাতাল হয়ে টলছে, হাতে কাল্পনিক ক্যামেরার শাটার টিপছে, নেতা ও তাদের গুণ্ডাদের ভেঙ্গাচ্ছে, আর মা-বাবাও হেসে কুটিপাটি। বাবার চেয়ারে বসে ঢুলতে ঢুলতে সে জড়িত কণ্ঠে বললো : 'আমি হচ্ছি আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফার।'

বকবক করতে করতে এক সময় সে চুর হয়ে বাবার চেয়ার থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আমরা আবার ধরে বসিয়ে দিলাম। হঠাৎ চটকা ভেঙে যে জায়গায় থেমেছিলো, সেখান থেকেই আবার কথা বলতে শুরু করলো।

এক সময় দেখি তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কিছু শোনা যাচ্ছে না। টেবিলের ওপর মোমবাতির শিখা কাঁপছে। আমার কেমন-কেমন বোধ হলো।

বাবা খুব দিলদরিয়াভাবে বললো— 'যাও আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফারের জন্য খাবার তৈরি করো।'

মার সঙ্গে পেছনের উঠোনে গেলাম। খাবার নিয়ে ফিরে দেখি ফটোগ্রাফার মেঝেতে ঘুমে অচেতন। তাকে জাগানো হলো। খেতে খেতে কী সব বিষয়ে কথা বললো যেন। তারপর খাওয়া শেষে আর মদ খাবে না বলে, ধন্যবাদ দিয়ে, সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করে টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শেষ যে কথাটা বললো, তাতে আমরা অভিভূত হলাম :

'এই চত্বরে তোমরা হচ্ছ আমার একমাত্র প্রিয় পরিবার।'

তারপর টলতে টলতে রাতের অন্ধকারে সে অদৃশ্য হলো। মা-বাবা তাকে দরজা-অবধি এগিয়ে দিয়েছিলো। বাবা ঠিক বিদায় মুহূর্তে তার করমর্দন করেছিলো। তারপর আমরা ফিরে এলাম। বাবার মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু এই প্রথম তাকে মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়াতে দেখা গেল। পোড়া ভ্যানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাবা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর আমার মাথার পেছনে টোকা মেরে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করে হঠাৎ বললো, 'আনন্দের পরেই দুঃখ আসে। মনে হয় কপালে দুঃখ আছে আমাদের।'

অনুবাদ : ধ্রুবগুপ্ত

*বেন ওকবির সাম্প্রতিকতম উপন্যাস The Famished Road তাঁর তথাকথিত 'magical realism'-এর জন্য বিশেষ আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি অর্জন করেছে। সেই উপন্যাস থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। এটি আফ্রিকার সাম্প্রতিকতম রচনার উদাহরণ।

ধর্মঘট ◻ সেমবেন ওসমান

('গডস্ বি অফ উড' উপন্যাস থেকে)

একটু একটু করে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। নিশ্চল রেল-ইঞ্জিন ও কামরায়, নিশ্চুপ ওয়ার্কশপ আর শেডে, সাদা বাংলো আর মাটির বাড়িতে, কুঁড়েঘর আর বস্তির ওপর নীলাভ ছায়া সন্তর্পণে নেমে আসছিলো। পুলিশ-ব্যারাক থেকে ভেসে এলো বিগুলের ডাক।

এইভাবেই রেল ধর্মঘট ঘাঁটি গাড়ল থিয়েসে। পূর্ণ হরতাল, রেলপথের পার্শ্ববর্তী অনেক মানুষের জন্য যা ছিল কষ্টসাধনের সময়, অনেকের জন্য হয়ে.উঠলো ভাববার সুযোগও। সাভানা তৃণভূমির ওপর দিয়ে যখন আর ধোঁয়া ভেসে যায় না, তখন তারা বুঝতে পারল, একটা যুগ শেষ হয়ে গেছে, যে-যুগের কথা বয়স্করা বলত, যে-যুগে আফ্রিকা ছিল একটা সব্জিবাগান। এখন তাদের দেশটাকে শোষণ করে যন্ত্র। সেই যন্ত্রের গতি যখন তারা পুরো হাজার মাইল দৈর্ঘ্য জুড়ে থমকে দিল, তখন তারা নিজেদের ক্ষমতা তো টের পেলই, সঙ্গে সঙ্গে টের পেল নিজেদের পরাধীনতা। যন্ত্র আসলে তাদের নতুন মানুষ বানিয়ে দিচ্ছিল। সে তাদের সম্পত্তি ছিল না, বরং তারাই ছিল তার দাস। থেমে গিয়ে সে তাদের এই শিক্ষা দিল।

দিন যায়, রাত যায়। কোনো খবর নেই, শুধু সেই খবর যা প্রতি ঘন্টায় প্রত্যেকটা ঘরে আসে, আর কখনও বদলায় না—ভাঁড়ার শূন্য, সঞ্চয় শেষ, ঘরে কানাকড়ি নেই। লোকে ধারে জিনিস কিনতে যেত, কিন্তু দোকানদারের সবসময় একই উত্তর—তোমার কাছে তো আমি আগেই এত টাকা পেতাম। আর আমারই বা কি হবে? আমি তো পরের বিলটাও মেটাতে পারব না। অন্য লোকের পরামর্শ নাও না কেন তোমরা? কাজে ফিরে যাচ্ছ না কেন?

এভাবে যন্ত্রকে আরও একটু কাজে লাগান হলো—মোপেড আর সাইকেল নিয়ে যাওয়া হলো সুদের কারবারীর কাছে, ঘড়িগুলোও গেল, জমকালো বৌ বৌ, খুব বড় অনুষ্ঠান ছাড়া যা পরা হয় না, সেগুলো গেল তারপর। ক্ষিধে ঘর বেঁধেছিলো তাদের মাঝে; নারী-পুরুষ-শিশুরা রোগা হতে লাগল। কিন্তু তারা দমলো না। আরও ঘনঘন সভা করল, নেতারা আরও সক্রিয় হলো, সকলে শপথ নিল, তারা মাথা নোয়াবে না।

দিন যায়, রাত যায়, হঠাৎ একদিন সকলকে চমকে দিয়ে ট্রেন চলাচল আবার আরম্ভ হল। ইঞ্জিনচালকরা এসেছিল ইউরোপ থেকে, সৈনিক আর নাবিকরা হয়ে গেল রেলকর্মী আর স্টেশন মাস্টার। প্রতিটা স্টেশনের সামনের জায়গাটুকু কাঁটাতার দিয়ে ব্যারিকেড করে

দেয়া হলো। বেড়ার পেছনে অস্ত্রধারী সৈনিকরা রাতদিন পাহারায়। এবার তাদের সঙ্গে বসবাস করতে এল ভয়। যারা ধর্মঘট করছিল, তাদের মধ্যে একটা পরিভাষাহীন ভয় দানা বাঁধতে আরম্ভ করল, তারা ভীষণ আশ্চর্য হলো—নিজেরা যে শক্তিকে ক্রিয়াশীল করেছিল, তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, এই শক্তিকে তারা আশায় লালন করবে, নাকি ধ্বংস করে ফেলবে হতাশায়। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গদের ঘাড়ে চাপল সংখ্যার ভূত। এই গম্ভীর জনসমুদ্রের মাঝখানে তারা, সংখ্যালঘুরা, কিভাবে নিরাপদ বোধ করবে? দুই বর্ণের যেসব মানুষের মধ্যে আগে সখ্য ছিল, তারাও একে অপরকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। শ্বেতাঙ্গ মহিলারা পুলিশ-প্রহরা ছাড়া বাজারে যেত না। এমনও ঘটলো, কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা তাদের জিনিস শ্বেতাঙ্গদের বিক্রি করতে রাজি হলো না।

দিন যায়, রাত যায়। এদেশে একটি পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে, নিঃসন্দেহে এ কারণেই প্রথম-প্রথম স্ত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের তারা কোনো মূল্য দেয় নি। কিন্তু অচিরেই তারা আসন্ন কালের এক নতুন চেহারা আবিষ্কার করলো। একজন পুরুষ যখন মাথা নিচু করে খালি পকেট নিয়ে সভা করে ফিরত, তখন প্রথমেই তার নজর যেত রান্নাঘরে নেভা উনুনের দিকে, পাশে উপুড় করা হামানদিস্তে, খালি বাটি আর কালাবাশ ডাঁই করে রাখা। তখন সে কোন এক স্ত্রীর বুকে মাথা রাখত, তা সে প্রথম স্ত্রীই হোক আর তৃতীয়ই হোক। আর নারীরা এই হেঁট মাথা, স্খলিত পায়ের সম্মুখীন হয়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল যে, তাদের জীবনেও কোন এক পরিবর্তন আসন্ন।

কিন্তু যদি তারা তাদের পুরুষদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নেয়, তাহলে শিশুদের কি হবে? এদেশে শিশুরা অসংখ্য আর তাদের গোনার অভ্যাস কারো নেই। কিন্তু এখন তারা উদ্দেশ্যহীন উঠোনে ছুটোছুটি করছে, অথবা মায়ের কাপড় ধরে ঝুলে রয়েছে, হাড় জিরজিরে, চোখ কোঠরাগত, আর সেই মর্মান্তিক নিত্যনৈমিত্তিক প্রশ্ন ঠোঁটে লেগে আছে—'মা, আমরা কি খাবো আজ?' তারপর নারীরা দশজন চারজনের দল বাঁধে, বাচ্চাগুলোকে পিঠে চাপায়, বড়গুলো সামনে-পেছনে দৌড়োয় এবং নারীরা বলে, 'দেখি গিয়ে অমুকের বাড়ি, হয়তো তার কাছে একটু গম আছে', আর এই তীর্থযাত্রা শুরু হতো ঘর থেকে ঘরে। প্রায়ই অমুক দেবী বলতেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই; চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।' তিনিও ঝোলা বুকে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে মিছিলে যোগ দিতেন। কখনও তারা কোন একটা বাড়িতে এসে উপস্থিত হতো, যেখানে গিন্নির কাছে তখনও একটু জল আছে; তিনি কালাবাশটা হাতে হাতে ঘুরিয়ে দিতেন ঠিকই, কিন্তু বলেও রাখতেন, 'সবটা শেষ কর না যেন।'

দিন দুঃখী, রাত দুঃখী, বেড়ালের কান্নায় গায়ে কাঁটা দেয়।

একদিন সকালে একজন নারী উঠে দাঁড়ালো, দৃঢ়ভাবে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আজ আমি তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসব।'

আর পুরুষরা বুঝতে পারল এই যুগ, যা নতুন পুরুষ তৈরি করছে, নতুন নারীরও জন্ম দিয়েছে।

অনুবাদ : ঈপ্সিতা চন্দ

‘কী বলবো তোদের, বাছারা’* □ সিন্‌দিওয়ে মাগোনা

আমার গর্বভরা শিক্ষকজীবন শুরু হতে না হতেই, তিন মাস যেতেই প্রবল ধাক্কা খেলাম।

আমার প্রেমিকের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য ফিসফিস করে (যদিও ঘরে কেউ ছিলো না) কথা বলেই আমরা বুঝলাম আমি সন্তানসম্ভবা।

চিকিৎসক পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, ‘তিন মাস’। সেটা ছিলো জুলাই মাস, সর্বসাকুল্যে চার মাস হলো চাকবি করেছি তখন।

১৯৬২ সালে আমাদের অঞ্চলে জন্মনিরোধ ব্যাপারটা একেবারেই পরিচিত ছিলো না। আগে সনাতনী সমাজে বয় : সন্ধিকালে যৌনশিক্ষা ছিলো জীবনের অঙ্গবিশেষ। বালক-বালিকাদের এমনভাবে যৌনক্রীড়ার শিক্ষা দেয়া হতো যে, তাতে একভাবে তাদের নবজাগ্রত কামনার তুষ্টিও হ'তো, আবার অকাল পিতৃত্ব-মাতৃত্বের সম্ভাবনাও রহিত হতো। তারপর এলো খ্রীস্টান মিশনারিরা, যৌনশিক্ষার পাঠ গেলো উঠে। সবই ভালো হলো : কেবল দেখা গেল স্বাভাবিক কামনাকে খ্রীস্টধর্ম বা ‘সভ্যতা’ কোনোটাই রোধ করতে পারলো না।

আকাশকে ত্যাগ করতে সূর্য অন্তর্হিত হলো। আমার ব্যক্তিগত সঙ্কট পারিবারিক বিপর্যয় ডেকে আনলো। মেয়েসন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছে বলে বাবাকে সবাই খুব বকাবকি করতো। তারা যা বলেছিলো তাই নাকি এখন অক্ষবে-অক্ষরে ফললো— এই তাদের বক্তব্য। আমার বাবা-মা টাকা ধার কবে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আর কী প্রতিদান তারা পেলেন আমার কাছ থেকে? তাদের জন্য একটা বছরও কি আমি চাকরি করে অর্থোপার্জন করতে পারলাম, একটা বছরও?

পরিবারে এরকম বিপর্যয় ঘটলে যা সাধারণত করা হয়, এক্ষেত্রেও তাই করা হলো। কাছের, দূরের সব আত্মীয়-স্বজনকে জানিয়ে দেয়া হলো— আমাদের মেয়ে নষ্ট হয়েছে। সে এখন ‘ভারি’ (সন্তানের ভারে) হয়েছে। বাড়িতে কেউ মারা গেলেও তাই করা হতো, পার্থক্য শুধু এই যে, খুব দূরে যারা থাকে অর্থাৎ আসতে যাদের ট্রেনে একদিন লেগে যায় তারা কেউ এলো না, হয় চিঠি লিখে নয়তো লোকমুখে বাবা-মাকে সহানুভূতি জানালো এবং কেউই কালো পোষাক পরলো না।

কাছের আত্মীয়রা মৃত্যুশোকাচ্ছন্ন মুখভঙ্গিসহ আবির্ভূত হলেন। সবাই চাকরি-বাকরি

করে, কাজেই কেউ এলো সে সপ্তাহেই সন্ধ্যার পর, কেউ এলো সপ্তাহান্তে। প্রচুর অশ্রুবর্ষণ হলো, প্রধানত মেয়েদের চোখ থেকে, দু'চারজন পুরুষও বাদ গেলেন না। এতো চোখের জল ঝ'রলো যে, ততক্ষণে আমার নিজের অশ্রুর উৎসে গেছে শুকিয়ে। আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলাম না, চেহারাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। এমনকি আমিও মাঝে মাঝে ব্যাপারটা অলীক ভেবে ক্ষণস্থায়ী স্বস্তি পেতাম। এরকম পাতলা কোমর কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর হয় কী করে? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি। সাত মাস পর্যন্ত আমাকে দিয়ে 'ভোগ' কোম্পানির সাঁতার পোশাকের বিজ্ঞাপনের মডেল অনায়াসে করা যেত।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর তিনজন লোককে পাঠানো হ'লো আমারই দেয়া ঠিকানাতে। আমার সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে তারা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলো। রাতের আঁধারেই তারা যায়, প্রকাশ্য দিবালোকে নয়। ভগবানের দয়া এই তাদের সঙ্গে আমাকে যেতে হয় না, যেটা দস্তুর। নিয়ম হ'লো : পরিবারের লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে 'নষ্টা' নারীরই দেখিয়ে দেয়া চাই দায়ী পুরুষকে, তার কুকর্মের সাথীকে, কেননা পরিবারের মুখে চুনকালি দেবার জন্য সেই মেয়েই দায়ী। তাই পরিবারের সুনাম ফিরে পাবার অভিযানে তাকেই পথপ্রদর্শক হতে হবে।

কিন্তু শিক্ষক হবার দরুন আমাকে এই সর্বজনসমক্ষে অপমান ভোগ করতে হলো না। সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে তার স্তম্ভগুলোর ওপর। তাতে ফাটল দেখা গেলে, মরিয়া হয়ে তা মেরামত করার চেষ্টা করা হয়। সেটা সম্ভব না হলে, সমাজ কোনোরকমে সে ফাটল লোকচক্ষুর আড়াল করার চেষ্টা করে। ফলে, আমি খানিকটা রেহাই পেলাম। তবে পুরোটা নয়, মোটেই না।

স্কুলে কাজ ভালোই চলছিলো, প্রিন্সিপাল আমার ওপর বেশ প্রসন্ন ছিলেন। আমাদের নেটবলের দলের বেশ সুখ্যাতি ছিলো শহরে, আমি তার শিক্ষক ছিলাম।

কিন্তু আমার ভেতরে তখন একটা শিশু বিরাজ করছিলো। আমি খেলতে-খেলতে ছোটদের সঙ্গে ছোটদের মতো করেই মিশতাম, এইভাবে আমি আমার বিদায়ী শৈশবকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করতাম। যে হারে সে শৈশব অপসৃত হতে লাগলো, সেই হারেই আমার অভ্যন্তরে একটি নতুন শিশু অবাধে বাড়তে লাগলো।

মুশকিল হলো আমার মানুষটির লোবোলা বা কনেপণ দেবার ক্ষমতা ছিলো না। এদিকে শিক্ষিত মেয়ের বাজার-দর বেশি বলে আমার মা মনে করতেন, আমার চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানা মেয়েরা বিয়ের সময় মা-বাবার ঘরে দু' থেকে পাঁচ হাজার ব্যাণ্ড তাদের ভাবী স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে যেতো। আমার দুর্ভাগ্য বা বোকামি, আমি একটা অস্থায়ী শ্রমিককে আমাকে 'নষ্ট' করতে দিয়েছি, তার পকেটে এমন কিছু তো থাকতো না যে পকেট ওল্টালে গুগুলেটুর রাস্তায় পয়সা ঝরে ঝরে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত বাবা একটা রফা করেন কয়েক সন্তান জন্মের মাস তিনেক আগে। একটা বাহুল্যবর্জিত সনাতনী খ্‌খসা (X hora) অনুষ্ঠান করা হ'লো মান বাঁচাবার জন্য। আমার স্বামী প্রতীকী লোবোলা দিলো, একটা ভেড়া বলি দেয়া হ'লো। আমি নতুন বাড়ি গেলাম। আমরা হলাম দম্পতি।

তরুণী স্ত্রী, আসন্ন প্রসবা, চাকরিটি গেছে। আমি হলাম 'গৃহিণী (housewife)। সেন্ট ম্যাথুস্ থেকে পাস করে মনে একটি সার্থক চাকবি জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বেরুবার এক বছর যেতে-না-যেতেই বাড়িতে বসে থাকা গৃহিণী। যদিও ঠিক 'ফেমিনিস্ট' ছিলাম না, কিন্তু সেন্ট ম্যাথুস-এ পড়বার সময় সহপাঠিনীদের বলতাম, আমি বাপু সারাজীবন কেবল শার্ট কেচে আর মোজা রিপু করে কাটাতে পারবো না। আমার পতন হ'লো, দিনে-দিনে আরো তলিয়ে যেতে লাগলাম।

সিজারিয়ান সেকশন। জন্ম দেবার এক অপূর্ব উপায়, তবে একটা নেতিবাচক দিক আছে। মাতা সন্তানের আগমন প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অন্ততপক্ষে তখন তাই ছিলো। এখন শুনছি, লোকাল এনাস্থাশিয়া দিয়ে মাকে সজাগ রাখা যায় এবং সে সবই দেখতে পায়।

আমি তখনই সর্বকালের সর্বদেশের প্রতিটি মায়ের একান্ত নিজস্ব বোধকে অনুভব করলাম, প্রতিটি মায়ের কাছেই তার শিশু নিখুঁত সুন্দর। থেম্‌বেকা (শিশু) হয়তো কিছুই বুঝলো না; কিন্তু আমি হাসপাতাল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ প্রত্যয়স্থিত হ'লাম যে আমার কন্যা শুধু সুন্দর নয়, সর্বাঙ্গসুন্দর। অন্যরা আমার কথায় সায় দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। সে সময় কেউ আমাকে আমার শিশু ফ্রান্‌কেনস্টাইনের বউয়ের মতো দেখতে বললেও আমি তার কথা বিশ্বাসই করতাম না।

অ্যাম্বুলেন্সে করে থেম্‌বেকা ও আমি হাসপাতাল থেকে আমার বাপের বাড়ি এলাম। অ্যাম্বুলেন্সের ধাত্রী বাচ্চা কোলে এগিয়ে গেল, মা নিশ্চয় ভেতরে পথ চেয়ে বসেছিলো, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ধাত্রীর কোল থেকে নাতিনকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে মা দরজার দিকে এগুলো। ঘরে তোলার আগে চৌকাঠের বাইরে তাকে শুইয়ে শিশু-আচার পালন করা হলো বিধিমতো (উকুমগেনিসা এক্‌বায়া)। মা তারপর তাকে তুলে নিয়ে বুকে করে ঘরে নিয়ে গেল, সেই থেকে দু'জনে কী মাখামাখি। আফ্রিকান ঐতিহ্যে কোনো নবাগত শিশু অযাচিত নয়। অবাঞ্ছিত অন্তঃসত্ত্বা হতে পারে, কিন্তু শিশু কখনো অবাঞ্ছিত নয়।

থেম্‌বেকার জন্মের দু'মাস পরে আমি ভুলে গেলাম যে, আমার একটা অপারেশন হয়ে গেছে—আমি সবলে অবস্থার দাস হতে অস্বীকার করলাম।

বাবা-মা আবার আমাকে নিয়ে বিব্রত ও বিমর্ষ হলেন। আত্মীয়রা যারা আমার পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য প্রশংসামুখর ছিলো, তারা আবার নিন্দার কলরব তুললো। মজার কথা আমার মামা ও কাকারাই বাবার মুখে চুনকালি দেয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব হলেন। মাও দেখি তাদের সুরই ধরলেন! আমার জন্য এতোসব করার পরও।

আমার আত্মনিগ্রহ চলছে যখন, তখন হঠাৎ দেখি একদিন সিথেমবেলে-মামা এসেছেন, বাচ্চা দেখতে। এমনিতে তার মধ্যে কোনোদিনও তাপ-উত্তাপ দেখি নি। সী পয়েন্ট-এ একটা গ্যারাজে কাজ করেন।

'কেমন আছিস রে, সিন্দি?' ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'ভালোই'। এ অবস্থায় উল্লাস প্রকাশ

শোভা পায় না। পাছে লোকে ভাবে কৃতকর্মের জন্য আমি গর্বিত। ভুলের ফসল নিয়ে আনন্দ করার অধিকার কি তোমার আছে ?

মামা শুধালেন, 'লুনজানি উসানা?' (বাচ্চা কেমন আছে?)। উত্তরের অপেক্ষা না রেখে হাতে একটা এক রাণ্ড–এর নোট গুঁজে দিয়ে বললো, 'সাবান কিনিস'। 'সাবান' এখানে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে, খ্‌খসা ভাষায় এইভাবেই বলা হয় ('উইয়া কুজিথেংগেলা ইসেফু')।

'ডিপার্টমেন্ট অফ বান্ট এডুকেশন' সনাতনীপ্রথায় বিবাহকে স্বীকৃত দিতো না। প্রশাসনের চোখে তাই আমি অবিবাহিত। চার্চের চোখেও তাই।

শিশুর বয়স তিন মাস হতেই বেকারত্বের জ্বালা বোধ করতে লাগলাম তীব্রভাবে। শিক্ষকতার প্রশ্নই ওঠে না, অন্তত বছর দুয়েকের জন্য—আমাদের মতো 'পতিতা' শিক্ষিতাদের জন্য এই রকম 'শাস্তি'ই বিহিত।

হন্যে হয়ে কাজ খুঁজতে লাগলাম। বাসে চেপে যেতাম টেলিফোন–বুথের উদ্দেশে, ল্যানসডাউনে, ক্লেয়ারমন্টে, রাইলাণ্ডস বা আলথোনে। গুগুলেটুতে যে ক'টা টেলিফোন ছিলো, সবক'টা তার বিকল। অকস্মাৎ যদি তার কোনোটা একটু সচল হতো, তো তার সামনে লম্বা লাইন থেকে বোঝা যেত যে সেই দৈব ঘটনাটি ঘটেছে, ঐ টেলিফোনটা কাজ করছে।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করলাম, হোটেলে, হাসপাতালে, রেস্তরাঁতে, কারখানাতে। কপালে কিছু জুটলো না। ওয়েট্রেস, নার্সের সহচরী, ক্লিনার—কোনো কাজই পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে হলাম পরের বাড়ির দাসী।

অনুবাদ : ধ্রুব গুপ্ত

আফ্রিকা ও তার লেখক □ চিনুয়া আচেবে

বেশ কিছুদিন আগে আমি নিরীক্ষামূলক একটি বক্তৃতা শুরু করেছিলাম এভাবে : 'শিল্পের নন্দনতত্ত্ব আসলে দুর্গন্ধযুক্ত মলের মতো।' আজকে, বিশেষ করে এই মহান, পবিত্র প্রাঙ্গণে আমাব ভাষাকে অন্তত, যদি আমার মতামতকে নাও হয়, একটু সংযত করা দরকার মনে করছি। অন্য কথায়, আমি এখনও মনে করি যে শিল্প সবসময়ই মানুষের সেবা করেছে ও করছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের পুরাণ ও উপকথাগুলো সৃষ্টি করতেন। সেগুলো বর্ণনা করতেন একটি মানবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। (নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ আনন্দদান ও বিস্ময়-উৎপাদন সেই সব উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিলো।) সময়ের প্রয়োজন মেটাতে তারা কাঠের, পোড়ামাটির, ব্রোঞ্জের ও পাথরের ভাস্কর্য তৈরি করতেন। সেই যুগে সমাজে শিল্পীদের অস্তিত্ব ছিলো সরব-সচল। সমাজের মঙ্গলের জন্যেই তাঁরা শিল্প সৃষ্টি করতেন।

আমি 'মঙ্গল' শব্দটি ব্যবহার করছি যা কিনা আজকের সভ্য-ভদ্র সমাজে কেউ কবে না। সুতরাং এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'মঙ্গল' শব্দটি দিয়ে আমি কিন্তু 'নৈতিক উন্নতি সাধন' বোঝাচ্ছি না;—কিন্তু, তা নয়ই বা কেন? সেটাও এর একটা দিক নিশ্চয়ই। আমি মঙ্গল শব্দটি ব্যবহার করেছি সেই অর্থে, যে অর্থে ঈশ্বর প্রতিদিনের কাজের শেষে সারাবিশ্বকে মিলিয়ে দেখেন। দেখেন তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলের জন্যেই। এবং তখন, কেবলি তখন তিনি তাঁর সৃষ্টির ও কর্মের সার্থকতা খুঁজে পান। 'মঙ্গল' বা 'ভাল' এখানে সুন্দর বা দৃষ্টিনন্দন কিছু নয়।

শুরুতে শিল্প ছিলো সুন্দর ও প্রয়োজনীয়। এর বিমূর্ত ও ঐন্দ্রজালিক গুণগুলো তো সবসময়ই ছিলো; কিন্তু সেই বিস্ময়কর ইন্দ্রজালকেও কখনো-কখনো কোনো মৌলিক, মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হ'তো। সে মেটাতো একান্তই পার্থিব কোনো প্রয়োজন। যেমন, গুহামানব পাথরের গায়ে সেই সব পশুর ছবি আঁকতো, যাদেরকে সে পরবর্তী শিকারের সময়ে মারতে চায়।

কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে কোনো এক সময়ে এমন একটি ধারণা গড়ে উঠছিলো যে, শিল্পের কোনো কিছুর বা কারো কাছে কোনো জবাব দেবার দায় নেই। নেই নিজের ছাড়া কারো কাছে কোন দায়বদ্ধতা। ক্রমে শিল্প হয়ে উঠলো ছোটখাট এক ঈশ্বরের মতো। আর ভক্তরা হয়ে উঠলো পূজারী পুরোহিতের মতো, যারা সবাইকে শিল্পের বেদি-

মূলে একেবারে দ্বিধাহীন চিত্তে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন। তারা আহ্বান জানালেন হৃদয়-মন থেকে শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবরকম সন্দেহ ও প্রশ্ন দূরে সরিয়ে দিতে। কারণ, তাতে শিল্পের অসম্মান হয়, ক্ষুণ্ন হয় এর পবিত্রতা। 'এতে আমার কি লাভ ?'—এ ধরনের প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ পায়। 'প্রয়োজন', 'উদ্দেশ্য' 'মূল্য' এই সব শব্দ যেমন শিল্পের মর্যাদাহানি করে, এর পবিত্র উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন করে, তেমনি করি আমরা, অভদ্র ইতর জনগণ, যারা এর মধ্যে খুঁজি কোনো বার্তা, নৈতিক শিক্ষা বা মূল্যবোধ। শিল্প এক মুক্ত অস্তিত্ব। আমাদের সবার কাছ থেকে, সমগ্র মানব সমাজ থেকে এ মুক্ত। মানুষ ও তার এই পৃথিবী হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে, কিন্তু শিল্পের নীতিমালা (?) থেকে হারাবে না একটি ছত্র।

আমি কি অতিরঞ্জিত করছি? হয়তো একটু বাড়িয়ে বলেছি, তবে খুব বেশি নয়। সত্য যে এড্‌গার এলান পোর বিখ্যাত বক্তৃতা 'কাব্যের নীতিমালা' আগের প্রজন্মের কাছে যেমন ধর্মগ্রন্থের মতো পবিত্র ছিলো, এখন হয়তো এ প্রজন্মের কাছে তা নেই। কিন্তু 'কবিতা শুধু কবিতার জন্যেই' এই রোমান্টিক ধারণাটি এখনও সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন রাখে। আমার মনে পড়ছে, ক'বছর আগে আমি ভীষণ বিস্মিত হয়েছিলাম যখন আফ্রিকী লেখকদের একটি সম্মেলনে একজন অখ্যাত রোডেশীয় কবি গম্ভীরমন্দ্রে ঘোষণা করেছিলেন—ভাল কবিতা সবসময়েই স্বয়ম্ভু। আমি কখনোই কবি বা লেখকদের অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু সেদিন আমি খুশিই হতাম, যদি শাঙ্গো একটি লক্ষ্যভেদী বজ্রপাতে সেই কবিটিকে নীরব করে দিতেন আর তার প্রেতাত্মা পেতো তার পার্থিব নোটবইয়ে নূতন কবিতা (অথবা তার কাব্যের আঁকিজুঁকি সে যেখানেই করে থাকুক, তা) দেখার অনন্ত আনন্দ।

এটা সত্যই বিস্ময়কর (অথবা অতটা হয়তো বিস্ময়কর নয়, বরং বলা যায়, যথাযথ) যে, ইউরোপীয় মূলধারা থেকে পাহাড়ের আরেক পাশের ঢাল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আরেকটি স্রোতধারা যা সিক্ত করছে অন্য একটি ভূমিকে, বহন করছে অন্য একটি জীবনধারাকে। সেখানে সেই ঢালুতটে কবি কখনোই কবি নন, যদি লেখক সংঘ তাঁকে কবি না বলেন। এই দুই দলের মধ্যে দারুণ উষ্ণ বাদানুবাদ চলে। দু'পক্ষই পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয় তীব্র বাক্যবাণ পরস্পরের দিকে। দানবীয়, ফিলিস্তিনি, দুর্নীতিপরায়ন, অবক্ষয়িত! পরস্পরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ কখনো-কখনো এমনই সোচ্চার ও তিক্ত হয়ে ওঠে যে, তখন বিশ্বাস করাই কঠিন হয় যে এরা দুই দল একই পাহাড়ের দুই প্রান্তে বাস করে।

অনেক অনেক দিন আগে (আমার খুব প্রিয় একটি প্রচলিত ইওরুবা গল্পের নিজস্ব ভাবানুবাদ-অনুসারে) একই পথের দু'পাশের জমিতে দু'জন কৃষক জমি চাষ করছিল। কাজ করতে-করতে দু'জনে দু'পাশ থেকে গল্পে মেতেছিলো। তখন এষু—ভাগ্যের দেবতা, বিভ্রান্তির উদগাতা—ঠিক করলেন এই শান্তির পরিবেশটি তিনি বান্‌চাল করে দেবেন। তীক্ষ্ণ ও দ্রুত কল্পনাশক্তি নিয়ে এই দেবতা বিজলীর চমকের মতো নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি তার শরীরের একদিক সাদা খড়িমাটি দিয়ে রঙ করে আর একদিক কালো কয়লা দিয়ে কালো করে অসম্ভব দ্রুত পথের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলেন। তার পায়ের

শব্দ না-মেলাতেই দুই কৃষক একই সাথে কাজ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। একজন বললো, একটা অসম্ভব সাদা লোক এক্ষুণি এই রাস্তা দিয়ে গেলো, দেখেছিলে? আবেকজন তক্ষুণি বললো : 'একটা অবিশ্বাস্য রকম কালো লোক এপথ দিয়ে গেলো, দেখলে?' মুহূর্তের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তীব্র বাদানুবাদ ও ঝগড়ায় পর্যবসিত হলো, এবং শেষ পর্যন্ত মারামারিতে মোড় নিলো। ঝগড়া করতে করতে দু'জনেই চেঁচাচ্ছিলো 'লোকটি কালো ছিলো!' 'লোকটি ফর্সা ছিলো!' মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া-মারামারি করার পর তারা যার-যার খামারে ফিরে গেলো বৈরী ও বিষণ্ন নীরবতা নিয়ে। কিন্তু যেই মাত্র তারা তাদের কাজে মন দিয়েছে, অমনি দেবতা এষু ফিরে এলেন ও আরো দ্রুত বেগে তাদেব সামনের পথ দিয়ে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তেই দু'জন আবার লাফ দিয়ে উঠলো। একজন বললো, 'বন্ধু, তুমিই ঠিক ছিলে। আমি সত্যই দুঃখিত। লোকটি ফর্সা।' তক্ষুণি অপর লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি আমার দৃষ্টিভ্রমের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত। তোমার কথাই ঠিক— লোকটি প্রকৃতই কালো।' দেখতে-দেখতে আবার ঝগড়া থেকে মারামারি লেগে গেলো। এবার তারা ঝগড়া করতে-করতে বলছে 'আমি ভুল কবেছি।' 'না, আমিই ভুল করেছি।' আমাদের সময়ের পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী নন্দনতত্ত্বের মধ্যকার কলহকে অবশ্যই কৃষকদের নাটকেব প্রথম অঙ্কের সাথে তুলনা করা যায়—সত্য আব ন্যায়েব ওপবে একচ্ছত্র দাবি নিয়ে লড়াই। হযতো একদিন দেবতা এষু ফিরে আসবেন এবং দু'দলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবেন এবং দ্বিতীয় অঙ্কের শুভ উদ্বোধন ঘটাবেন। আত্মগ্লানি ও পাপের একচেটিয়া প্রাযশ্চিত্তেব অধিকার নিয়ে যুদ্ধেব। আজ আফ্রিকাব লেখকেরা যখন বিশ্ববলয়ে উঠে আসছেন নিজের অবস্থান ঘোষণাব জন্যে, তারা চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন। তবে আমি কিন্তু কোনো ধাবণাকে 'আফ্রিকী নয়' কেবল এই কারণে বাতিল করতে চাই না। যদিও তা জ্ঞানের ও সংস্কাবের প্রসারে বাধাদানকাবী প্রগতিবিমুখ, আত্মস্বার্থবাদী ব্যক্তিদের জন্যে সাধাবণ একটি অজুহাত। যেমন, আধুনিক যুগের কোনো নেতা, যিনি জনগণের অর্থ সম্পত্তি অপ্রতিরোধ্যভাবে নিজের পাবিবারিক সম্পত্তি গড়ে তোলার কাজে লাগান, তিনি বলবেন যে সমাজতন্ত্র (যা সত্যই ভয়ে তাকে হকচকিযে দেয) হলো অ-আফ্রিকী। আমরা অবশ্যই আফ্রিকাব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তার মাথাব্যথার কথা বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয, ঐতিহ্যবাহী আফ্রিকী শিল্পের সব কিছুই তার বর্তমান সমসাময়িক চাহিদাকে মেটাবে কিনা, সেটা ভাবনাচিন্তা করার জন্যে আফ্রিকী লেখকদের একটুখানি থেমে দাঁড়ানোর সত্যই দরকার আছে।

নাইজেরিয়া থেকে একটা উদাহবণ নেয়া যাক। 'ওয়েরি ইগ্‌বো'দের মধ্যে একটি বর্ণাঢ্য উৎসব আছে 'ম্‌বারি' নামে। এই উৎসবটি সমাজ ও শিল্পের অবিভাজ্যতায় জনগণের বিশ্বাস গভীরভাবে প্রমাণ কবে। ধরিত্রী দেবীর নির্দেশে এই উৎসব হয়। ধরিত্রীদেবী আলা হচ্ছেন ইগ্‌বো দেবদেবীদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী। কারণ, তিনি শুধু ভূমিরই মালিক নন, নৈতিকতাবোধ ও সৃষ্টিশীলতারও নিয়ন্ত্রক, শৈল্পিক ও জৈবিক— দুটো দিকেরই। প্রতিবছরই আলা তার সম্প্রদাযকে পুরোহিতের মাধ্যমে তার সম্মানে প্রতিমা-উৎসব আয়োজন করার নির্দেশ দিতেন। সে রাতে পুরোহিত শহরের মধ্যে ঘুরে

বেড়াতেন ও সেইসব বাড়ির দরজায়-দরজায় কড়া নাড়তেন, যাদেরকে আলা এই মহৎ কাজের জন্যে নির্বাচন করেছেন। এই নির্বাচিত নারী ও পুরুষেরা তখন অরণ্যের নির্জনে চলে যেতেন এবং অরণ্য পরিষ্কার করে, প্রধান কারিগরি শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে প্রতিমার জন্য ঘর বানাতেন। এই কাজে একবছর, দু'বছর লেগে যেত। যতদিন এই কাজ চলতো, এর কর্মীদেরকে সম্মান ও ভক্তি করা হতো, এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যাতে তাদের মন বিক্ষিপ্ত করতে না পাবে—সেজন্য তাদের অবাঞ্ছিত সংসর্গ থেকে এইসব শিল্পীকে দূরে রাখা হতো। নির্মিত মন্দিরটি স্থাপত্যকলার দিক থেকে খুব সাধারণ হতো—দুই পাশে দেযাল, আর পেছনে দেয়াল। হাল্কা খড়ের চাল। মন্দিরের মতোই প্রশস্ত হতে-হতে সিঁড়িগুলো সামনে পেছনে উঠে যেতে-যেতে একেবারে ছাদে গিয়ে ঠেকতো। তবে আঙ্গিকে খুব সাধারণ হলেও, মবারি কিন্তু ছিলো শৈল্পিক অর্জনের বিস্ময়কর এক কীর্তি—মৌলিক রঙের রুদ্ধশ্বাস সমাবেশ এই প্রতিমাগুলো। যেহেতু আলার সম্মানে নিবেদিত এই প্রয়াস, তাই বেশিব ভাগ প্রতিমাই তাঁর নিজস্ব উপাদান, সাধারণ কাদামাটিতে তৈরি। কিন্তু শিল্পীব কুশলতায় এই সাধারণ মাটিই বিচিত্র ও আশ্চর্য শক্তিশালী সব প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। দেবী নিজে সবার মাঝখানে, সাধারণত তাঁর কোলে একটি শিশু—দু'র্দান্ত (এমনকি, অনমনীয়) শক্তি ও কোমল নমনীযতার এক অদ্ভুত সমন্বয়। তাছাড়াও আরো অন্যান্য অমর তাঁকে ঘিরে—আরো নারী-পুরুষ, পশুপাখির কল্পিত ও বাস্তব মূর্তি। সম্প্রদায়টির সম্পূর্ণ জীবনধারা এই ছবির মধ্যে বিধৃত হতো, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজকর্ম, বিনোদন, এমনকি গ্রাম্য কেলেঙ্কাবি পর্যন্ত। কাজটা শেষ হলে গ্রামে একটা ভোজ ও একটা ছুটিব দিন ঘোষণা করা হতো—সৃজনশীলতাব দেবী ও তাঁব সন্তান, যারা এইসব মূর্তি তৈরি করেছেন, তাদের সম্মানে। এই ছোট ও অপ্রতুল বর্ণনার মাধ্যমে মবারির প্রভাব ও শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই দেওয়া সম্ভব নয়। খ্রীস্টান মিশনারি যাঁরা কিছু-কিছু খোলামেলা ছবি দেখে আহত হয়েছেন, তাঁরাও তাঁদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারেন নি। কিন্তু আমি যা তুলে ধরতে চাই, তা হলো মবারির মূর্তি-কল্পনার দু' একটি অন্তর্নিহিত শিল্পবোধ।

প্রথমত শিল্পসৃষ্টি কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠি বা গুপ্তচক্রের একচেটিয়া বিষয় নয়। সৃষ্টিকে সকলের সম্মুখে চাক্ষুষ কববার জন্য দেবী যেসব তরুণ-তরুণীকে নির্বাচন করেছিলেন, তাঁরা শিল্পী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সমাজের সাধারণ মানুষ। পরের বাবে একাজের ভাব হয়তো পড়বে অন্য একদল লোকের ওপরে। তবে কেবল মাত্র মনোনীত হলেই কেউ শিল্পী হয়ে যান না—এমনকি ঐশ্বরিক নিযুক্তিও এর নিশ্চয়তা দিতে পাবে না। একজন ওস্তাদ শিল্পী-প্রদত্ত শৃঙ্খলা, নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান খুবই প্রয়োজন। আবার এই দুইয়ের সংযোগ ঘটলেই যে নিশ্চিতভাবে জন্ম নেবে নতুন সৃজনশীল চিত্রকর—শিল্পী, স্থপতি—তা ও নিশ্চিত নয়। কিন্তু মবারির উদ্দেশ্যও তা নয়। এর উদ্দেশ্য ও বক্তব্য অন্যরকম। সংস্কৃতির নির্মাতা ও ভোক্তার মধ্যে খুব স্পষ্ট কোনো ব্যবধান নেই। শিল্প সকলের সম্পত্তি এবং সমাজেরই 'কাজ'। যখন সাঁগর এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে থাকেন যে প্রতিটি মানুষই এক-একজন কবি, তখন আমার মনে হয় তিনি আমাদের

ঐতিহ্যবাহী সমাজেব সেই সমগ্রতাধর্মী বিশ্বাসেব প্রতিই সাড়া দিচ্ছেন।

আমি জানি, এসবই অতীন্দ্রিযবাদ–প্রেমিকদেব কানে ঘৃণ্য ধর্মবিবোধিতার উচ্চাবণের মতো শোনাবে। তাদের কারণে, তাদেরকে নিশ্চিত করাব জন্য বলতে চাই যে মবারির মতবাদ পেশাগত অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ মেধাসম্পন্ন গুরুর স্থান বা প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে তা এইসব মেধা ও যোগ্যতাকে বিকশিত কবে তোলে সমাজের সুপ্ত সম্ভাবনাব সঙ্গে মিথষ্ক্রিযাব মাধ্যমে। আবাব মবারি এও অস্বীকাব কবে না যে, সৃজনশীল শিল্পীর মাঝে–মাঝে প্রযোজন হয় নিজের সাথে বোঝাপড়াব কবার, নিজের সত্তাব দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার। তাই, উৎসব যখন শেষ হযে যায়, গ্রামবাসীবা আবার তাদেব স্বাভাবিক জীবনে ফিবে আসে। আর শিল্পগুরুরা ফিবে যান তাদেব কর্মে ও ধ্যানে। কিন্তু এই সৃজনশীল সামাজিক প্রযাসেব পব, এখন এই অভিজ্ঞতাব পব, কখনোই একে অপরকে অপবিচিত মনে করেন না। এই যৌক্তিক ও ভৌত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তব সমাজ, যা কিনা শিল্পেব অবগুণ্ঠনগুলো মোচন কবে এবং আবাব এর স্রষ্টাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিযে নেয, উপকৃত হয। এই অভিজ্ঞতায হয়ে ওঠে একজন সক্রিয় অংশীদার। কেউ যদি বিশ্বাস কবে, যেমন তথাকথিত অগ্রসব সংস্কৃতির অনেকেই মনে করেন যে, সমাজকে অবহেলা কবাব ক্ষমতা সত্যিকারেব শিল্পীর কুললক্ষণ নির্দেশ করে (এবং স্ববিরোধিতা এখানে যে, একই সমযে সে দাবি কবে সমাজের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ), তা হলে সে নিশ্চযই ম্বারির মূল বিবেচ্য বিষযগুলোকে খুব সাদামাটা ভাববে। মবারি–সংস্কৃতিতে লালিত হযেছেন এমন কোনো শিল্পীই কোনো প্রদর্শনীতে তাব ক্যানভাসকে উল্টে দিয়ে তার সম্প্রদাযকে অপমান কবাব ধৃষ্টতা দেখাতে পাবেন না। পারেন না এবপর এক কোণে নিজেকে গুটিযে নিয়ে দেখতে কিভাবে দর্শকরা মাথা নাড়তে–নাড়তে ছবিটির গোপন ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যেব পরিশীলিত প্রশংসা কবছেন। এব চেয়ে ভযাবহ কোনো সম্পর্কে কি কল্পনা করা যায় ? এবং যে–শিল্পী গায়ে পড়ে এমন একটি নাটক তৈবি করলেন, তাকে অনেক বেশি জবাবদিহি কবতে হবে, যতটা না করতে হবে সেই করুণ পারিষদদেরকে যারা সম্রাটেব নতুন পোশাকেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আর এখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছেন তাদেব দৃষ্টিব অসাবতাকে রুদ্ধশ্বাস বাক্যস্রোতের ভেতবে লুকাতে। তারা হচ্ছেন এক খামখেয়ালী রাজার দায়িত্বহীনতাব শিকারমাত্র। এবং যথার্থই তারা নয়, বরং রাজা নিজেই শেষ পর্যন্ত অপমানের শিকাব হন।

অবশ্য, এসব কিছুরই একটা গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। ইগ্‌বো সমাজ, যেখান থেকে মবারির উদাহরণটা নেয়া হয়েছে, সেই সমাজ ছিলো লাগাম–ছাড়া প্রজাতন্ত্রী বিশ্বাসের জন্যে কুখ্যাত। একটি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যে সমাজ সমর্থন ও উৎসাহিত করে. সেই সমাজ স্বাভাবিকভাবেই একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করবে। উদাহণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব, যাকে অনেক আফ্রিকী লেখক নির্বিচারে গ্রহণ করছেন, তা একটি কঠোর গোষ্ঠি–স্বার্থবাদী সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলো, যেখানে অতীতে রাজা ও অভিজাতবর্গ সাধারণ রুচির বাইরে ভিন্ন একটি শিল্প–রুচি গ'ড়ে তুলেছিলো। এবং যেহেতু রাজ্যের সমস্ত সম্পদ তারাই কুক্ষিগত করেছিলো, তাদের

পক্ষেই সম্ভব হ'তো বিভিন্ন ধরনের উৎকোচ, প্রলোভন ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শিল্পীদের কিনে নিয়ে, নিজেদের রুচি অনুযায়ী শিল্প-সৃষ্টিতে নিয়োগ করা। এভাবে বহু প্রজন্ম ধরে অভিজাত সংস্কৃতি ও সাধারণের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যই এক ব্যবধান গড়ে ওঠে। শেষেরটি নিজেকে উন্নত করার সম্পদের অভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। তরল-অনুভূত কাব্যিক ন্যায় বলে একটা ব্যাপার রয়েছে অবশ্যই। এবং সময় পূর্ণ হলে, এতদিন ধরে যে অভিজাত সংস্কৃতি উঁচু তলার মানুষদের আওতায় প্রায় বায়বীয়ভাবে বেঁচে থাকছিলো, ক্রমশ তা রুগ্ন হয়ে পড়ে। কোনো না কোনোভাবে এই সংস্কৃতি বুঝতে পারল যে, মাটির সাথে সম্পর্ক ছাড়া সে বাঁচবে না। সুতরাং সে নেমে এল সাধারণ লোকজ সংস্কৃতির পার্থিব বদ্ধ জলাশয়ে এবং এর নাজুক ঠোঁটে নড়াচড়া কবতে লাগলো অজস্র তুচ্ছ অপাংক্তেয় শব্দাবলী, যেন সেটাই সর্বরোগহর।

এখানে এইসব কিছুর মধ্যে আফ্রিকী লেখকের স্থান তাহলে কোথায়? সত্য বলতে কি, তিনি পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কখনো-কখনো এক আকস্মিক আত্মবিশ্বাসের শিকার হয়ে তিনি তাগিদ অনুভব কবেন ইওবোপে বা পশ্চিমকে রক্ষা করার, এবং তা করতে চান আফ্রিকার নিজস্ব মন্ত্রগুপ্তির উপহাব দিয়ে, আবেগী দানের মাধ্যমে কালো মানুষেব স্পর্শকাতরতায় ইওবোপের দেকার্তীয় যুক্তিবাদকে সেচসিক্ত (সাঁগবের ভাষায়) ক'রে।

সাঁগরের 'মুখোশের কাছে প্রার্থনা' কবিতায় আমরাই হচ্ছি সেই শিশুগুলো যাদেরকে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে বলা হয়, সেই শেষ বস্ত্রটিও উৎসর্গকারী দরিদ্র লোকটির মতো।

আমরা তাহলে এখন চিৎকার করে বলতে পারি : 'শোন, কেননা পৃথিবীর এই নবজন্ম/ আমরা হচ্ছি সেই খমির যা মেশাতে হয় সাদা ময়দায়/না হলে কেই বা এই পৃথিবীকে শেখাবে ছন্দ,/যে পৃথিবী যন্ত্র ও মাবণাস্ত্রের চাপে মৃত ?/আর কেই বা আনন্দের সেই ধ্বনি তুলবে—যা কিনা/নতুন এক ভোরে জাগিয়ে তোলে মৃত ও প্রাজ্ঞজনকে ?/বলো—আর কেই বা আশাছিন্ন মানুষকে ফিরিয়ে দেবে জীবনের স্মৃতি ?'

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নিউইয়র্ক'-এ সাঁগর বলেন সেই আশ্চর্য মহানগরীকে, কি করে সে বাঁচতে পারে : 'নিউইয়র্ক শোনো, তোমাকে বলছি : নিউইয়র্ক! তোমার রক্তের ভেতরে কালো রক্ত প্রবাহিত হতে দাও। তাহলে সে তোমার ইস্পাতে তৈরি গিটগুলোর ওপর থেকে জমে-ওঠা মবচে ঘষে তুলে দিতে পারে। যেমন কিনা প্রাণ-সঞ্জীবনী তৈলধারা দিতে পাবে তোমার সেতুগুলোকে কোমরের বাঁক এবং লতানো গাছের নমনীয়তা।' সমস্যাটা এখানে হ'লো, ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন নিশ্চিত নই যে, আফ্রিকার পক্ষে বিশ্বের ত্রাণকর্তার ভূমিকা দাবি করতে পারি। প্রথমত, আমাদের পক্ষে কাউকে রক্ষা করার আশ্বাস দেয়া' আমাদের স্বাস্থ্যের এই অবস্থায়' (একটি সাধারণ নাইজেরিয়ান ক্লিশে) কঠিন হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, যদি বিশ্বকে আফ্রিকার রক্ষা করার ক্ষমতাও থাকে, সে হয়তো বাঁচতে চায় না।

বিশ্ব বলতে আমরা এখানে আসলে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যকে বোঝাচ্ছি। কিন্তু আমরা সবাই এমন বদভ্যেস কবে ফেলেছি যে, মানচিত্রের ঐ টুকরোটাকেই সম্পূর্ণ বিশ্ব ভাবি। একজন আফ্রিকী লেখকের খুব সহজেই এই ভুলের মধ্যে পিছলে-পড়ার ব্যাপারটা সমসাময়িক কল্পনার ওপরে এর দখলই নির্দেশ করে। পাশ্চাত্য ও ইউরোপের যারা, তাদের

জন্যে এই অভ্যেস সম্পূর্ণ ক্ষমার্হ না হ'লেও অন্তত বোধগম্য। এটা যে কতোখানি নির্দোষভাবে আনন্দদায়ক—তার একটা উদাহরণ এই যে, সিন্সিনাটি ও মিনোসাটার ভেতরের কোনো খেলাকে বলা হচ্ছে বিশ্ব-প্রতিযোগিতা। কিন্তু অন্য মহাদেশ ও জনগণকে যখন উপেক্ষা করা হয়, তখন এটা আর মজার থাকে না। এসব মহাদেশ ও এদের জনগণ যখন বিশ্বের ও তাদের নিজেদের সম্পর্কে এই ধারণাকে মেনে নেয়, তখন তা চলে যায় অসহনীয় কিম্ভূতের পর্যায়ে। ইওরোপের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্যে সাঁগরের এই উৎকণ্ঠায় হয়তো সত্যই কুইক্সোটিক অভিযানের সুর লাগে, তবে তা অন্তত সত্তার এক ইতিবাচক উপলব্ধির ভেতরে প্রোথিত। তেমন নয় কিন্তু আফ্রিকী সাহিত্যের অত্যন্ত সমসাময়িক কিছু কিছু উদ্ভট ধরন, যেমন—ইউরোপের অসুস্থতাকে স্পর্শ করার প্রায় বিকারগ্রস্ত আকুতি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে, তাতে আমাদের পরিশীলনের দাবি আরো উন্নত হয়। আমি অবশ্যই মানব-অবস্থা সিনড্রোমের কথা বলছি। ইউরোপীয় শিল্প ও সাহিত্যের যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে নৈরাশ্য বা বিপর্যয়ের একটা স্তরে পৌঁছুনোর। যেটা আমাদের সাহিত্যের ও শিল্পের নেই। সবচেয়ে খারাপ হলে আমাদের বড়জোর আশাভঙ্গ হতে পারে। হয়তো আমরাও যখন প্রযুক্তিগত সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছুবো আধ্যাত্মিক উন্নতিবিহীন, তখন আমরাও এমনি হতাশায় নিমজ্জিত হবো। অথবা কে জানে, আমবা অন্যের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই নিশ্চিত বিপর্যয়কে এড়াতেও তো পারি। কিন্তু, আমরা শিখব কি শিখব না—তা নিয়ে এত আগে থেকেই ছুটোছুটি করার কোনো কারণ আমি খুজে পাই না। নিষ্ঠুব নিয়তির সাথে এখনই দেখা করার কি দরকার? সে সহজে তার জায়গা ছেড়ে নড়বে না।

ঘানার প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক আযি কিউই আর্মা, আমার মনে হয়, তাঁর অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাকে অপচয় করার বিপদে পড়েছেন মানব-অবস্থানটিতে (human condition) পৌঁছুতে গিয়ে। 'সুন্দব এখনো জন্মায়নি' নামে তাঁব দড়ো প্রথম উপন্যাসে তিনি ঘানার সমাজে দুর্নীতির এক রূপকাশ্রয়ী চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং একজন মানুষের কথা বলেছেন, যিনি এই নোংরামি থেকে নিজের গা বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।।

অত্যন্ত সুলিখিত বইটিতে ভাষা ও উপমার ওপর আরমার দখলও অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু এটি একটি রুগ্ন বই। রুগ্ন, ঘানার রুগ্নতায় নয়; বরং মানব-অবস্থানের অসুস্থতায় পীড়িত। এই বইয়ের নায়ক, নামহীন ফ্যাকাশে অক্রিয় (Passive) অস্তিত্ববাদী রচনার শ্রেষ্ঠতম ছাঁচে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কাহিনীর ভেতরে ঘুরে বেড়ায় যন্ত্রণাবিদ্ধ অর্দ্ধঘুমে, আকণ্ঠ ডোবা হতাশায় আর মনুষ্য-পুরীষে, সমস্ত বইয়ে যার ছড়াছড়ি দেখতে পাই। আমি কি বলেছি যে সে দুর্নীতিপরায়ণ হতে অস্বীকার করেছে? অস্বীকার করার মতো ইতিবাচক কিছুই সে করে নি। সে আমাকে বরং বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছে জাঁ পল সাত্রের উপন্যাসের সেই নর-নারীর কথা, যারা বিষণ্ন যন্ত্রণা নিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় বসে থাকে, তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড এক অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে টেবিলের ছুরিগুলোকে আঁকড়ে ধরে এবং সোজা বসিয়ে দেয় হাতে, কাঠের মাঝ দিয়ে। যেন পরস্পরের কাছে প্রমাণ করছে খুব দুর্বোধ্য কোনো ব্যাপার। এভাবে ছাড়া আরমার নায়ক কখনো কোনো দখলও সহ্য করতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আরমার নায়ককে আমার খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কারণ, আরমা জোর দিয়ে বলছেন যে, এই কাহিনীর স্থান হচ্ছে ঘানা, আধুনিক অস্তিত্ববাদী কোনো জনমানববসতি-শূন্য স্থান নয়। এটা প্রমাণ করার জন্যে তিনি কিছু বাস্তব উপাদান, যেমন 'কওয়ামে নক্রুমা' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এবং সেটাই ভুল হয়েছে। নায়ক যেমন নামহীন, অন্য সবকিছুও তেমনি হওয়া উচিত ছিলো। তাহলে আরমা অত্যন্ত 'বিশ্বজনীন' আধুনিক কোনো কাহিনী সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি কেন সেই সহজ ব্যাপারটাই বেছে নিলেন না—আমি জানি না। কিন্তু আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি ও ভাবছি, হয়তো আফ্রিকা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করছিলো এবং একটি মারাত্মক দায়বোধ সূক্ষ্মভাবে তার ভেতরে কাজ করছিলো—মারাত্মক বিশ্বজনীনতার ভণিতাটির পক্ষে—যে, তার এই বিবেচনাযোগ্য মেধাকে একটি বিশেষ দেশ ও বিশেষ জনগোষ্ঠির সেবায় নিয়োগ করতেই হবে। এমন কি বলা যায় যে, এই চাপে পড়েই আরমা প্রয়াসী হয়েছেন একই সঙ্গে ইউরোপীয় সম্বোধনের একটি আধুনিক কাহিনী নির্মাণে, যাকে আফ্রিকীরা আবার বলবে নৈতিক উপদেশমূলক কাহিনী; একই সাথে তিনি চেষ্টা করেছেন ইউরোপীয় সাহিত্যের ধরণকে ঘানার নব-নারীর জীবনে মেলাতে? তিনি খুবই চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর ঘানাকে তো চেনা যায় না। মহাজাগতিক এই দুঃখ ও হতাশা তেমনি অপরিচিত, দুর্বোধ্য ও ব্যবহারেব অযোগ্য, যেমন নক্রুমার দানবীয় যন্ত্রপাতিগুলো, যা পূর্ব ইউবোপীয় দেশগুলো থেকে আমদানি করা হয়েছিলো বলে বলা হয়। অর্থাৎ, আরমার মতো সমালোচকরাই তাই বলেছে।

এটা সত্য যে, ঘানা অসুস্থ ছিলো। কিন্তু কোন্ দেশই বা নয়? প্রত্যেকেরই অসুস্থতার একটা নিজস্ব রকম আছে। আয়ি কিউই আরমা ঘানার অসুস্থতার ওপর এ্যাতো বেশি বিদেশী উপমা চাপিয়ে দেন যে এ যেন আর সত্য থাকে না। আর শেষ পর্যন্ত সে-সমাজে নায়কের বিশ্বাসহীন বা কর্মহীন ব্যক্তিগত (তা সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদীভাবে সম্ভাব্য) কৈফিয়ত-প্রদানও নিতান্ত অপ্রতুল। যেখানে আক্রার রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া নগ্ন পাগলটিরও আছে একটি পরিবর্ধিত পরিবার, যারা হয়তো কোথাও প্রতিনিধি-লজ্জায় ভুগছে।

আরমা খুব স্পষ্টতই একজন বিচ্ছিন্ন লেখক, আধুনিক লেখকের সব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত ঘানা কোনো আধুনিক অস্তিত্ববাদী দেশ নয়। এটা একটি পশ্চিম-আফ্রিকী ছোট রাজ্য, যা একটি জাতিসত্ত্বায় পরিণত হওয়ার জন্যে সংগ্রাম কবে যাচ্ছে। সুতরাং, আরমা ও ঘানার মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান। ঘানার পঙ্কিলতা নিয়ে আরমার আচ্ছন্নতায় এক ধরনের ঠাণ্ডা, বিদ্বেষপূর্ণ দূরত্ব যেন আছে :—

'বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো তাদের অমনোযোগী এই যাত্রায় মলদ্বার থেকে পিছ্‌লে গেলো রেলিংয়ের দিকে, যেখানে তাদের মালিক তখন ফিরতি যাত্রা করছে শৌচাগার থেকে নিচের সিঁড়ি দিয়ে ওপরের অফিসে। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো তখনো ভেজা মূত্র-পরবর্তী তরলে এবং তেলতেল গাছের ডাল থেকে বেরুনো বাসি ঘামে। পিওনদের নির্মম করতলগুলো, ওরা যখন ওদের বুজে যাওয়া নাকগুলো ঝেড়ে ভালোভাবে ছড়ানো সিক্‌নি মোছার জন্যে সুবিধেজনক জায়গা খোঁজে। যতক্ষণ না হাতগুলো তালের রস এবং সম্পূর্ণ লেহন-অবশিষ্ট

থেকে ঘষে পরিষ্কার ....'

ঠিক এমন মনোভাব এবং ববফশীতল দূরত্ব খুঁজে পেতে হলে আপনাকে আফ্রিকা সম্পর্কে কিছু ইউরোপিয়ান লেখকের লেখা পড়তে হবে :– 'ফাডা হচ্ছে পশ্চিম সুদানের একটি স্থানীয় শহর। এর কোনো সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য বা সুবিধে নেই। এক পর্যায়ে এটাকে বলা যায় খবগোশ প্রতিপালনের বনভূমি থেকে শুরু করে ভোঁদড়েব গর্তেব মতো একটা বাসভূমি এবং পরেরটাব মতো এতো পরিচ্ছন্নও নয়। নিজেব ময়লার স্তূপের ওপবেই এটা তৈরি, প্রাচীনত্বের কোনো আকর্ষণও এর নেই। এর বিবর্ণতা, এর দুর্গন্ধ সবই নতুন... এর মাটিব দেয়াল মনে হয গুটি বসন্তে খেয়ে ফেলেছে। যদি সময পঞ্চাশ বছব পিছিয়েও যায, এব অধিবাসীরা কোনো পবিবর্তনই টেব পাবে না। ঘবেব মেঝেতে ইঁদুবের মতো এবা বেঁচে থাকে। শিল্পেব , জ্ঞানেব যতো মহত্ত্ব, ঔদার্য, বৈচিত্র্য—ও সভ্যতাব যতো সংগ্রাম–যুদ্ধ, সব তাদের মাথাব ওপর দিযে চলে যায, তাবা যেন কল্পনাতেও এসব স্পর্শ কবতে পাবে না।' উপবোক্ত উদ্ধৃতিটি জযেস ক্যাবিব বিখ্যাত উপন্যাস 'মিস্টাব জনসন' থেকে নেযা, যাকে টাইম পত্রিকা 'আফ্রিকার উপবে লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস' বলে আখ্যা দিযেছে। জয়েস ক্যাবি একজন বিদেশী, যিনি আফ্রিকা সম্পর্কে লিখেছেন। আর, আয়ি কিউই আরমা একজন বিচ্ছিন্ন স্বদেশী। মনে হচ্ছে যেন আধুনিক এই বিচ্ছিন্নতাব ভঙ্গিটি আনবার জন্যেই একজন আফ্রিকী লেখক শ্বেতাঙ্গ জেলা কর্মকর্তার মতো লিখতেও রাজি।

আরমাকে কোথাও–কোথাও এমনও বলতে শোনা গেছে যে তিনি আফ্রিকী লেখক নন, ববং কেবলমাত্র একজন লেখক। আরো ক'জন লেখক, সবাই আমাব বন্ধু, একই কথা বলেছেন। এই ধবনের মানসিকতা পশ্চিম জগতে প্রশংসা কুড়োবেই। কিন্তু এটা পবাজযেব বিবৃতি। মানুষ যখন নিজের কাছ থেকে পালাতে চায, তখন তার মতো পরাজিত আর কেউ নেই। ১৯৭১ সালে পাবলো নেরুদা যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন, বলেছিলেন : "আমি ল্যাটিন আমেবিকাব সমস্ত জনগণের, তাদেব আত্মাব একটি সামান্য অংশ মাত্র ব্যাখ্যা কবাব চেষ্টা করেছি।" আমি ভাবছি একজন আফ্রিকী লেখক কি বলতেন? হযতো বলতেন, 'আমি সমগ্র বিশ্ব–জগতেব, যার সম্পূর্ণ আত্মাকেই আমি ব্যাখ্যা করতে পেবেছি।"

আমি জানি আমাদের সমস্যার মূল হচ্ছে উৎকণ্ঠা। বিশ্বে আফ্রিকার ভাগ্য এমনই ছিলো যে 'আফ্রিকী' এই বিশেষণটি যেন প্রত্যাখ্যানের গোপন ভয়কেই উস্কে দেয়। তাব চেয়ে ববং ভালো, নিজের মাতৃভূমিব সাথে, এই বোঝা থেকে নিজেব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা, আর এক বিশাল লাফে বিশ্বমানবে পবিণত হওয়া। অবশ্যই আমি উদ্বেগটা বুঝতে পারি। কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালিযে বেড়ানোকে আমার মনে হয় এই 'উদ্বেগের' সাথে বোঝাপড়া করার জন্যে অত্যন্ত অপ্রতুল একটি ব্যবস্থা। লেখকরাই যদি এমন পলায়নবাদী পথ বেছে নেন, তাহলে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে কে?

কখনো–কখনো এই সমস্যাটি হাস্যকর রূপ নেয়। একজন তরুণ নাইজেরীয় কবি, যিনি নিউইযর্কে বাস কবেন ও শিক্ষকতা করেন, আমার সম্পাদিত একটি সাহিত্য–পত্রিকার জন্যে নাইজেরিয়াতে একটি কবিতা পাঠালেন। কবিতাটি ভালো ছিলো, কিন্তু

একটি ছত্রে তিনি বহুবচনের একটি ইতালিয় শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যেন সেটা একবচন। এখানে এমন কাব্যিক যথেচ্ছাচারের কোনো সুযোগই আমি দেখি নি। সুতরাং, সামান্যতম পরিবর্তন, যেটুকু ঐ অপ্রয়োজনীয় ভুলকে শোধরানোর জন্যে দরকার, আমি করলাম। সেই উজ্জ্বল, তরুণ কবি আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার বদলে বরং লিখলেন একটি মারাত্মক ক্রুদ্ধ চিঠি, আমাকে ব্যাকরণবিদ গালি দিয়ে। এতে আমি প্রকৃতপক্ষে কিছু মনে করি নি, এটা একটা নতুন ধরনের অভিযোগ। কিন্তু তার সর্বনাশা অন্তিম বক্তব্যটিতে তিনি সাম্রাজ্যের প্রান্তিক ছাউনিতে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক রক্ষণশীলতার সাথে আধুনিক মহানগরীর অধিবাসীদের কল্পনাগত স্বাধীনতার মধ্যকার বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন।

প্রথমে আমি উত্তর দেবো, ভেবেছিলাম। পরে স্থির করলাম যে এতে আসলে সময়েরই অপচয় হবে। যদি আমি উত্তর দিতাম, তবে হয়ত আমাদের নিজ-নিজ স্থানিক অবস্থানের ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত হতাম। কিন্তু তাঁকে মনে করিয়ে দিতাম যে প্রান্তিক ছাউনিগুলো সবসময়েই সাম্রাজ্যকে বর্বর জাতিদের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে—এবং সেই জন্যেই সবসময়ে তাকে থাকতে হয়েছে সতর্ক ও সজাগ, মহানগবীর সহজ, কোমল জীবন তার নয়। কৌতুকের দিকটি বাদ দিলেও এই ঘটনাটি বিশ্বজনীনতা-সন্ধানী আফ্রিকী লেখকের সঙ্কটের একটি পরিচ্ছন্ন রূপক।

মহানগরী তাঁর—এই ভাবনা তাকে বিভ্রান্ত করেছে। হ্যাঁ, এখনও তা নয়। তাঁর জন্যে, সংশোধন করার জন্যে আরো আছে মূল্যবোধের অপরিহার্য ব্যাকরণ, রাজনীতির বিভ্রান্ত শব্দভাণ্ডার। আমাদের এই পরিস্থিতিতে আয়েশ ও অমনোযোগিতা পুরো যোগাযোগ-ব্যবস্থাটিরই ধ্বংস ডেকে আনবে।

আপনি হয়তো বলবেন, তাতে কিই বা আসে যায়? একজন মানুষ ভ্রান্ততম মতবাদ নিয়েও খুব ভালো কবিতা ও উপন্যাস লিখতে পারেন, আবার নির্ভুল মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও কেউ লিখতে পাবেন ভয়াবহ বই। এমন তো হতেই পারে। যারা বাজে বই লিখবেন, তারা যতো ভালো মতামতই পোষণ করুন না কেন, বাজে ভাবেই লিখবেন। ভালো লেখক, সম্ভাবনাময় ভালো লেখকরাই শুধু আমাদের মনে আলোড়ন তুলবেন। তাঁর জন্যে আমি ভালো মতবাদের ঝুঁকিও নেবো। আমার মনে হয় না যে নিজেকে কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলে, তার কোনো ক্ষতি হবে।

প্রয়াত ক্রিস্টোফার ওকিগ্‌বো হচ্ছেন তেমন শিল্পী হিসেবে উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যিনি মাঝে-মাঝে বেশ বিভ্রান্তিকর কিছু মতামত প্রকাশ করলেও, কবিতা লিখেছেন বিশুদ্ধ। অনেকের মতে, তিনি আমাদের সময়ে আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ কবি। অন্য কবিরা ভালো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ওকিগ্‌বো আমাদের জন্যে কবিতার ইন্দ্রজাল বিছিয়ে তৈরি করেন তীব্র বন্য সৌন্দর্যের আশ্চর্য বিস্ময়কর রহস্যময় মহাকাশ। সেক্ষেত্রে ক্রিস্টোফার ওকিগ্‌বো একবার বলেছিলেন যে তিনি কবিতা লিখেছেন অন্য সব কবিদের জন্যেই কেবল। এ-কথায় তিনি নিজেকে আফ্রিকী সীমানার বাইরেই ছড়িয়ে দেন নি, আঘাত করেছেন বিখ্যাত সেই ইংরেজ রোমান্টিক কবিকেও যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন মানুষের জন্যে লিখছেন

এমন একজন মানুষ হিসেবে। আরেকটি প্রসঙ্গে ওকিগ্‌বো বলেছেন : 'আফ্রিকী সাহিত্য বলে কিছু নেই। ভালো লেখা বা মন্দ লেখা, ব্যাস এই।' কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই আমাদের সন্দেহ হলো যে এগুলো সবই ধাপ্পাবাজি। কারণ, ওকিগ্‌বোকে যখন জিগ্যেস করা হ'লো তিনি কেন কবিতা বেছে নিলেন, তিনি বলেছিলেন : 'আমার জীবনের বাঁক ঘুরে গেল, যখন আমি দেখলাম, আমি আমার নিজেকে ভালো করে জানতে চাই। এবং ভেতর থেকে আমাকে আমার দিকে ফিরে তাকাতে হয়েছে। যখন আমি ভেতর থেকে নিজের দিকে তাকানোর কথা বলছি, আমি বোঝাতে চাইছি নিজেকে পরীক্ষা করার কথা। অবশ্যই তাব মাঝে আমাদের পূর্বসরীরাও আছেন। কাবণ, পূর্বসবীদের ছাড়া আমাব কোনো অস্তিত্বই নেই।'

তারপব যেন এটা পরিষ্কার বুঝিযে দেযার জন্যে যে পূর্বসবী বলতে কোনো সাধাবণ মনোস্তাত্ত্বিক বা প্রজনন-শাস্ত্রীয় নীতিমালা নয়, ওকিগ্‌বো বিশেষভাবে বলেন যে, তিনি নিজেই তার মাতামহের পুনরুজ্জীবিত ধরিত্রী-মাযেব মন্দিবে একজন পুবোহিত। সত্য কি, কবিতা তাঁর জন্যে হযে ওঠে যন্ত্রণামময এক যাত্রা, যা ফিবে যায় বিচ্ছিন্নতা থেকে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পুনবাবম্ভে তার কন্ঠস্বব হয়ে ওঠে ইগ্‌বো পুরাণের সূর্যপাখির মতো, রহস্যময় ও অশুভ।

কিন্তু, ওকিগ্‌বোর জন্যে এটা খুব সহজ বাছাই ছিল না। সহজ ছিল না এই ফিরে-যাওয়া। কারণ, বাকি পৃথিবীব কাছে তাঁব ঋণ তিনি কখনোই তুচ্ছ বলে ভাবেন নি। তাঁব বৈচিত্রময় ঐতিহ্যের প্রতিটি উত্তবাধিকাবকে তিনি কবিতায এনেছেন। সহজেই তাঁর সীমাকে বিস্তৃত করেছেন বোম, গ্রীস ও ব্যাবিলনের ভেতবে, ইহুদিবাদ ও ক্যাথলিকবাদের মধ্য দিয়ে, ইউবোপীয় ও বাংলা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে, আধুনিক সঙ্গীত ও চিত্রকলা পর্যন্ত।

কিন্তু, অন্তত একজন সংবেদনশীল নাইজেরিয়ান সমালোচক যুক্তি দিযেছেন যে, ওকিগ্‌বোব প্রকৃত কণ্ঠস্বর শোনা যায় তাঁর কবিতা 'বজ্রপাতেব পথ'-এব শেষ দিকে, যখন তিনি চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তমূলকভাবে বেছে নিয়েছেন আফ্রিকী প্রেবণাকে। ওই মতকে হয়তো খণ্ডন করা যাবে, যদিও আমি মনে করি এব ভেতরে সারবস্তু আছে। সমস্যাটা হচ্ছে যে ওকিগ্‌বো এমনই এক যাদুকরী প্রতিভাবান কবি, যিনি এমনই মাযাব ইন্দ্রজাল ছড়িযে দিতে পারেন যে, যা কিছুই তার ভালো লাগে—যা কিছুই তিনি বলেন বা যে সুবেই তিনি গেয়ে ওঠেন—আমবা তাঁব শব্দ ও রূপকল্পেব সৌন্দর্যে ও মহিমায় রুদ্ধশ্বাস দাঁড়িযে থাকি। তারপরও তাঁর শেষ কবিতাগুলোতে আছে সেই অনিবার্য আগুন, যা নূতন। মনে হয় যেন যে-দেবীকে তিনি এতো দিন ধরে তার এই কাব্যিক যাত্রায এইসব বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত দৃশ্যপটে খুঁজেছেন, তাকে যেন পেয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত ঘরের ভেতরেই। এবং তিনিই যেন তাঁকে দিয়েছেন এই নূতন বজ্র। দুর্ভাগ্যজনক যে ১৯৬৭ সালে যখন নিহত হন, তিনি রেখে যান কেবল খুঁজে পাওয়া এক নতুন সত্তার মোহিতকারী সামান্য আভাস মাত্র। হয়তো নূতন অন্য কবিদের মধ্যে তাঁর জন্ম হবে আবার, ফিরে আসবেন, গান গাইবেন আমাদের সেই সূর্যপাখির মতো, যার অবিনাশী সঙ্গীত ঈগলের ধ্বংসস্তূপের ভেতরেও বেঁচে রয়েছে।

অনুবাদ : মোবাশ্বেরা আনাম